মা'আরিফুল হাদীস

তৃতীয় খণ্ড

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র)

মাওলানা সাঈদুল হক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম মানব জাতির জন্য যেমন চিরন্তন ও সার্বজনীন জীবন দর্শন, তেমনি ইসলামের বাস্তব নমুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবতার জন্য অনুপম আদর্শ। তাঁর পবিত্র ও সুন্দরতম জীবন চরিত, যা পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'খুলুকুন আযীম', ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণরূপে হাদীস হিসেবে বিশ্ব মানবতার হিদায়েত ও মুক্তির জন্য আমাদের মাঝে সংরক্ষিত। হাদীস হলো নবী করীম (সা)-এর পূত-পবিত্র চরিত্রের কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়েত ও নসীহতের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আলোকবর্তিকা; মানব জীবনের সকল অঙ্গন সম্পর্কে এতে দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। এ সোনালী ধারা না থাকলে আমাদের জীবন পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে যেত। মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমত, তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য তাঁর প্রিয় নবীর এ হাদীসকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখার ব্যবস্থা নিয়েছেন। উম্মাতের উলামায়ে কিরাম যুগ যুগ ধরে এ হাদীস চর্চা ও সংকলন এবং সংরক্ষণের জন্য বিরাট দায়িত্ব আনজাম দিয়ে আসছেন।

উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মনযুর নু'মানী (র) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি ঈমান এবং এ ধরনের আকীদাগত বিষয় থেকে শুরু করে মানবীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড, মৃত্যু, হাশর-নশর পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়কে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ এর আওতায় সন্নিবেশিত করে উর্দূ ভাষায় 'মা'আরিফুল হাদীস' নামে একটি সংকলন প্রণয়ন করেন। আট খণ্ড বিশিষ্ট এই মূল্যবান রচনা বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এ হাদীস সংকলনটি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম খণ্ড ইতোমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাভাষী ধর্মপ্রাণ মুসলিম পাঠক ভাইবোনদের হাতে এ মূল্যবান হাদীস সংকলনের তৃতীয় খণ্ডটি তুলে দিতে পারায় আমরা মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন!

এ. জেড. এম শামসুল আলম

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ পবিত্র কুরআনের তাফসীর, সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ ও বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ-গবেষকদের রচিত মূল্যবান পুস্তকসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ বিভাগ থেকে ইতোমধ্যে তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইব্ন কাছীর ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীসহ বেশ অনেক মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

'মা'আরিফুল হাদীস' শীর্ষক হাদীস সংকলনটি বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মনযূর নু'মানী (র) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় সংকলিত। এতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো থেকে শুরু করে মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী জীবন, পার্থিব জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম এবং এমনকি শিষ্টাচার, দয়া প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় অনুচ্ছেদ আকারে এতে এতদসংশিষ্ট হাদীসমূহ এর আওতায় সন্নিবেশ করেছেন এবং হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও এতে সংযোজিত হয়েছে। কাজেই একজন মুসলমানের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাত সম্পর্কে জানার জন্য এ সংকলনটি অত্যন্ত উপযোগী।

মোট আট খণ্ডে সমাপ্ত এ হাদীস সংকলনটি প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করা হলো। এর পরবর্তী' খণ্ডও দ্রুত প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ খণ্ডটি অনুবাদ করছেন বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক, সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান এবং প্রুফ দেখেছেন জনাব এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম। আল্লাহ্ তাদেরকে এবং প্রিয় রাসূল (সা)-এর হাদীস প্রকাশনা-কর্মের সাথে জড়িত সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রথম প্রকাশহেতু কিছু মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এ ধরনের কোন ভুল-ক্রটি চোখে পড়লে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিজ্ঞ পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

গ্রন্থকারের ভূমিকা

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

ইসলাম তথা কোন ধর্মেই নবী-রাসূল ব্যতীত হিদায়াত লাভের বিষয়টি চিন্তাও করা যায় না। কারণ সৎপথের দিশা সম্বলিত নির্দেশিকা নবী-রাসূলের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। আর তাঁরাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেন, এর মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা দেন এবং বিধি-বিধানের বাস্তব রূপ দান করেন। এ পর্যায়ে যে সকল প্রশ্নের উদ্ভব হয় তাঁরা তার সমাধান পেশ করেন। তাই হিদায়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ কেন্দ্রীয় ও বুনিয়াদী সত্তারূপে স্বীকৃত এবং তাঁরাই মানুষের হিদায়াতের উৎস। কাজেই তাঁদের উপর ঈমান আনা, আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রতিনিধিরূপে মান্য করা মুক্তি ও সৌভাগ্য অর্জনের পূর্ব শর্ত। বর্তমান কালে বরং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী ও রাসূল। তিনি সর্বশেষ নবী হওয়ার তাৎপর্য এই যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের সময় কাল। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথে সন্ধান দিয়েছেন সে পথই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। তাই কুরআন মাজীদে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ -

"বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পসন্দ করেন না।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১-৩২)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর অনুপম সুন্দর চরিত্রের অনুসরণ করার মধ্যে যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমগ্র মানবতার মুক্তি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের শর্ত, তাই দু'টি উপায়ের একটি অবলম্বন আবশ্যক ছিল, হয় তাঁকে জগৎ বিলয় না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখতে হত যাতে মানুষ সরাসরি তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করতে পারে, নয়ত তাঁর অনুপম শিক্ষা এবং তাঁর মহত্তম চরিত্রের ঘটনাবলীর এমনভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক ছিল যাতে অনাগত কালের লোকজন তাঁর শিক্ষা ও হিদায়াত লাভে ধন্য হতে পারে। যেমনিভাবে তাঁর জীবদ্দশায় লোকেরা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে হিদায়াত লাভ করেছিলেন।

কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দুনিয়াতে জীবিত রাখা আল্লাহ্ তা'আলার হিক্‌মত পরিপন্থী হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর তা হচ্ছে একদিকে তিনি হিদায়াতের উৎসরূপে তাঁকে যে আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছেন তা হুবহু সংরক্ষণ করে রেখেছেন। ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ অমুসলিম ব্যক্তিবর্গও এর অভিনব সংরক্ষণের ব্যাপারটি অকপটে স্বীকার করেন। অন্যদিকে তাঁর পবিত্র জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবিস্তার হিদায়াতনামা, তাঁর নির্দেশনামূলক বাণী ও ভাষণ, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ড এবং মহত্তম চরিত্র তথা তাঁর গোটা জীবন যা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সমৃদ্ধ এবং তাঁর হিদায়াত ও শিক্ষা-দীক্ষারও বাস্তব নমুনা স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা তা নবীজীর উম্মাতের দ্বারা হাদীস সংকলন ও গ্রন্থায়ন করিয়ে এমনভাবে মু'জিযারূপে সংরক্ষণ করে রেখেছেন যে চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁর নবুওয়াতী জীবন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে; যেন তিনি স্বকীয় সত্তা নিয়ে এ দুনিয়ার আজও বিদ্যমান আছেন। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি তাঁর হাদীস ভাণ্ডারের দিকে তাকায় এবং যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ঈমানী সম্পর্ক থাকে, তবে সে গভীরভাবে অনুভব করবে যে, হাদীসের আয়নায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পুরো জীবন প্রতিফলিত হচ্ছে। সে দেখতে পায় যে, তিনি উঠাবসা করছেন, চলাফেরা করছেন, হাসছেন, সালাত আদায় করছেন লোক সমক্ষে ভাষণ দিচ্ছেন, আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করছেন এবং তাতে অঝোর ধারায় চোখের পানি ফেলছেন, ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ করছেন, হজ্জে তাওয়াফ ও সাঈ করছেন, কুরবানী করছেন ও মাথা মুণ্ডন করছেন, মসজিদের বারান্দায় ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করছেন অপরাধীদের শাস্তি বিধান করছেন এবং রণাঙ্গনে মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্বে দিচ্ছেন। আর এসব অবস্থায়ই সে তার অন্তরের কান দিয়ে তাঁর বাণী শুনতে পাবে। প্রকাশ্যও সাধারণ সমাবেশ ছাড়াও একান্ত

পরিবেশেও নবীজীর এমন অন্তরঙ্গ বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হবে যা তার নিকটাত্মীয় এমনকি পিতামাতা সম্পর্কেও জানতে পারে না।

কিছুদিন আগের কথা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও তাঁর গোটা জীবন দর্শন সংরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে স্বদেশীয় এক বিখ্যাত অমুসলিম ব্যক্তির কতিপয় বিভ্রান্তিকর ও জ্ঞান বর্জিত কথার জবাব দিতে গিয়ে আমি বলেছিলাম আমার বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ বছর তখন আমার সম্মানিত পিতা ইন্‌তিকাল করেন। বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার আমি আমার সম্মানিত পিতার কাছে ছায়ার ন্যায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি যে, হাদীসের মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যতটুকু জানতে পেরেছি, ততটুকু আমার সম্মানিত পিতা সম্পর্কে জানতে পারি নি। আল্লাহ্‌র শোকর, আমার বিশ্বাস আমি একথা ভুল বলি নি।

সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে ঈমানী সম্পদ লাভ ছাড়াও তাঁর সাথে গভীর ভালবাসাও প্রীতির ডোরে আবদ্ধ ছিলেন। ফলে তাঁরা তাঁর কাছে যা শুনতেন এবং যা কিছু তাঁকে করতে দেখতেন তা মুখস্থ করে রাখতেন এবং গভীর আগ্রহ ভরে আলোচনা করতেন। এটা ছিল প্রকৃত ঈমান ও ভালবাসার অনিবার্য দাবি। তাঁরা এটাকে নিজেদের গুরু দায়িত্ব, সৌভাগ্য এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে মনে করতেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা, বিশেষত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রা) তাঁর বাণীসমূহ লিখে রাখার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।১

তারপর যে সকল লোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানা পান নি বরং তাঁর সাহচর্য-ধন্য সাহাবা কিরাম এর সাক্ষাৎ পান তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে পুরো অংশই লাভ করেন। উল্লেখ্য খুলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সযত্ন তত্ত্বাবধানে হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে প্রণয়নের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়।২

ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী, হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র)-এর ন্যায় খ্যাতিমান তাবিঈ হাদীস গ্রন্থাকারে রচনার কাজ শুরু করেন। এর পর তাঁদের ছাত্রদের মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে।

---

১. খলীফা উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) মদীনার গভর্নর আবূ বাকর ইব্‌ন হায্‌মকে লক্ষ্য করে লিখেছেন ঃ

انظر ماكان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস তালাশ করে লিখে নিবে কেননা আমি ইল্‌ম ও উলামার বিলুপ্তির আশঙ্কা করি"।

ঐ সময় বিরচিত কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম মালিক (র) মুওয়াত্তা আজ পর্যন্ত প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। তিনি ছাড়াও অনেক হাদীস বিশারদ বহু হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও তা আজ পর্যন্ত গ্রন্থরূপে আমাদের সামনে বর্তমান নেই, কিন্তু পরবর্তীকালের সংকলনসমূহে তা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকে।

পরবর্তীকালে ইমাম আবদুর রায্যাক, ইমাম ইব্ন আবু শায়বা, ইমাম আহ্মাদ এবং হাফিযুল হাদীস হুমাইদী (র)-এর ন্যায় শত শত হাদীস বিশারদ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে একাজকে আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যান।

উপরিউক্ত হাদীস বিশারদগণের পর ইমাম বুখারী (র) ইমাম মুসলিম (র) এবং সুনান প্রণেতাদের যুগ শুরু হয়। তাঁদের সংকলিত সিহাহ্ সিত্তাহ (হাদীসের ছয়খানা বিশুদ্ধ কিতাব) আজও আমাদের সামনে সংকলন বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরপর তাঁদের সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে শত শত গ্রন্থ রচিত হয় এবং হাদীস বর্ণনা, গ্রন্থবদ্ধ ও সংরক্ষণকরণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর সাথে সাথে বর্ণনাকারীদের সমালোচনা মূলগ্রন্থও বিরচিত হতে থাকে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে চল্লিশ হাজারের অধিক বর্ণনাকারীর জীবন চরিত সম্বলিত 'আসমাউর রিজাল' নামে এক স্বতন্ত্র বিষয় গড়ে উঠে এবং তা গ্রন্থাগারের রূপ নেয়।

হাদীস রচনার পাশাপাশি হাদীস থেকে মূলনীতি সনাক্তকরণ এবং আহকাম চিহ্নিত করণের কাজ চলতে থাকে, ইমাম মালিক (র) যাঁর শুভ সূচনা করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখের গ্রন্থরাজিতে নমুনা লক্ষ্য করা যায়। ইমাম বুখারী (র)-এর 'তারজিমে আবওয়াব' এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

এরপরের শতাব্দীর প্রত্যেক শুভ সন্ধিক্ষণেই উম্মাতের আলিমগণ এই বিশাল হাদীস ভাণ্ডার থেকে পৃথক পৃথক খিদ্মত আঞ্জাম দিয়ে এ শাস্ত্রকে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধকরণের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে সব সময়ই আলিমগণ এ বিষয়ের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এর ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টিকা)

২. সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হাদীস লিখে রাখতেন। মুসনাদে আহ্মাদ ও সুনানে আবূ দাউদে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে হাদীস লেখার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

(সতের)

আমাদের বর্তমানকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বেশির ভাগ মানুষের চিন্তা-চেতনা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণা ব্যাপক প্রসার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। তাই বিংশ শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে বর্তমান সময়ের আলিমগণ কর্তৃক এই ধ্যান ধারণার পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতির ঢেউ লাগে, তখ্ন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপদানের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর আবির্ভার ঘটে। তাঁর ঐ কাজ আঞ্জাম দানকারীদের জন্য তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" আজো আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমার (গ্রন্থকার) মনে হয় হাদীস ও সুন্নাহর ব্যাপারে এই যুগে মানব মনের খোরাক রূপে এই গ্রন্থে যে উপকরণ বিদ্যমান আছে পুরো ইসলামী গ্রন্থাগারেও এর ন্যায় অনবদ্য দ্বিতীয় একটি গ্রন্থ পাওয়া যাবে না।

এ অধম (গ্রন্থকার) যেহেতু বিংশ শতাব্দীর এবং বিশেষত এই যুগের চিন্তাধারা সামনে রেখে হাদীসের ভাষ্য লেখার কাজ শুরু করেছি, যার ধারাবাহিকতায় এই তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, এই ভাষ্য রচনা করতে যেয়ে এ অধম "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" থেকে সবচাইতে বেশী উপকৃত হয়েছি।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) তাঁর এই অনবদ্য গ্রন্থে হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্ম নিরূপণে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ গ্রন্থ পাঠে এই যুগের মানুষের জ্ঞান পিপাসা সহজেই মিটে যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ গ্রন্থের আলোকে ফিক্‌হবিদ ও মুজতাহিদগণের মতবিরোধজনিত বিষয়ে চমৎকার সমাধান পাওয়া যায়। ফলে দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হয়ে যায় যে, এযেন সকল ইমামের সকল ফিক্‌হী মাসআলার একটি কুদরতী বৃক্ষের শাখা অথবা একটি বড় নদী থেকে প্রবাহিত স্রোতধারাসমূহ যে গুলোর উৎস একই এবং তা পরস্পর বিরোধী হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এই মহান ওলীর মূল্যবান গ্রন্থরত্ন আজও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান পায় নি, অথচ আমাদের বর্তমান যুগে উক্ত গ্রন্থখানা আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ নি'আমত স্বরূপ।

মা'আরিফুল হাদীসের এই তৃতীয় খণ্ডটি তাহারাত (পবিত্রতা) ও সালাত অধ্যায় সম্বলিত। এতে পাঠক এমন সকল হাদীস পাঠ করতে পারবেন যাতে ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন মাসআলায় মত পার্থক্যের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অধম (গ্রন্থকার) এমন মাস'আলা ও হাদীসের ব্যাখ্যা দান কল্পে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর গৃহীত মৌলিক নীতিমালা গ্রহণ করেছি।

এই খণ্ডের সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরী কথা

মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডে ঈমান ও আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর ও আত্মার পরিশুদ্ধি এবং চরিত্র সংশোধনের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ স্থান পেয়েছে আর তৃতীয় খণ্ডে ইসলামের ইবাদাতসমূহের তথা সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, যিক্‌র আযকার ও দু'আর সমন্বয়ে বিভিন্ন অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে পাঠকদের সামনে পেশ করার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহারাত ও সালাত অধ্যায় সন্নিবেশিত করতে নিয়ে গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচশ'র কাছাকাছি পৌঁছার ফলে তাহারাত ও সালাত অধ্যায় আলোচনা করে এই খণ্ডের সমাপ্তি টানা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ চতুর্থ খণ্ডে স্থান পাবে। অনুমান করা যাচ্ছে যে, ঐ খণ্ডের কলেবর অনুরূপ হবে।

মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডটি ১৩৭৩ হিজরী এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৩৭৬ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তৃতীয় খণ্ডটি এক বিশেষ বাধার কারণে প্রায় আট বছর পর এখন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী খণ্ড সম্পর্কে আমি একান্তভাবে আশাবাদী যে, আগামী বছর তা পাঠকদের খিদমতে পেশ করতে পারব ইনশা আল্লাহ্।

তাহারাত (পবিত্রতা) অধিকাংশ ইবাদত, বিশেষত সালাতের ক্ষেত্রে শর্তরূপে স্বীকৃত। তাই অধিকাংশ হাদীস বিশারদের রীতি এই যে, তাঁরা যখনই হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন তখন সালাত সহ অপরাপর বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের পূর্বে প্রথমে তাহারাত সংক্রান্ত হাদীসের স্থান দেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন আমি এই খণ্ডে হাদীস বিশারদগণের অনুসরণ তাহারাত অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অনধিক সত্তরটি হাদীস পেশ করেছি। এরপর সালাত অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩৫১ টি হাদীস সন্নিবেশিত করেছি। এসব হাদীস সন্নিবেশিত ও নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে আমাকে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে হয়েছে। হাদীস গবেষক এবং বর্তমান সময়ে যাঁরা ইল্‌ম ও দীনের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে সচেতন তাঁরা চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে, হাদীসের অনুবাদ ও ভাষ্য ছাড়াও এতে একটি স্বতন্ত্র গবেষণামূলক কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী দুই খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও হাদীসের অনুবাদ ও ভাষ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে এই হাদীসসমূহ অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদের এই সময়ের লোকদের মনে প্রবল আবেগ সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা তাঁরা যেন সাহাবা কিরামের ন্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার জ্যোতি লাভ করতে পারেন। তাই

ইচ্ছাকৃতভাবে নিছক ইল্‌মী, বিষয়ভিত্তিক ও পাঠ্যসূচি কেন্দ্রিক আলোচনা পরিহার করা হয়েছে।

তাই অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় মনে দাগকাটার মত হাদীসের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা এবং' প্রয়োজনে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

'আমীন' এবং 'রাফি' ইয়াদাঈন' এর সব পার্থক্য জনিত মাস'আলার ক্ষেত্রে পাঠক যাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা মানসিক পেরেশানী থেকে রক্ষা পান এবং তর্কযুদ্ধে লিপ্ত না হন তার সম্ভাব্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এসব মাস'আলার মধ্যে যা ঠিক ও যথার্থ তা কেবল আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আর যা কিছু ত্রুটিপূর্ণ তা এই অধমের জ্ঞানের অপূর্ণতারই ফসল।

প্রথম দুই খণ্ডের ন্যায় বেশির ভাগ হাদীস আমি 'মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্' থেকে চয়ন করেছি এবং মূলত এ গ্রন্থের উপরই সর্বাধিক নির্ভর করেছি। এতে আমি এ পদ্ধতিও অবলম্বন করেছি যে, যে হাদীস সহীহ্ বুখারী অথবা মুসলিম থেকে চয়ন করা হয়েছে তা অপরাপর কিতাবে থাকা সত্ত্বেও বরাত দানের ক্ষেত্রে সহীহ্ বুখারী অথবা সহীহ্ মুসলিমের নাম উল্লেখ করেছি। কেননা কোন হাদীস এতদুভয় গ্রন্থের যে কোন একটি সূত্রে উল্লেখ করছি উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। কিছু সংখ্যক হাদীস 'জামউল ফাওয়ায়িদ' থেকেও এবং কিছু সংখ্যক কানযুল উম্মাল থেকেও চয়ন করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে কানযুল উম্মালের বরাত উল্লেখ করেছি। কিছু সংখ্যক হাদীস বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সমূহ যেমন সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, জামি' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ ইত্যাদি থেকে চয়ন করেছি। তবে এসবের বরাত দানকালে উক্ত গ্রন্থ সমূহের নাম উল্লেখ করেছি। যেহেতু মিশকাত কিংবা জামউল ফাওয়ায়েদে সেগুলোর উল্লেখ নেই।

প্রথম দুই খণ্ডের ভূমিকায়ও আমি এসব কথাই লিখেছি যে, মা'আরিফুল হাদীস রচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দীনের দাওয়াত এবং হাদীস সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ, তাই হাদীসের শব্দ বিন্যাসের ব্যাকরণগত দিক এবং শাব্দিক অনুবাদের অনুসরণ অত্যাবশ্যক মনে করা হয়নি। বরং হাদীসের উদ্দেশ্য ও বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার প্রতিই লক্ষ্য করা হয়েছে। আর এদিকে লক্ষ্য করেই কোন কোন হাদীসকে পূর্বাপর করা হয়েছে।

পাঠকদের খিদমতে লেখকের শেষ আরয বা ওয়াসীয়্যাত

প্রথম দুই খণ্ডেও যেরূপ ভূমিকা পেশ করেছি। এখানেও ঠিক তাই করতে চাচ্ছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীসসমূহ পাঠ করে জ্ঞান রাজ্যের চৌহদ্দী বাড়ানোই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বরং তাঁর সাথে ঈমানী ও আমলী

যিন্দেগীর সম্পর্ক স্থাপন করে হিদায়াত প্রাপ্তি ও আমলের নিয়্যাত করাও অত্যাবশ্যক। হাদীস পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি গভীর ভালবাসা অন্তরে স্থান দেয়া উচিত এবং হাদীস এমনভাবে পাঠ করা উচিত যে, যেন আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মজলিসে উপস্থিত রয়েছি। তিনি যেন বাণী প্রদান করেছেন আর আমরা তা শুনছি। যদি আমরা এ পন্থা অবলম্বন করি, তবে ইনশা আল্লাহ্ অন্তরে ঈমানী নূর কিছু না কিছু নসীব হবেই যেমন নবী-যুগের লোকদের ভাগ্যে জুটেছিল এবং যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট থেকে ঈমানী ও আধ্যাত্মিক দৌলত লাভের তাওফীক দান করেছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্র নিকট ভুলভ্রান্তি ও গুনাহ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর বান্দাদের দু'আর মুখাপেক্ষী অধম গুনাহগার

১ রমাযানুল মুবারক ১৩৮৪ হিজরী

৫ জানুয়ারী ১৯৬৫

মুহাম্মদ মানযূর নু'মানী

তাহারাত (পবিত্রতা) অধ্যায়

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার হাকীকত এবং ইসলামে এর স্থান

ইসলামের দৃষ্টিতে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, কা'বাঘর তাওয়াফ ইত্যাদি ইবাদাত আদায়ের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন কেবল অত্যাবশ্যক শর্তই নয় বরং কুরআন হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, তা দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে। কুরআন মাজীদে তাই তো ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।" (২ সূরা বাকারা ঃ ২২২)

কুবা পল্লীতে বসবাসকারী মু'মিনদের প্রশংসায় কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ

" সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জনকে ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন।" (৯ সূরা তাওবা ঃ ১০৮)

উল্লিখিত আয়াত দু'টি থেকেই বুঝা যায় ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব কত বেশী। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম ক্রমিকে সহীহ্ মুসলিমের বর্ণিত হাদীসখানার অংশ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الاِيْمَانِ এর শাব্দিক অনুবাদেই এরূপ ইংগিত রয়েছে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন ইসলামের একটি বিধান মাত্র নয় বরং ধর্মের ও ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে।

অন্যান্য হাদীসে একে "ঈমানের অর্ধেক" বলেও উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের মুহ্তারাম উস্তাদ শায়খুল মাশায়িখ হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ্(র) এর একটি মূল্যায়ন এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এ কথার হাকীকত বুঝিয়েছেন যে, কল্যাণ লাভের রাজপথ হল শরী'আত, যার দিকে আহবান করার লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছে। এর (শরী'আত) অনেক শাখা রয়েছে এবং প্রত্যেক শাখার শত শত প্রশাখা রয়েছে। কিন্তু একে মোটামুটি চারটি শিরোনামে একত্র করা যেতে পারে। যথা ১. তাহারাত (পবিত্রতা). ২. বিনয় ৩. উদারতা ৪. ন্যায়নিষ্ঠা"।

এরপর শাহ্ওয়ালী উল্লাহ (র) প্রত্যেকটির হাকীকত বর্ণনা করেছেন যা গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, নিঃসন্দেহে সমগ্র শরী'আতকে এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।

আমি এখানে শাহ্ সাহেব (র)-এর কেবল সে প্রসঙ্গই আলোচনা করব যাতে তিনি পবিত্রতার হাকীকত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"কোনো সুস্থ মননের ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার মানুষ যার অন্তর পাশবিকতার দাবি পূরণ করেনি এবং তাতে জড়িয়েও পড়েনি, সে যখন কোনভাবে অপবিত্র হয়ে পড়ে চাই তা পেশাব পায়খানা দ্বারা হোক কি স্ত্রী সম্ভোগ দ্বারা সে নিশ্চয়ই নিজের মধ্যে এক প্রকার সংকোচ, রুচিহীনতা, মালিনতা, গ্লানি এবং অস্বচ্ছতা অনুভব করবে। তারপর যদি সে পেশাব পায়খানা সেরে নেয় এবং ভালভাবে ইস্তিন্জা ও উযু করে অথবা যদি সে স্ত্রী সম্ভোগ করে গোসল করে নেয় এবং ভাল কাপড় চোপড় পরে নেয় এবং সুগন্ধি মাখে তবে সে সংকোচ গ্লানি ও অস্বচ্ছতা থেকে সহসা মুক্ত হতে পারে। এছাড়াও সে তার নিজ স্বভাবে প্রবল আনন্দও অনুভব করে। সুতরাং বলা যায়, উপরে বর্ণিত দুই অবস্থার প্রথমটি অপবিত্রতা এবং দ্বিতীয়টি পবিত্রতা নামে পরিচিত। মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি সুস্থ স্বভাব ও প্রকৃতির অধিকারী, সে এ দুই অবস্থার মধ্যেকার ব্যবধান পরিষ্কারভাবে অনুভব করে এবং স্বভাবের দাবি হিসেবে অপবিত্রতা অপসন্দ করে এবং পবিত্রতা পসন্দ করে।"

"মানুষের এই পবিত্রাবস্থার সাথে আল্লাহর ফিরিশতাদের সাথে রয়েছে কতই না অপূর্ব মিল। কারণ তাঁরা সর্বদা অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও জ্যোতির্ময় অবস্থায় দিন কাটান। তাই সর্বক্ষণ পবিত্রাবস্থায় থাকা মানুষকে এনে দেয় ফিরিশতা সূলভ মাহাত্ম্য। ফলে মানুষ ও উর্ধ্ব জগতে অবস্থানকারীদের (নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশতাদের) থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন অপবিত্র অবস্থায় বিচরণ করে তখন তার সাথে শয়তানের অপূর্ব মিল লক্ষ্য করা যায়। আর তখন তার মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণা গ্রহণের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ফলে তার অন্ধকারের গভীর কুঠরীতে তলিয়ে যায়।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, অপবিত্রতা ও পবিত্রতা মানুষের আত্মিক ও সহজাত দু'টি অবস্থার নাম। আমরা যে সকল বস্তুকে নাপাকী এবং পবিত্রতা বলি তা প্রকৃতপক্ষে তার কারণসমূহ মাত্র এবং শরী'আত এই কারণসমূহের উপরই বিধান আরোপ করে এবং তা নিয়ে আলোচনা করে।

আশা করা যায় যে, তাহারাতের হাকীকত এবং মানবাত্মার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে হযরত শাহ সাহেব (র)-এর এই ভাষ্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, পবিত্রতা গোটা শরী'আতের এক চতুর্থাংশ বটে।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থের অন্য একস্থানে তাহারাতের বিধান এবং এর তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"তাহারাত তিন প্রকার। যথা - ১. অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়া অর্থাৎ যে সকল অবস্থায় গোসল অথবা উযূ ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব ঐ সকল অবস্থায় গোসল অথবা উযূ করে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান অপবিত্রতা এবং নাপাকী থেকে শরীর, কাপড় চোপড় বা কোন স্থানকে পবিত্র করা এবং ৩. শরীরের যে সকল স্থান থেকে দুর্গন্ধময় বস্তু অথবা ময়লা বের হয়–তা পরিষ্কার করা, যেমন. দাঁত পরিষ্কার করা, নাকের ময়লা পরিষ্কার করা, নখ কাটা এবং নাভীর নিচের চুল কর্তন করা।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, তাওরাত অধ্যায় , ১ম ২য় খণ্ড, পৃ.১৭৩)

নিম্নে সে সব হাদীস উপস্থাপিত হবে তার কিছু অংশ হবে সাধারণভাবে তাহারাতের সাথে সংশ্লিষ্ট যা উল্লিখিত তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আর কিছু অংশে ঐ তিন প্রকারের কোন এক প্রকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই ভূমিকার পর তাহারাত সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীস পাঠ করা যায়।

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

١- عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأَنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا - رواه مسلم

১. হযরত আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাহারাত-পবিত্রতা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। আল-হামদু লিল্লাহ্ আমলের পাল্লা ভরে দেয় এবং সুবহানাল্লাহ্ ও আল-হামদু লিল্লাহ্ পাল্লা ভরে দেয়, কিংবা রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সালাত হচ্ছে নূর বা আলো, দান-সাদাকা হচ্ছে দলীল, ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি, কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেকে ভোর উঠে আপন আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে, ফলে সে হয় নিজের মুক্তিদাতা কিংবা ধ্বংসকারী। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ স্পষ্টতই এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ভাষণ। এতে তিনি দীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করেছেন। এর প্রথম অংশ — اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الاِيْمَانِ পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণেই হাদীস গ্রন্থ সমূহের তাহারাত অধ্যায়ে এ হাদীসে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বক্ষ্যমান হাদীসে উদ্ধৃত " شطر " শব্দের অর্থ 'অর্ধেক'। কেননা এ মর্মে ইমাম তিরমিযী (র) সূত্রে অন্য একটি হাদীসে شطر শব্দের স্থলে نصف অর্থাৎ الطهور نصف الايمان (তাহারাত ঈমানের অর্ধেক) বলে বর্ণনা করেছেন।[১], কিন্তু আমার (গ্রন্থকার) মতে, شطر ও نصف শব্দদ্বয়ের অর্থ হচ্ছে তাহারাত ও পবিত্রতা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তাতেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কাজেই এর বেশী বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

---

১. জামে তিরমিযী, দাওয়াত অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতার গুরুত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ ও তাহ্‌মীদের সাওয়াব এবং ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তাসবীহ্ অর্থাৎ 'সুবহানাল্লাহ্' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের দৃঢ়-বিশ্বাসের প্রকাশ ও সাক্ষ্যদান যে আল্লাহ্‌র সত্তা অত্যন্ত পবিত্র এবং তাঁর জন্য যা অশোভন ও অসমীচীন তা থেকে তিনি পবিত্র।

তাহ্‌মীদ অর্থাৎ 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের দৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা ও সাক্ষ্য দান যে সার্বিক কল্যাণ ও মাহাত্ম্যের জন্য যাঁর প্রশংসা করা যায় তিনি কেবল সেই আল্লাহ্ তা'আলারই পবিত্র সত্তা। আর এজন্যেই সার্বিক প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। উল্লেখ্য যে তাসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ আল্লাহ্‌র নিষ্পাপ ফিরিশ্‌তাদের বিশেষ ওয়াযীফা। কুরআন মাজীদে ফিরিশতাদের যাবানেই তার প্রমাণ মিলে— "نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ" (আমরাই তো তোমার স্তুতিগান ও সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি)। সুতরাং দু'টি বাক্য মানুষের জন্য ও উত্তম ওয়াযীফা বিবেচিত হতে পারে। কারণ সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টার স্তুতি ও গুণগানে মানুষের নিরত থাকা চাই। তাই তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ্' মানুষের আমলের পাল্লা ভরে দেয়। সুবহানাল্লাহ্‌র সাথে যদি 'আল-হামদুল্লিাহ্' মিলিয়ে পাঠ করা হয় তবে উভয়ের জ্যোতিতে আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী অংশ আলোকময় হয়ে ওঠে। 'সুবহানাল্লাহ্' বলায় আমলের পাল্লা ভরে যাওয়া এবং 'সুবহানাল্লাহ্ ও আল-হামদু লিল্লাহ্' একত্রে বলায় আসমান-যমীন জ্যোতির্ময় হওয়ার মর্ম সম্পর্কিত উপলব্ধি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাদের দান করেন এবং আসমান-যমীন পূর্ণ জ্যোতি কেবল তাঁদের সামনেই ভেসে উঠে। আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন তার উপর অবিচল আস্থা রাখা এবং কাজে পরিণত করে উপকৃত হওয়া উচিৎ। তাস্‌বীহ ও তাহ্‌মীদের ফযীলত অনুপ্রেরণা দান করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের ব্যাপারে বলেন, 'সালাত আলো সদৃশ'। পৃথিবীতে সালাতের কার্যকর বৈশিষ্ট্যর বহিঃপ্রকাশ হয় তার বরকতে অন্তরে জ্যোতি সৃষ্টি হবার মধ্য দিয়ে। কাজেই যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে সালাত আদায় করে সে অন্তরে তা অনুভব করে। আর এ জ্যোতির প্রভাবে যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারে। তাই তো কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ "সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।" (২৯ সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫)

আখিরাতের বিভিন্ন মনযিলে সালাতের জ্যোতির প্রভাব এমনি হবে যাতে অন্ধকারের ঘনঘটা দূর হয়ে যাবে আর জ্যোতি মুসল্লীর সাথী হবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

"তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে।" (৬৬ সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৮)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান খায়রাত সম্পর্কে বলেন যে, এটা হচ্ছে প্রমাণ স্বরূপ । এ দুনিয়ায় দান সাদাকা প্রমাণ হওয়ার মর্ম হচ্ছে এটা প্রমাণ করে যে দাতা একজন মু'মিন ও মুসলিম। কারণ তাঁর অন্তরে যদি ঈমান না থাকত তবে নিজের উপার্জন থেকে দান করা তার পক্ষে কোন সহজ ব্যাপার ছিলনা। কেননা—

"گرزر طلبی سخن دریں است" "যদি সোনা চাও তবে তাতে কথা বলার আছে।" আখিরাতে এ বৈশিষ্টের প্রকাশ ঘটবে এভাবে যে, একনিষ্ঠদাতার দান খায়রাতকে তাঁর ঈমানের ও আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী হওয়ার প্রমাণরূপে গ্রহণ করে। তাঁকে পর্যাপ্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য সম্পর্কে বলেন ঃ ধৈর্য হচ্ছে এক প্রকার জ্যোতি। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিম সালাত ও সাদাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে এখানে 'সবর' এর অর্থ করেছেন সিয়াম। কিন্তু এই অধমের (গ্রন্থকার) মতে গ্রহণযোগ্য অভিমত হল, সবর বা ধৈর্য শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে 'সবর' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি সত্তাকে আল্লাহ্‌র আইনের অধীন করা এবং এ পথের যাবতীয় দুঃখ যাতনা ভোগ করতে থাকা। তাই এখানে 'সবর' অর্থ হচ্ছে, নিজেকে পুরোপুরি দীনের মধ্যে প্রবিষ্ট করা। এতে সালাত, দান-সাদাকা, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ছাড়াও আল্লাহ্‌র এবং তাঁর দীনের বিধান পালনের ক্ষেত্রে সর্ববিধ কষ্ট মেনে নেয়া এবং নিজ প্রবৃত্তিকে প্রদমিত রাখা, এসব বিষয়ই এর আওতাভুক্ত। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেছেন, 'সবর জ্যোতি সদৃশ'। কুরআন মাজীদে চাঁদের আলোকে 'নূর' এবং সূর্যের আলোকে 'যিয়া' বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا। "তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চাঁদকে জ্যোতির্ময় করেছেন।"(১০ সূরা ইউনুস ঃ ৫)

সবর ও সালাত থেকে নির্গত জ্যোতির সম্পর্ক হবে সূর্য ও চাঁদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক রয়েছে অনুরূপ। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজীদ সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ "কুরআন মজীদ হয় তোমাদের পক্ষে, নয় তোমাদের বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে।" একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ্‌র বাণী ও তাঁর পথনির্দেশ। সুতরাং এর

সাথে যদি তোমাদের ভাল সম্পর্ক থাকে এবং তোমরা যদি তার অনুসারী হও যেমনটি মু'মিনের ঈমানের দাবি, তাহলে তা হবে তোমাদের পক্ষে প্রমাণ আর বিপরীত হলে তা হবে তোমাদের বিপক্ষে প্রমাণ।

উল্লিখিত সতর্কবাণী ও অনুপ্রেরণামূলক বাণী প্রদানের পর রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের শেষাংশে ইরশাদ করেন ঃ 'এ দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ব্যস্ততার মাঝে দিন কাটায় এবং সে প্রত্যহ নিজ সত্তাকে বেচাকেনা করে। কখনো তা তাকে মুক্তি দেয়, আবার কখনো তা তাকে ধ্বংসের মুখোমুখি করে। এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, মানব জীবন একজন ব্যবসায়ীর ধারাবাহিক বেচাকেনার সাথে তুলনীয়। যদি সে আল্লাহ্র ইবাদাত এবং সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তবে সে নিজ জীবনের জন্য উত্তম বস্তুই উপার্জন করল এবং তার মুক্তির পথ সুগম করল। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে সে যদি প্রবৃত্তির দাস হয় আল্লাহ্কে ভুলে জীবন অতিবাহিত করে, তবে সে নিজের ধ্বংস নিজে ডেকে আনে এবং নিজকে জাহান্নামী করে তোলে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব তাৎপর্যের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর এই সতর্কবাণী ও অনুপ্রেরণা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন।

অপবিত্রতার কারণে কবরে শাস্তি

٢. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لاَ يَسْتَنْزِهُ) مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الاخرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا ، فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا – رواه البخارى و مسلم

২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন ঃ জেনে রেখ এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তবে কোন বিরাট ব্যাপারে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না অর্থাৎ এ থেকে বিরত থাকা কোন কঠিন কাজ ছিল না। তাদের একজনের গুনাহ ছিল এই যে, যে পেশাব কালে আড়াল করত না। (মুসলিমের বর্ণনায় আছে পেশাব থেকে পবিত্র হতো না) আর অপর জনের গুনাহ ছিল এই

যে, সে চোগলখুরী করে বেড়াত। এর পর তিনি খেজুরের তাজা একটি শাখা আনালেন। তারপর তা দু'টুক্‌রা করে উভয় কররের উপর একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবা কিরাম আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন একাজ করলেন? তিনি বললেন ঃ সম্ভবত এদের শাস্তি কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন এ তাজা শাখা দু'টো না শুকাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কবরের শাস্তি সম্পর্কে মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডে নীতিগত আলোচনা হয়েছে। সেখানে যে সব হাদীস পেশ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, কবরের শাস্তির শব্দ পার্শ্ববর্তী প্রাণীরা শুনতে পায়, কিন্তু মানুষ ও জিন তা শুনতে পায় না। এর কারণ যথাস্থানে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কবরের শাস্তির শব্দ শুনতে পাওয়ার ঘটনা পূর্বেই বিধৃত হয়েছে। উক্ত হাদীসে যেমন একটি ঘটনার বিবরণ এসেছে, তদ্রুপ এ হাদীসেও দ্বিতীয় একটি ঘটনার বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণের এমন সব অদৃশ্যের সংবাদ অবহিত করান এবং অদৃশ্য বিষয়ের শব্দ শুনান যা সাধারণ মানুষ চোখে দেখতে পায় না। এবং তাদের কান শুনতেও পায় না। বলাবাহুল্য এটি এ ধরনেরই একটি ঘটনা।

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে দু'ব্যক্তির শাস্তি হওয়ার কারণ রূপে পৃথক পৃথক গুনাহের বিষয় বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে চোগলখুরী করে বেড়াত, যা একটি গুরুতর চারিত্রিক অপরাধ। কুরআন মাজীদের এক স্থানে একে কাফির অথবা মুনাফিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ –

"যে কথায় কথায় শপথ করে, তুমি তার অনুসরণ করো না, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী,যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে দেয়।" (৬৮ সূরা কালাম ঃ ১০-১১)

কা'ব ইব্‌ন আহ্‌বার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে চোগলখুরীকে সর্বাধিক বড় গুনাহরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে,[১] অপর ব্যক্তির শাস্তির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ সে পেশাবের অপবিত্রতা থেকে নিজেকে রক্ষা করত না ও পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে অসতর্ক থাকত। (لا يستتر ولايستنزه সে পেশাবকালে আড়াল করত না অথবা পবিত্র হত না উভয়ের অর্থ প্রায় একই।)

১. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী (র) কৃত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উদ্ধৃত।

সহীহ্ বুখারীর এক বর্ণনায় "لا يستبرى" (সে পবিত্র হত না) শব্দ এসেছে। বলাবাহুল্য, এ শব্দ থেকে জানা যায় যে, প্রস্রাবের অপবিত্রতা বা এ ধরনের অন্য অপবিত্রতা থেকে নিজের শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখার চেষ্টা করা আল্লাহ্র নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া এবং অসাবধানতা অবলম্বন কবরে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে বিবেচিত।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তাজা খেজুরের শাখা আনালেন এবং তা দু'টুকরা করে উভয় কবরে এক টুকর করে পুঁতে দেন।

কোন সাহাবী এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ "আশা করা যায়, এ টুকরা দু'টি যতদিন তাজা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের কবরে শাস্তি লাঘব করা হবে।"

হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যায় কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন ঃ কোন তাজা শাখা যতদিন তাজা থাকে ততদিন তা প্রাণবন্ত থাকে এবং তা আল্লাহ্র গুণ-কীর্তনে রত থাকে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ "এমন কোন কিছুই নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না"। (১৭, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪) উল্লিখিত ভাষ্যকারদের মতে, এ হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে এরূপ ঃ "প্রত্যেক বস্তুই আজীবন আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এরপর যখন এ সব বস্তুর জীবনাবসান ঘটে তখন সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষাণারও পরিসমাপ্তি ঘটে। বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত ভাষ্যকারগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর ব্যাখ্যা এ রূপ করেন ঃ তিনি তাজা খেজুরের শাখা কবরে এ জন্য পুঁতে রাখেন যাতে তার তাসবীহ্ ও তাহ্মীদ পাঠে শাস্তি খানিকটা লাঘব হয়। খেজুরের শাখা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কবরের শাস্তি হাল্কা হওয়ার তিনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তার ভিত্তি হচ্ছে এই। কিন্তু অধিকাংশ ভাষ্যকার এ ব্যাখ্যাকে সঠিক নয় বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ব্যাখ্যা আমাদের নিকটও ভুল প্রতীয়মান হয়। কেননা প্রত্যেক জ্ঞানবান লোক যদি খানিকটা খতিয়ে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে কবরের উপর তাজা খেজুরের শাখা দু'টুকরা করে পুঁতে দিননি। কারণ তা দু'চার দিনের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। ব্যাপারটি যদি তাই হতো, তবে তিনি এমন কিছু পুঁতে দিতেন যা বছরের পর পছর ধরে তাজা থাকত। উল্লিখিত ব্যাখ্যা ভুল হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সাহাবা কিরাম যদি অর্থই বুঝতেন তবে সচরাচর তাই করতেন এবং সকল কবরে তাজা ডাল পুঁতে দিতেন বরং বৃক্ষ রোপন রীতিমত প্রথায় পরিণত হয়ে যেত অথচ ব্যাপারটি তা হয়নি।

মোটকথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একাজের উক্ত ব্যাখ্যা নির্ঘাত ভুল। এ সূত্র ধরে সুধি বুযুর্গদের কবরে ফুলের মালা পেশ করার শিরকী প্রথার বৈধতা আবিস্কার করা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ভাবধারার উপর গুরুতর আঘাত স্বরূপ।

তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কাজের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এই যে, তিনি সংশ্লিষ্ট কবরবাসীর শাস্তি লাঘবের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন। তারপর যেন এর জবাবে তাঁকে একটি তাজা ডাল দ্বিখণ্ডিত করে কবরে পুঁতে দেয়ার কথা জানানো হয় এবং এও অবহিত করা হয় যে, যতদিন তা তাজা থাকবে ততদিন কবরবাসীর শাস্তি খানিকটা লাঘব করা হবে। সহীহ্ মুসলিমের শেষ দিকে হযরত জাবির (রা) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতেও দু'টি কবরের কথা উল্লেখ আছে। তবে এটি একটি পৃথক ঘটনা। উক্ত হাদীসে হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাঁর কাছে দু'টি বৃক্ষের দু'টি শাখা কেটে আনি। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। তারপর যখন আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ ওখানে দু'টি কবরে শাস্তি হচ্ছে। আমি তাদের শাস্তি লাঘব করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ মর্মে ওহী করেন যে, যতদিন তাজা শাখা না শুকাবে ততদিন তাদের শাস্তি হাল্কা রাখা হবে। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে তাজা কোন শাখার মধ্যে শাস্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ আপনার দু'আয় এ সময় পর্যন্ত কবরের শাস্তি হাল্কা করা হল। সুতরাং বলা চলে, মূল বিষয় ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দু'আ এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত কবরে শাস্তি হাল্কা করার ফয়সালা।

কিছু সংখ্যক ভাষ্যকার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কবর দু'টির উপর তাজা খেজুর শাখা প্রোথিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন উক্ত কবরবাসীদ্বয় মুসলিম ছিল না অমুসলিম? এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। গ্রহণযোগ্য মত হলো, দু'টি কবরের অধিবাসীই মুসলমান ছিলেন।

এর একটি ইঙ্গিত এ হাদীসেই বিদ্যমান রয়েছে। চোগলখুরী ও পেশাবের ব্যাপারে অসতর্ক থাকার কারণে কবরে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যদি এ কবর দু'টি কোন কাফিরের হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তির কারণ হিসাবে একথা না বলে তাদের কুফর ও শিরকের কারণে শাস্তির কথা বলতেন। এছাড়াও মুসনাদে আহ্মাদে আবূ উসামা (রা) সূত্রে বর্ণিত, একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ কবর দু'টি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত ছিল। আর তিনি জান্নাতুল বাকী অতিক্রমকালে উক্ত কবর দু'টিতে শাস্তি হওয়ার বিষয় অনুভব করেন। একথা

সর্বজন বিদিত যে, মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত 'জান্নাতুল বাকী' মুসলমানদেরই কবরস্থান। মোটকথা এসব বিবেচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উক্ত কবর দু'টি ছিল দু'জন মুসলমানের।

এ হাদীসের বিশেষ শিক্ষা হচ্ছে এই যে, পেশাব পায়খানার অবিত্রতা থেকে পবিত্র থাকার ব্যাপারে সযত্ন দৃষ্টি রাখা চাই এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীর ও কাপড় চোপড় পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে পূর্ণ সচেষ্ট থাকা জরুরী। চোগলখুরীর মত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড থেকে ও নিজেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় দু'টি ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের হিফাযত করুন।

পেশাব পায়খানার সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَالَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَاَمَرَ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ - رواه ابن ماجه والدارمى

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্য পুত্রের জন্য পিতা সদৃশ। যেভাবে একজন পিতা তার সন্তানের কল্যাণ কামনায় জীবনের নিয়মনীতি ও আদব শিক্ষা দেন ও তেমনি আমি তোমাদের শিক্ষা দান করি। আমি তোমাদের এ শিক্ষাও দিয়ে থাকি যে, তোমরা পায়খানা করার সময় কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে বসবে না অর্থাৎ কিব্লার দিকে মুখ বা পিঠ ফিরে বসবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ইসতিন্জার জন্য তিনটি ঢেলা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন আর শুক্না গোবর টুকরা ও হাড় দ্বারা ঢেলা নিতে নিষেধ করেছেন। তিনি ডানহাত দিয়ে পায়খানা নেশাব পরিষ্কার করতেও নিষেধ করেছেন। (ইব্ন মাজাহ ও দারেমী)

٤. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهٗ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ - رواه مسلم

৪. হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার কাফিরদের তরফ থেকে বিদ্রুপ ছলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমাদের নবী তোমাদের সব কিছু শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব পায়খানার পদ্ধতিও ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে পেশাব পায়খানার সময় কিব্‌লামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে, তিনটি ঢেলার কম দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে এবং গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে নিষেধ করেছেন । (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ পানাহার যেমন মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক তেমনি পেশাব মানুষের একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন মানব জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়ে সমীচীন অসমীচীন তথা জায়িয না জায়িয ইত্যাদি বিষয়ের দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। উল্লিখিত দু'টি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

১. পেশাব পায়খানা করার সময় এমনভাবে বসা চাই যাতে কিব্‌লার দিক সামনে কিংবা পিছনে না থাকে। এ হচ্ছে কিব্‌লার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদব ও দাবী। প্রত্যেক বিবেকবান সচেতন ব্যক্তির কাছেই পেশাব পায়খানা করার সময় কিব্‌লার মত কোন পবিত্র জিনিস সামনে কিংবা পেছনে রাখা শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ বলে বিবেচিত হয়।

২. ডান হাত সাধারণত পানাহার, লেখা, কোন কিছু ধরা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। ডানহাত জন্মগতভাবে বামহাতের তুলনায় অধিক শক্তিশালী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কাজেই তা ইস্‌তিনজা কালে অপবিত্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যবহার না করাই উচিত। বিষয়টি এরূপ যে, প্রত্যেক সচেতন ভদ্র ব্যক্তিই শৈশবে তার সন্তানদের এ শিষ্টাচার ও ভদ্রোচিত পদ্ধতি রপ্ত করানো অত্যাবশ্যক মনে করে।

৩. দিক নির্দেশনা হচ্ছে এই যে, ইস্‌তিনজা থেকে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে কমপক্ষে তিনটি ঢেলা ব্যবহার করা চাই। কেননা সাধারণভাবে তিনটি ঢেলার কমে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। তবে কেউ যদি তিনের অধিক ঢেলা ব্যবহার করে, তাতে দোষের কিছু নেই। উল্লেখ্য, হাদীসে ইস্‌তিনজার জন্য পাথর-ঢেলার কথা বলা হয়েছে, তা বিশেষত আরবদের ব্যবহার বিধির দিকে লক্ষ্য করে। নতুবা পাথর ব্যবহার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। মাটির ঢেলা হোক বা এমনি ধরনের কোন বস্তু যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় তাই মূল উদ্দেশ্য। পাথর ব্যতীত অপরাপর ব্যবহারোপযোগী বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা অসমীচীন হবে না।

৪. চতুর্থ দিক নির্দেশনা হচ্ছে এই যে, কোন জীব-জন্তুর হাড় কিংবা শুক্‌না গোবর দ্বারা ইস্‌তিনজা থেকে পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন মিটানো উচিত নয়। যদিও জাহিলিয়্যা যুগে আরবরা দু'টি বস্তু পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) দু'টি বস্তু দ্বারা ইস্‌তিনজা করা থেকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। মোটকথা হল দু'টি বস্তু দ্বারা ইস্‌তিনজা করা প্রত্যেক ভদ্র ও রুচি সম্পন্ন মানুষের কাছে অশোভন বিবেচিত হয়।

٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّأَ - رواه أبو داؤد

৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইস্‌তিনজা করতে যেতেন, আমি ওখন তাঁর জন্য কাঁসার বা পাথরের পাত্রে আবার কখনো চামড়ার পাত্রে পানি এগিয়ে দিতাম। তিনি তা দ্বারা ইস্‌তিন্‌জা করতেন। অতঃপর মাটিতে হাত ঘষে নিতেন। এরপর আমি আরো একপাত্র পানি দিলে তিনি তারা দ্বারা উযূ করতেন। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যাঃ উল্লিখিত হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব-পায়খানা থেকে পাথর কিংবা অন্য কোন বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের পর আবার পানি দ্বারা পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করতেন। তারপর হাত মাটিতে ঘষে ধুয়ে নিতেন। এরপর আবার উযূও করে নিতেন। বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইস্‌তিন্‌জা ও উযূর পানি সরবরাহ করার সৌভাগ্য আমরাই হতো। তবে বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব আনাস (রা)-এর উপরও অর্পিত ছিল।

আলোচ্য হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করে নিতেন। তবে এ উযূ যে ফরয ও ওয়াজিব ছিল না বরং উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বুঝাবার জন্য তিনি কখনো কখনো এ ধরনের উযূ বর্জনও করতেন। সুনানে আবূ দাঊদ ও সুনানে ইব্‌ন মাজাহ্ গ্রন্থে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবের কাজ সেরে নেন এবং উমার (রা) উযূর পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি পানি গ্রহণ না করে বরং বললেন ঃ হে উমার! কেন তুমি পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে? উমার (রা) বললেন ঃ আপনার উযূর পানি নিয়ে আমি প্রতীক্ষা করছি। তিনি বললেন ঃ পেশাব করলেই উযূ করতে হবে, এরূপ আমি আদিষ্ট নই। কারণ আমি যদি এ কাজ অব্যাহত রাখি, তবে তা উম্মাতের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

এ হাদীস থেকে এও বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাস'আলার সঠিক স্বরূপ নিজ কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য এবং স্বীয় উম্মাতের ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য কখনো কখনো উত্তম বিষয়টি পরিহার করে চলেছেন।

٦– عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَاَنَسٍ اَنَّ هٰذِهِ الاٰيَةُ لَمَّا نَزَلَتْ : «فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنَى عَلَيْكُمْ فِىْ الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا اَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ ––– رواه ابن ماجة

৬. হযরত আবূ আইউব, জাবির ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ কু'বার মসজিদ সম্পর্কে যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ –

"সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পসন্দ করেন" (১০, সূরা তাওবা ঃ ১০৮)

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আনসারগণ! এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমাদের সে পবিত্রতা কি? তাঁরা বললেন ঃ আমরা সালাতের জন্য উযূ এবং অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে গোসল এবং পানি দ্বারা ইস্‌তিনজা করে থাকি অর্থাৎ ঢেলা ব্যবহারের পর পানিও ব্যবহার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ কারণ এটাই। সুতরাং তোমরা অবশ্যই সর্বদা একাজ করবে। (ইব্‌ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ আরবের বেশির ভাগ লোক কেবল ঢেলা ও পাথর কনা দ্বারা ইস্‌তিনজা করাকেই যথেষ্ট মনে করত। আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আরবরা সাদাসিধে খাবার খেত এবং তাদের যথেষ্ট শক্তি থাকায় তাদের পায়খানা উটের বিষ্ঠার ন্যায় শুকনা হতো, এজন্য ইস্‌তিনজার কাজে তাদের পানি প্রয়োজন হতো না। তারা কেবল পাথর কনা দিয়ে ইস্‌তিনজা করাকে যথেষ্ট মনে করত। কিন্তু আনসারগণ ইস্‌তিন্‌জার কাজে পাথর কনা ব্যবহারের পর পানিও ব্যবহার করতেন। তাঁদের এহেন পবিত্রতা অর্জনের প্রশংসা করে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে একাজ অব্যাহত রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। বলাবাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আমলও ঠিক এরূপই ছিল। কুরআন মাজীদ এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী ও আমল মুসলিম

উম্মাতকে এ দিক নির্দেশনা দেয় যে, কারো শুকনা পায়খানা হওয়ায় তা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ঢেলা কিংবা পাথর কনা যদি যথেষ্ট মনে করা হলেও পানি দ্বারা ইস্তিনজা করে নেয়া এবং মাটিতে হাত ঘষে নেয়া উচিত। কারণ এটাই প্রশংসনীয় পরিচ্ছন্নতার দাবি এবং আল্লাহ্‌র নিকট পসন্দনীয় পদ্ধতি।

٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوْا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَااللاَّعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ - رواه مسلم

৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দু'টি অভিশাপের কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবা কিরাম আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে কাজ দু'টি কি? তিনি বললেন ঃ মানুষের চলার পথে অথবা ছায়াযুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা করা। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের সারকথা হচ্ছে এই যে, মানুষের চলার পথে অথবা ছায়াযুক্ত স্থান-যেখানে মানুষ খানিকটা বিশ্রাম করে, এমন স্থানে যদি কেউ পেশাব পায়খানা করে তাতে মানুষের ভীষণ কষ্ট হয় এবং মানুষ উক্ত ব্যক্তিকে গালমন্দ করে এবং অভিসম্পাত দেয়। সুতরাং এহেন মন্দকাজ পরিহার করা উচিত। সুনানে আবূ দাঊদে মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে মানুষের চলার পথ ও ছায়াযুক্ত স্থান ব্যতীত তৃতীয় একটি কথারও উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে, পানি প্রাপ্তিস্থান, যেখানে মানুষের আনাগোনা আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এর বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঘর-বাড়ী ব্যতীত অন্য স্থানে কারো পেশাব-পায়খানার বেগ হলে সে যেন এমন স্থান বেছে নেয় যেখান দিয়ে মানুষ চলাচল করে না যাতে মানুষকে কষ্টেরও শিকার হতে না হয়।

٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتّٰى لاَيَرَاهُ اَحَدٌ - رواه ابو داؤد

৮. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব-পায়খানা করতে চাইলে এমন স্থানে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব স্বভাবে লজ্জা- শরম, শরাফত ও ভদ্রতার যে গুণাবলী দান করেছেন তার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, কারো যদি প্রকৃতির কাজ সেরে

নিতে হয়, তবে সে যেন লোক চক্ষুর আড়ালে যায়, চাই তাকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হোক না কেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল এবং তাঁর মহান শিক্ষা।

٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ - رواه أبوداؤد

৯. হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করতে একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম নিচু জায়গায় চলে গেলেন এবং অতঃপর পেশাব করলেন। এরপর বললেনঃ তোমাদের কেউ পেশাব করতে চাইলে সে যেন উপযুক্ত জায়গায় খুঁজে নেয়। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ পেশাব পায়খানার কাজ সম্পাদনের জন্য এমন জায়গা খুঁজে নেয়া উচিত যেখানে পর্দা রক্ষিত হয়, যেখানে পেশাবের ছিটা গায়ে না পড়ে এবং দিক সনাক্ত করার ক্ষেত্রে বিভ্রাট না ঘটে।

আল্লাহ্র অগণিত রহমত ঐ মহান নবীর উপর বর্ষিত হোক যিনি তাঁর উম্মাতকে পেশাব পায়খানার শিষ্টাচারও শিক্ষা দিয়েছেন।

١٠- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ - رواه أبو داؤد

১০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলের জায়গায় পেশাব করে সেখানে গোসল কিংবা উযূ না করে। কেননা অধিকাংশ সন্দেহ (ওয়াস্ওয়াসা) এসব বিষয় থেকেই সৃষ্টি হয়। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন মানুষ যদি গোসলখানায় পেশাব করার পর সেস্থানে গোসল কিংবা উযূ করে, তা হবে নির্ঘাত শিষ্টাচার বিবর্জিত কাজ। কারণ এহেন কাজের একটি খারাপ পরিণতিও রয়েছে। তা হলো এতে পেশাবের ছিটা লাগার সম্ভাবনা থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী শেষাংশ থেকে বুঝা যায় যে, গোসলখানায় পেশাব করার পর গোসল কিংবা উযূ করা হলে যদি তার ফোটা

শরীরে কিংবা পোশাকে লাগার আশংকা থেকে যায় তবে তা নিষেধের আওতাভূক্ত। অন্যথায় গোসলখানা যদি এরূপ তৈরি করা হয় যে, পেশাবের স্থান আলাদা এবং পানি ঢেলে দেওয়ার পর তা বিদূরিত হয়ে স্থান পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বিধান প্রযোজ্য হবে না।

١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ - رواه ابوداؤد والنسائى

১১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে। (আবু দাঊদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ বনজঙ্গলে ও ঘরে সাধারণ হিংস্র প্রাণী গর্ত করে থাকে। সুতরাং যদি কোন আনাড়ী লোক কিংবা অবোধ শিশু গর্তে পেশাব করে, তবে একদিকে উক্ত গর্তে বসবাসকারী প্রাণীকে অযথা কষ্ট দেওয়া হয়, অন্যদিকে গর্তে বসবাসরত সাপ-বিচ্ছু জাতীয় বিষাক্ত প্রাণী বেরিয়ে এসে দংশনও করতে পারে। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে থাকে। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান দানের ক্ষেত্রে তাঁর উম্মাতের জন্য একজন আদর্শ মহান শিক্ষক। তাই তিনি গর্তে পেশাব করে বিপদ আনার ব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন।

পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

١٢- عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ - رواه ابن ماجة وأبو داؤد

১২. হযরত যায়িদ ইব্ন আকরাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পায়খানার স্থানসমূহ হচ্ছে জিন্ শয়তানের উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে এই দু'আ পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে নর ও নারী শয়তান থেকে পানাহ চাচ্ছি।" (আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আল্লাহ্র যিক্র ও ইবাদাতের সাথে যেমন ফিরিশ্তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অনুরূপভাবে অপবিত্র শয়তানের গভীর সম্পর্ক

রয়েছে অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত স্থানের সাথে এবং তা-ই তার কাছে আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক স্থান। তাই তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ কারো যদি প্রয়োজনে পায়খানায় যেতে হয়, তবে তার সেখানকার নর ও নারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়া উচিৎ এবং তার পরে পায়খানায় পা রাখা উচিৎ। কিন্তু সাধারণ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমরা না ইবাদাতের স্থানে ফিরিশ্তাদের উপস্থিতি অনুভব করি না দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে শয়তানের উপস্থিতি উপলব্ধি করি। তাই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাঁর কিছু সংখ্যক বান্দার কখন ও কখনও এরূপ উপলব্ধি হয় এবং তাঁদের ঈমান উৎকর্ষ লাভ করে।

পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসার পর দু'আ

١٣– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ – رواه الترمذى وابن ماجة

১৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ غُفْرَانَكَ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি"। (তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর যে মাগফিরাত কামনা করতেন। তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক সূক্ষ্ম, হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা অধমের (গ্রন্থকার) কাছেই এই পারে যে, মানুষের পেটে যে দুর্গন্ধময় পায়খানা জমা হয় তা প্রতিটি মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই যদি তা সময়মত বের করে না দেয়া যায় এবং বারবার পায়খানা করতে হয় তবে তা এক ধরনের রোগ বৈকি! পক্ষান্তরে সাধারণ সুস্থতার দাবি অনুসারে যদি পেট থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যায় তাতে মানুষ মাত্রই শরীরে হাল্কা ও স্বস্তি অনুভব করে। আর এ অভিজ্ঞতা প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। প্রত্যেক সচেতন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের পেটের ময়লার মত গুনাহও বোঝা স্বরূপ। তাই সাধারণ মানুষ পেটের ময়লা দূর করতে যেমন সচেষ্ট, তারা তার চাইতে বেশী সচেষ্ট পিঠ থেকে দুর্ণামের বোঝ দূর করতে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর পেট থেকে অতিরিক্ত বস্তু বের করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। তখন আল্লাহ্র মহান দরবারে এই বলে দু'আ করতেন– "হে আল্লাহ্! তুমি আমার শরীর থেকে অতিরিক্ত বস্তু বের করে যেমন হাল্কা করেছ এবং শান্তি স্বাচ্ছান্দ্য দান করেছ, তদ্রূপ গুনাহ্ থেকে আমার আত্মাকে পরিচ্ছন্ন কর এবং গুনাহর বোঝা থেকেও আমার পিঠ হাল্কা করে দাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিম্নবর্ণিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াত দ্বারা নিষ্পাপ ঘোষণা করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ-

"যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন।" (৪৮, সূরা ফাতহ্ :২)

কুরআন মজীদে-এ ঘোষণা থাকার পরও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন ইস্তিগফার পাঠ করতেন। ইনশাআল্লাহ্ সালাত অধ্যায়ের তাহাজ্জুদ অনুচ্ছেদে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

١٤- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الاذى وَعَافَانِىْ - رواه النسائى-

১৪. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ -

"মহান আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক অপবিত্রতা দূর করলেন এবং আমাকে নিরাপদ রাখলেন।"

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে উল্লিখিত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে কেবল غفرانك (হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা কর) পাঠ করতেন। পক্ষান্তরে আবূ যার (রা) সূত্রে আলোচ্য হাদীস থেকে দ্বিতীয় দু'আ টি জানা যায়। উভয় দু'আই পরিবেশ ও অবস্থার উপযোগী। সুতরাং বলা চলে, কখনো তিনি পূর্বোক্ত দু'আ আবার কখনো আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দু'আ পাঠ করতেন।

উযূ ঃ উযূর মাহাত্ম্য ও বরকত

আমি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর বরাতে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সকল মানুষ পাশবিকতার নিগড় উৎরে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করেছেন, পেশাব পায়খানা বা অন্য কোন কারণে তাদের উযূ ভঙ্গ হলে তারা তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় ঘোর অন্ধকার ও গ্লানি অনুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে এই অনুভূতিরই অপর নাম অপবিত্র অবস্থা। ইসলামী শরী'আত এ অপবিত্র অবস্থা দূরীকরণের লক্ষ্যে উযূর ব্যবস্থা করেছে। যে সকল লোক পাশবিকতার নিগড় থেকে মুক্ত এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পড়েনি তারা অপবিত্র অবস্থায়

নিজেদের অপবিত্রতার দুর্গন্ধ ও অন্ধকার অনুভব করেন এবং মনে করেন তা থেকে উত্তরণের এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও জ্যোতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেবল উযূই ভূমিকা পালন করতে পারে। এটাই উযূর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। আর এজন্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সালাত আদায় করার সময় উযূ আবশ্যকীয় করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা উযূর সঙ্গে তার আরও অনেক অনুগ্রহ ও বরকতের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন তাঁর উম্মাতকে উযূর পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানূন শিক্ষা দিয়েছেন। তদ্রুপ ফযীলত ও বরকত সম্পর্কেও বাণী প্রদান করেছেন। কাজেই এ পর্যায়ে কতিপয় হাদীস পাঠ করা যাক।

উযূ পাপ মোচনের মাধ্যম

١٥- عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ- رواه البخارى ومسلم

১৫. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ্ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের ভেতর থেকেও (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত সুন্নাত পদ্ধতি অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে উত্তমরূপে উযূ করে-এতে কেবল তার উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের ময়লা ও অপবিত্রতাই দূরীভূত হয়না বরং এর বরকতে তার সমগ্র দেহ থেকে গুনাহের অপবিত্রতা ও ময়লা বিদূরিত হয়ে যায় এবং উযূকারী কেবল উযূ বিহনী অবস্থা থেকেই নয় বরং গুনাহ্ থেকেও পবিত্র হয়ে যায়।

١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ- رواه مسلم

১৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান, কিংবা তিনি বলেছেন, মুসলিম বান্দা যখন উযূ করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে, অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার দু চোখের দৃষ্টি পড়েছিল। যখন দু'হাত ধোয় তখন পানির সাথে, অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, সেগুলো তার দু'হাত দিয়ে ধরেছিল। যখন সে দু'পা ধোয় তখন পানির সাথে, অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যেগুলোর জন্য তার দু'পা ব্যবহার দ্বারা হয়েছিল। ফলে লোকটি উযূ করার পর সমুদয় গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে কয়েকটি অংশের ব্যাখ্যা- ১. উপরে বর্ণিত হাদীস দু'টিতে উযূর পানির সাথে দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ দূরীভূত হবার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। অথচ দৃশ্যমান ময়লার ন্যায় গুনাহ'র ময়লা এমন বস্তু নয় যা পানির সাথে চলে যাবে এবং ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোন কোন ভাষ্যকার এর ব্যাখ্যায় বলেন, গুনাহ বিদূরিত হবার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ কর্তৃক পাপমোচন এবং তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। কিছু সংখ্যক ভাষ্যকারের মতে, মানুষ তার যে সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা গুনাহের কাজ করে, প্রথমত তার খারাপ প্রভাব উক্ত অঙ্গসমূহে, তারপর তা অন্তরে বসে যায়। এরপর যখন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আলোকে নিজকে পবিত্র করার লক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত সুন্নাত পদ্ধতি অনুযায়ী উযূ করে তখন সে যে সকল অঙ্গ দ্বারা গুনাহ্ করেছিল এবং গুনাহের মন্দপ্রভাব যে সব অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অন্তরে যে গুনাহ্ বসে গিয়েছিল উযূর পানির সাথে তা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। এর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার গুনাহ্‌সমূহও ক্ষমা করা হয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অধমের নিকট হাদীসে বর্ণিত শব্দ হচ্ছের অধিক কাছাকাছি।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে মুখমণ্ডল ধোয়ার সাথে কেবল চোখের গুনাহ বিদূরিত হবার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অথচ মুখমণ্ডলে চোখ ব্যতীত নাক, জিহ্বা ও মুখ রয়েছে এবং এসব অঙ্গের সাথেও কোন কোন পাপের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সামগ্রিকভাবে উযূর অঙ্গসমূহের কথা বলেন নি, বরং উদাহরণ স্বরূপ চোখ, হাত ও পায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়কে আরও বিস্তারিত এক হাদীস ইমাম মালিক এবং নাসাঈ (র) আবদুল্লাহ্ সানাবিহী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উক্ত

হাদীসে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার সাথে সাথে জিহ্বা, মুখ ও নাকের গুনাহ্ ধুয়ে মুছে সাফ হওয়ার বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে।

৩. সৎকাজের এমন শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে যে, তা গুনাহের দাগ ও চিহ্ন ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়" (১১, সূরা হূদ ঃ ১১৪)

উল্লিখিত হাদীস সমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ বিশেষ সৎকর্মের নাম ধরে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তা হচ্ছে, অমুক সৎকাজ গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়, অমুক সৎকাজে গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়, অমুক সৎকাজ দ্বারা গুনাহের প্রতিবিধান হয়ে যায়। পূর্বেও এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং সামনেও বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বর্ণিত হবে। কোন কোন হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টরূপে বলেছেন ঃ এসব নেককাজের বরকতে সগীরা গুনাহসমূহে বিমোচিত হয়ে যায়। এ সূত্র ধরে হকপন্থী আলিমগণ বলেন ঃ সৎকাজ দ্বারা কেবলমাত্র সগীরা গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করা হয়। কুরআন মাজীদেও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ -

"তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব।" (৪, সূরা নিসা ঃ ৩১)

মোদ্দাকথা, উল্লিখিত দু'টি হাদীসে উযূর বরকতে যে সকল গুনাহ্ বিধৌত ও বিদূরিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে তার দ্বারা সগীরা গুনাহসমূহে বুঝানো হয়েছে। কবীরা গুনাহর বিষয়টি খুবই গুরুতর এ থকে উত্তরণের পথ একটাই, আর তা হচ্ছে তাওবা।

উযূ জান্নাতের সকল দরজা উম্মোচনের চাবি

١٧- عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّاءُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُهَا مِنْ اَيُّهَا شَاءَ -- رواه مسلم

১৭. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উযূ করবে এবং পূর্ণভাবে উযূ করবে

অতঃপর

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল"– পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এরপর সে উক্ত দরজাসমূহের যে কোনটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উযূ করায় সাধারণত বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচ্ছন্ন হয়। তাই মু'মিন ব্যক্তি যখন উযূ করে তখন সে মূলতঃ আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে এবং বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করে। কিন্তু প্রকৃত আবর্জনা ও মালিন্য হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা, নিষ্ঠার ঘাটতি এবং মন্দ কাজের জঞ্জাল। এ অনুভূতিকে সামনে রেখে ঈমানকে নূতন করার লক্ষ্যে, আল্লাহ্র ইবাদতে নিষ্ঠার পরিচয় দিতে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ অনুসরণ করতে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে যেন নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এর ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাঠকের জন্য মাগফিরাতের পূর্ণ ফয়সালা হয়ে যায়। তাই হাদীসে বলা হয়েছে যে, তার জন্য জান্নাতের সকল দরজা উন্মুক্ত।

ইমাম মুসলিম (র) অন্যত্র কালেমা শাহাদাতের নিম্নোক্ত শব্দগুচ্ছও বর্ণনা করেছেন–

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।"

ইমাম তিরমিযী (র) এ হাদীস বর্ণনায় নিম্নোক্ত শব্দগুচ্ছ ও উল্লেখ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল কর।"

কিয়ামতের দিন উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে জ্যোতি চমকাবে

١٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ أُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ -رواه البخارى ومسلم

১৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে আহবান করা হবে, উযূর চিহ্নের দরুন। তাদের চেহারা, হাত ও পা হতে জ্যোতি চমকাবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঔজ্জ্বল্যকে বাড়াতে চায়, সে যেন তাই করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ায় উযূর প্রভাব কেবল এতটুকু পরিদৃষ্ট হয় যে, চেহারা ও হাত-পা পরিষ্কার হয়ে যায়। অধিকন্তু আধ্যাত্মিক মনন সম্পন্ন নিষ্ঠাবান লোকেরা আত্মিক সজীবতা ও আনন্দ অনুভব করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এবং অন্যান্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, উযূর বরকতে কিয়ামতের দিন উযূকারীর চেহারায় প্রোজ্জল আভা ও দীপ্তি শোভা পাবে এবং অন্যান্যদের মধ্য থেকে বেছে নেয়ার চিহ্নও হবে। যার উযূ যত উত্তম ও পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে তার জ্যোতি ও ততবেশী দীপ্তিময় হবে। তাই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের শেষাংশে বলেছেন ঃ যে পারে সে যেন তার জ্যোতি বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করে। এর পদ্ধতি হচ্ছে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে উযূর নিয়ম-কানূনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে উযূ করা।

কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা

١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخَطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطِ - رواه مسلم

১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলব না যাতে করে আল্লাহ্ তোমাদের পাপরাশি মিটিয়ে দেবেন এবং মর্যাদা সমুন্নত করবেন? সাহাবা কিরাম আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ তা হল অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে উযূ করা, মসজিদে আসার জন্য অধিক পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রেখ, এটাই হচ্ছে রিবাত- প্রকৃত সীমান্ত প্রহরা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন এবং বলেছেন ঃ এসকল কাজ করায় পাচমোচন হয় এবং উত্তরোত্তর মর্যাদা বেড়ে যায়। কাজগুলো হলো ঃ

১. উযূ করার সময় যদি কষ্টও হয় তবুও পূর্ণরূপে উযূ করা এবং সুন্নাত পরিপন্থী সংক্ষিপ্ত উযূ না করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি শীতকাল হয়, পানি ভীষণ ঠাণ্ডা হয়, বা পানি এত কম হয় যাতে সুন্নাত মুতাবিক প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করা না যায় ইত্যাদি অবস্থায় যদি পর্যাপ্ত পানির জন্য দূরে যেতে হয় এবং কষ্ট স্বীকার করে সুন্নাত মুতাবিক পুরোপুরি উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করা হয়, তবে তা হবে এমনই পসন্দনীয় কাজ যে, এর বরকতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং মর্যাদা সমুন্নত করে দিবেন।

২. দ্বিতীয় কাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ 'মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা।' অর্থাৎ মসজিদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা। সালাত আদায়ের জন্য বার বার মসজিদে যাওয়া এবং যার ঘর মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত তার অধিক সাওয়াব লাভ করে ধন্য হওয়া।

৩. তৃতীয় কাজ সম্পর্কে বলেছেন ঃ এক সালাত আদায়ের পর অন্য সালাতের প্রতীক্ষায় থাকা এবং এর দিকে অন্তর নিবদ্ধ রাখা। বলাবাহুল্য, সালাত আদায়ের যার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে কেবল তারই এহেন অবস্থা হয়ে থাকে এবং তারই ভাগ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি قُرَّةُ عَيْنِىْ فِىْ الصَّلٰوةِ

"হে আল্লাহ্! সালাত দ্বারা আমার চোখ জুড়িয়ে দাও"- এর অনুভূতির কিছুটা নসীব হয়।

হাদীসের শেষাংশে তিনি বলেছেন ঃ এই হচ্ছে প্রকৃত 'রিবাত'। রিবাতের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় প্রহরারত থাকা। প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সীমান্তে যে যোদ্ধাদের মোতায়েন করা হয় এবং তারা যে প্রহরারত থাকে তারই নাম 'রিবাত'। একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এ হচ্ছে একটি বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন কাজ। কারণ সর্বদা জীবনের ঝুঁকি থাকে। হাদীসে বর্ণিত উল্লিখিত তিনটি কাজকে সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য বিরাত বলেছেন যে, এসকল কাজের মাধ্যমে শয়তানের ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং শয়তানের হামলা থেকে ঈমান রক্ষা করা হয়। বলা বাহুল্য, এদিক বিবেচনায় রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার চেয়ে ঈমান রক্ষার বিষয়টি আরো অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে।

পূর্ণ গুরুত্বের সাথে উযূ করা ঈমানের লক্ষণ

٢- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمْ الصَّلٰوةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الِاَّ مُؤْمِنُ - رواه مالك وأحمد وابن ماجة والدارمى

২০. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা সঠিক পথে অবিচল থাকো। তবে কখনো তোমরা পূর্ণ অবিচল থাকতে পারবে না (তাই নিজেদের ত্রুটির কথা স্মরণ রাখবে)। জেনে রেখ, তোমাদের কাজ সমূহের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বোত্তম এবং মু'মিন ব্যতীত কেউই যথোচিত পদ্ধতিতে উযূ করে না। (মালিক, আহ্‌মাদ. ইব্‌ন মাজাহ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ উযূর প্রতি যত্নবান সতর্ক থাকার অর্থ এও হতে পারে, সর্বদা সুন্নাত পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তমরূপে উযূ করা। আবার এও হতে পারে, সব সময় উযূ অবস্থায় থাকা। ভাষ্যকারগণ উভয় ব্যাখ্যাকে অনুমোদন করেছেন। অধমের (গ্রন্থকার) নিকট উভয় ব্যাখ্যাই যথার্থ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই হাদীসে "উযূর প্রতি যত্নবান থাকা" কে পূর্ণ ঈমানের এবং অবিচল বিশ্বাসের প্রতিফলন বলে বর্ণনা করেছেন।

উযূ থাকা অবস্থায় পুনঃ উযূ করা

٢١- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ - رواه الترمذى

২১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ থাকা অবস্থায় পুনঃ উযূ করবে তাকে দশটি নেকী দান করা হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে , উযূ থাকা অবস্থায় পুনঃ উযূ করাকে কেউ যেন নিরর্থক মনে না করে। বরং একাজ এমন উত্তম যে, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলিম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীস ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে প্রথম উযূ দ্বারা এমন ইবাদাত করল যার জন্য উযূ প্রয়োজন। আর যদি কেউ অযূ করল এবং এ অযূ দ্বারা কোন ইবাদত করল না কিংবা এমন কাজ না করে যার জন্য নূতন উযূ করা মুস্তাহাব হয়, এমতাবস্থায় তার পক্ষে নূতন করে উযূ করার আদৌ প্রয়োজন নেই।

অসম্পূর্ণ উযূর অশুভ প্রভাব

٢٢- عَنْ شُبَيْبِ بْنِ اَبِىْ رَوْحٍ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ

مَابَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ وَاِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُوْلٰئِكَ -رواه النسائى

২২. শুবায়ব ইব্‌ন আবূ রাওহ্ (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জনৈক সাহাবা থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি তাতে সূরা রূম পাঠ করেন। কিন্তু কিরা'আতে বিভ্রাট হয়ে যায়। সালাত আদায় শেষে তিনি মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ লোকদের কী হলো তারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করছে অথচ উত্তমরূপে উযূ করেনি। ঐসকল লোকই আমাদের কিরা'আতে বিভ্রাট সৃষ্টি করে । (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, উযূবিহীন অবস্থা কিংবা উত্তমরূপে উযূ না করার প্রতিক্রিয়া অপরাপর উযূকারীদের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে কিরা'আতে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অপূর্ণ উযূর প্রভাব এত কার্যকর হয় তবে আমাদের ন্যায়সাধারণ লোকদের উপর তার অশুভ প্রভাব কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আমাদের অন্তরে মরিচার স্তর জমাট হয়ে যাওয়ায় এর অশুভ প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুভূত হয় না। এ হাদীস থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, মানুষের অন্তরের উপর পাশের লোকের ভালমন্দ অবস্থার প্রভাব পড়ে। সূফী আউলিয়াগণ এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান রাখেন।

মিস্‌ওয়াকের গুরুত্ব ও ফযীলত

পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন তন্মধ্যে মিস্‌ওয়াক অন্যতম। এক হাদীসে ত তিনি এমনও বলেছেন ঃ সকল সালাতের পূর্বে মিস্‌ওয়াক করা যদি আমি আমার উম্মাতের উপর কষ্টকর মনে না কারতাম, তাহলে প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিস্‌ওয়াক করা অপরিহার্য ঘোষণা করতাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মিস্‌ওয়াক করায় যে অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা বর্তমানে অল্প-বিস্তার সকলেই জানেন। কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে এর প্রকৃত গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, মিস্‌ওয়াক আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার সর্বাধিক কার্যকর মাধ্যম । এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মিস্‌ওয়াকের প্রতি অনুপ্রেরণা ও গুরুত্বরোপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় হাদীস পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

٢٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ - رواه الشافعى أحمد والدارمى والنسائى وروى البخارى فى صحيحة بلا إسناد-

২৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলন, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিস্ওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। (শাফিঈ, আহ্মাদ, দারিমী, নাসায়ী; বুখারী সনদহীন সূত্রে)

ব্যাখ্যা ঃ কোন বস্তুর সৌন্দর্যের দু'টি দিক হতে পারে। একটি হল, দুনিয়াতে উপকারী এবং সাধারণ মানুষের কাছে পসন্দনীয় হওয়া এবং অপরটি হল, আল্লাহ্র কাছে প্রিয় সাব্যস্ত হওয়া এবং আখিরাতে সাওয়াব প্রাপ্তির মাধ্যম হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে উভয়বিধ উপকারিতার প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। কারণ মিস্ওয়াক করায় মুখ পরিষ্কার হয়, দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়ে ক্ষতিকর বস্তু বেরিয়ে যায়– এ হ'ল দুনিয়ায় নগদ উপকারিতা। আর দ্বিতীয় উপকারিতা হল আখিরাতে, যা স্থায়ী ও অধিক উপকারী। তা হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন যা মুক্তির বিশেষ মাধ্যম বিবেচিত হতে পারে।

٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ - رواه البخارى ومسلم واللفظ المسلم

২৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি আমার উম্মাতকে কষ্টে নিক্ষেপ করব মনে না করতাম, তাহলে তাদের উপর প্রত্যেক সালাতের সময় মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা মুসলিমের)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র কাছে মিস্ওয়াক প্রিয় হওয়া ও এর বহুবিধ উপকারিতা লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মন চাচ্ছে যেন উম্মাতের জন্য সালাতের পূর্বে মিস্ওয়াক করা অপরিহার্য করে দেন। কিন্তু এ নির্দেশ একথা মনে করে দেন নি যে, এ নির্দেশ উম্মাতের উপর ভারী বোঝা মনে হতে পারে এবং সবার তা মান্য করা কষ্টসাধ্য হতে পারে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ হচ্ছে অনুপ্রেরণা ও গুরুত্বারোপ করার একটি পদ্ধতি এবং নিঃসন্দেহে প্রভাবময়ী পদ্ধতি।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসের কোন কোন সূত্রে "عند كل صلوة" (প্রত্যেক সালাতের সময়) এর স্থলে "عند كل وضوء" (প্রত্যেক উযূর সময়) এর উল্লেখ রয়েছে[১] তবে উভয় বর্ণনার মর্ম প্রায় কাছাকাছি।

---

১. এ পর্যায়ে বুখারী শরীফের সিয়াম অধ্যায় এর "বাবুস সিওয়াকির রুতাবি ওয়াল-ইয়াবিসি লিস্ সায়িম" অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

٢٥– عَنْ اَبِى أُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاجَاءَ فِى جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ اِلاَّ اَمَرَنِى بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِى مُقَدَّمَ فِى -رواه احمد

২৫. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জিব্‌রাঈল যখনই আমার নিকট আসতেন তখনই আমাকে মিস্‌ওয়াক করতে বলতেন। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি আমার মুখের সম্মুখভাগ (মাড়ি) না ক্ষয় করে ফেলি (আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত জিব্‌রাঈল (আ) কর্তৃক বারবার মিস্‌ওয়াক করার প্রতি গুরুত্বারোপ মূলতঃ আল্লাহ্‌রই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এর বিশেষ রহস্য এও হতে পারে যে, যিনি সময় সময় মহান আল্লাহ্‌ কর্তৃক সম্বোধিত হন এবং আল্লাহ্‌র এ মহান ফিরিশ্‌তা যাঁর কাছে বারবার আসেন এবং আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করে শুনান ও একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিক-নির্দেশনা দেন তাঁর মিস্‌ওয়াকের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকা উচিত। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতবেশী গুরুত্ব সহকারে মিস্‌ওয়াক করতেন।

মিস্‌ওয়াক করার বিশেষ সময় ও স্থান

٢٦– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلاَّ يَتَسَوَّكَ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ – رواه أبوداؤد

২৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ রাতে বা দিনে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে উযূ করার পূর্বেই মিস্‌ওয়াক করে নিতেন। (আহ্‌মাদ ও আবূ দাঊদ)

٢٧– عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ التَّهَجُّدِ مِنَ الَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ – رواه البخارى ومسلم

২৭. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠলে প্রথমেই মিস্‌ওয়াক দ্বারা নিজ মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨– عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىْ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ – رواه مسلم

২৮. হযরত শুরাইহ্ ইব্ন হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একবার আয়েশা (রা) এর কাছে জানতে চাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কী কাজ করেন? তিনি বললেন ঃ মিস্ওয়াক করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এসব হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নিদ্রা বিশেষত রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের জন্য উঠলে ভালোভাবে মিস্ওয়াক করে নিতেন। এতদ্ব্যতীত কোন সফর থেকে ঘরে প্রবেশের পর তার প্রথম কাজ হতো মিস্ওয়াক করা। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, কেবল উযূর সাথে মিস্ওয়াকের সম্পর্ক নয়। ঘুম থেকে ওঠার পর এবং মিস্ওয়াক করার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে, উযূ করা হোক কি নাই হোক, মিস্ওয়াক করা চাই। এসব হাদীসের আলোকে আমাদের পূর্ববর্তী প্রাজ্ঞ আলিমগণ লেখেন, মিস্ওয়াক করাত সব সময়ের জন্যই মুস্তাহাব এবং সাওয়াব প্রাপ্তির মাধ্যম। তবে বিশেষ পাঁচ সময়ে মিস্ওয়াক করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যথাঃ ১. উযূর পূর্বে, ২. উযূ এবং সালাতের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে সালাতে দাঁড়ানোর সময়, ৩. কুরআন শরীফ পাঠের পূর্বে ৪. নিদ্রা ভঙ্গ করার পর এবং ৫. মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হলে এবং দাঁত ময়লা হয়ে গেলে দাঁত পরিষ্কার করার লক্ষ্যে মিস্ওয়াক করা।

মিস্ওয়াক করা আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত ও প্রকৃতির দাবি

٢٩- عَنْ اَبِى اَيُّوْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ - رواه الترمذى

২৯. হযরত আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি কাজ আম্বিয়া কিরামের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। যথাঃ- ১.লজ্জাশীলতা, ২. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৩. মিস্ওয়াক করা এবং ৪. বিয়ে করা। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলেন ঃ চারটি কাজ আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত ও সহজাত কাজের অন্তর্ভূক্ত। তাই তিনি নিজে উম্মাতকে এ বিষয়ে প্রভাবময়ী ও কার্যকর অনুপ্রেরণা দান করেছেন। ১. লজ্জাশীলতা- এ বিষয়ে আমি কিতাবুল আখ্লাকে সবিস্তার আলোচনা করেছি ২. বিয়ে-শাদী- ইনশাআল্লাহ্ কিতাবুন নিকাহে বিস্তারিত আলোচনা করব, ৩. সুগন্ধি– সুগন্ধি মাত্রই মানুষের কাছে প্রিয় এবং মানুষের আধ্যাত্মিক এবং ফিরিশ্তাসুলভ স্বভাবের অনিবার্য দাবি। এর দ্বারা আত্মা ও অন্তর বিশেষ সজীবতা লাভ করে, ইবাদতে প্রেরণা

যোগায় এবং আল্লাহ্‌র অপরাপর বান্দাদেরকেও প্রশান্তি দান করে। এজন্যে সকল আম্বিয়া কিরাম এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের কাছে এসব কাজ এত বেশী প্রিয়, সুন্নাত।

٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الاَظْفَارِ وَغَسْلُ التَّرَاجِمِ وَتَنْفُ الاِبِطِ وَحَلَقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبُ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمُضْمُضَةُ - رواه مسلم

৩০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। তা হল গোফ ছাঁটো দাড়ি লম্বা করা, মিস্‌ওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, নাক-কানের ছিদ্র এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশমকাটা এবং পানি দ্বারা ইস্‌তিনজা করা। হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ দশমটি আমি ভুলে গেছি। তবে সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বর্ণিত দশটি বস্তুকে 'ফিতরাতের' অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফিত্‌রাত (الفطرة) দ্বারা নবী-রাসূলের তরীকা-পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। একথার সমর্থন ইব্‌ন আওয়ানা (রা) বর্ণিত হাদীসে فطرة এর স্থলে سنة শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তার বর্ণনায় "عشر من الفطرة" এর স্থলে "عشر من السنة" রয়েছে। এ হাদীসে ঐ সকল ভাষ্যকারদের মতে, 'ফিতরাত' অর্থ হচ্ছে, নবী-রাসূলদের অনুমোদিত কাজ। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই-নবী-রাসূলগণ তাঁদের পুণ্যময় জীবন যার উপর অতিবাহিত করেন এবং উম্মাতকে চলার নির্দেশ দেন এদশটি বস্তু তারই অন্তর্ভুক্ত। এ দশটি বিষয়ই সকল নবী-রাসূলের সার্বজনীন শিক্ষা ও সম্মিলিত আমল।

কোন কোন ভাষ্যকার 'ফিতরাত' দ্বারা ইসলাম ধর্মকে বুঝিয়েছেন। কারণ কুরআন মাজীদে দীনকে 'ফিতরাত' বলা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন" (৩০, সূরা রূম ঃ ৩০)

উক্ত আয়াতের অর্থের ভিত্তিতে হাদীসের মূলকথা হবে-এ দশটি বস্তু ইসলাম ধর্মের অঙ্গীভূত।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার 'ফিতরাত' দ্বারা মানুষের মৌলিক প্রকৃতি বুঝিয়েছেন। এ ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য হবে এরূপ– এ দশটি বস্তু মানব স্বভাবের দাবি যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সহজাত প্রকৃতির দাবি হচ্ছে, ঈমান আনা, পবিত্র জীবন পসন্দ করা এবং কুফ্‌র অশ্লীলতা ও মন্দকাজ, অপবিত্রতা অশুচিতা অপসন্দ করা। তাই উল্লিখিত দশটি বস্তু হচ্ছে মানুষের সহজাত পসন্দের বিষয়। আর একথা সর্বজনমান্য যে, নবী-রাসূলগণ যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাই হবে মানুষের প্রকৃতির দাবি, এটাই তো স্বাভাবিক।

এ ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, 'ফিতরাত' এর দ্বারা নবী-রাসূলগণের সুন্নাত এবং ইসলাম ধর্ম অথবা মানব প্রকৃতির মৌল দাবি বুঝানো হয়েছে। তবে হাদীসের তিনটি ব্যাখ্যায় অর্থ একই থাকে। যে দশটি বস্তু নিয়ে নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন তা যেমন শরী'আতের অপরিহার্য অঙ্গ, তদ্রুপ মানব প্রকৃতিরও অনিবার্য দাবি। হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তার সারমর্ম নিম্নে পেশ করা হল ঃ

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দশটি বস্তু মূলতঃ তাহারাত অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মিল্লাতে হানীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) থেকে বর্ণিত। ইব্‌রাহীমী তরীকার উপর অবিচল থাকতে প্রস্তুত উম্মাতের মধ্যে এসবের সাধারণ প্রচলন রয়েছে এবং এর উপর রয়েছে তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দী উপরোক্ত আমলসমূহ কার্যকারী রয়েছে এবং এরই উপর মানুষ জীবিত থাকছে এবং ইন্তিকাল করছে। আর এজন্যেই এগুলোকে 'ফিতরাত' এবং মিল্লাতে হানীফের অন্যতম লক্ষণও বলা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু লক্ষণ ও প্রতীক থাকা প্রয়োজন, যাতে তার অনুসারীদের সহজেই চেনা যায় এবং এবিষয়ে সংকোচ প্রদর্শনকারীদের পাকড়াও করে শাস্তি বিধান করা যায় এবং ধর্মের অনুসারী ও ধর্মবিমুখ উভয়বিধ লোকদের চিহ্নিত করা যায়। লক্ষণ এমন হওয়া চাই যা কদাচিত নয় বরং অহরহ ঘটে এবং যাতে বহুবিধ উপকারিতা নিহিত

থাকে। মানুষের মননশীলতা তা মেনে নেয়। এদশটি বস্তুতেই এ গুণগুলো পাওয়া যায়। এগুলো অনুধাবন করার জন্য নিম্নের কথাগুলো গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিৎ।

মানবদেহের কোন স্থানের চুল বেড়ে গেলে রুচিসম্পন্ন মানুষের মনে তা মালিন্যের ভাব সৃষ্টি হয়, যেমন শরীর থেকে কোন দুর্গন্ধময় বস্তু বের হয়ে মালিন্যের ভাব হয়ে থাকে। বগলের এবং গাভীর নিচের চুল এ সবের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এগুলো পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে রুচীবান মানুষ মাত্র প্রফুল্লতা ও সজীবতা উপলব্দি করে আর এরূপ অনুভব করাই হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অনিবার্য দাবি এবং নখের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। দাড়ি কখনো ছোট বড় হয়ে থাকে এবং তা পুরুষের সৌন্দর্যবর্ধন করে এবং এভাবেই তা পুরুষত্বের প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। দাড়ি নবী-রাসূলগণের সুন্নাত। কাজেই দাড়ি রাখা পুরুষের কর্তব্য[১] এবং তা মুণ্ডন করা অগ্নিপূজক, হিন্দু অপরাপর অমুসলিম জাতির প্রতীক। সাধারণত নিম্নবর্ণের লোকেরাই দাড়ি মুণ্ডন করে থাকে। সুতরাং দাড়ি না রাখা মূলতঃ নিজকে নিচ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ারই নামান্তর।

গোঁপ বড় রাখার ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, গোঁপ বেড়ে গেলে পানাহারের বস্তু গোঁফে লেগে যেতে পারে এবং নাকের ময়লা যেহেতু গোঁফের সোজাসুজি পথে বের হয় তাই তা পরিষ্কার রাখার অনিবার্য দাবি হিসেবে গোঁফ বড় না করা উচিত। আর এজন্যই গোঁপ ছোট রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। কুলি এবং পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা হয় মিস্ওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার রাখা হয়, পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা হয় এবং উযূতে পানি দ্বারা আঙ্গুলের ময়লা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং উপরিউক্ত দশটি কাজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিধানের ক্ষেত্রে যে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোন কোন প্রাজ্ঞ আলিম এ হাদীসের আলোকে এ মূলনীতি পেশ করেছেন যে, শরীর পরিষ্কারকরণ, চেহারার শোভা বর্ধন এবং বিরক্তিকর যাবতীয় বস্তু দূরীকরণ এবং যে সব কারণে মানুষের রুচি বিগড়ে যায় তা বর্জন মূলতঃ নবী-রাসূলগণেরই সুন্নাত। চেহারার সৌন্দর্য বধর্নকে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যতম নি'আমত ও দান বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

---

১. টিকা ঃ- অপরাপর হাদীসে দাড়ি রাখার নির্দেশ মূলতঃ নির্দেশসূচক শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যার ফলে আলিমগণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব মনে করেন। হাদীসে দাড়ির পরিমাণ সম্পর্কীয় পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ফিক্হবিদগণ বিভিন্ন নিদর্শনের বরাত দিয়ে এক মুষ্টি দাড়ি রাখা ওয়াজিব বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

"তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন–তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন।" (৬৪ সূরা তাগাবুন ঃ ৩)

এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে তাঁর ভাগ্নে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে তাল্‌ক ইব্ন হাবীব এবং তাঁর থেকে মুস'আব ইব্ন শায়বা এবং তাঁর থেকে তাঁর ছাত্র যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়িদা বর্ণনা করেছেন। এই যাকারিয়া স্বীয় উস্তাদ মুস্'আব থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে দশটি বস্তুর মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং দশ নম্বরটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ আমার সঠিক স্মরণ নেই। তবে আমার মনে হয় সেটি হল 'কুলি করা'।

সালাতের গুরুত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মিস্ওয়াকের প্রভাব

٣١– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلٰى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا – رواه البيهقى فى شعب الايمان–

৩১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সালাতের জন্য মিস্ওয়াক করা হয় তার মর্যাদা মিস্ওয়াকহীন সালাতের চেয়ে সত্তরগুণ বেশী। (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ একথা বহুবার বলা হয়েছে যে, আরবী ভাষায় সত্তর এর ব্যবহার দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হয় না। বরং আধিক্য বুঝানো হয় সম্ভবত আলোচ্য হাদীসেও সত্তর সংখ্যাটি আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসের মর্ম হবে এই যে, যে সালাতের জন্য মিস্ওয়াক করা হয় তার মর্যাদা মিস্ওয়াকবিহীন সালাতের চেয়ে অনেক বেশি। আর 'সাবয়ীন' দ্বারা যদি সত্তর-ই উদ্দেশ্য হয় তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

যখন কোন লোক আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সালাত সমাপনান্তে দু'আও মুনাজাতের ইচ্ছা করে তখন তার অন্তরের গভীর প্রকোষ্ঠে এ চেতনা জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক যে, মিশ্‌ক ও গোলাপ মেখে জিহ্বা ও মননকে পরিচ্ছন্ন করে দু'আ করে। কিন্তু আল্লাহ্ কেবল মিস্ওয়াক করাকেই যথেষ্ট সাব্যস্ত করেছেন এবং তারই নির্দেশ দিয়েছেন। মোটকথা, কোন লোক যদি এ চেতনার আলোকে সালাতের জন্য মিস্ওয়াক করে, তবে মিস্ওয়াক বিহীন সালাতের চেয়ে সত্তর কিংবা ততোধিক গুণ সাওয়াব বেশী হওয়াই স্বাভাবিক, তবে বস্তুতঃপক্ষে–

هزار بار بشويم دهن زمشك وگلاب

هنوز نام تو گفتن كمال بے ادبى است

"মিশ্‌ক ও গোলাপ দিয়ে মুখ ধুয়ে নেই হাযার বার

তব নাম মুখে নেওয়া তবুও ত হায় বে-আদাবী সার।"

জ্ঞাতব্যঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে মিশকাত শরীফে কেবল ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় আলোচ্য হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লামা মুনযিরী (র) তাঁর "আত্ তারগীর ওয়াত তারহীব" গ্রন্থে আয়েশা (রা) শাব্দিক পরিবর্তনসহ হাদীসসমূহ প্রসঙ্গে বলেন "আহ্‌মদ, বায্‌যাব, আবূ ই'আলা ও ইব্‌ন খুযায়মা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদ্‌রাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকীম বলেছেন ঃ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। প্রায় কাছাকাছি অর্থের একই বিষয়ের আরেকটি হাদীস আবূ নু'আয়ম (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এবং অন্য সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রথম সনদটি উত্তম এবং দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ।

সালাতের জন্য উযূর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহারাত সম্পর্কে স্বীয় উম্মাতকে যেদিক নির্দেশনা দিয়েছেন তার মধ্যে এমনও কতিপয় বিষয় রয়েছে যা নির্দিষ্ট আহ্‌কামের মর্যাদা রাখে। যেমন, ইস্‌তিনজার আহ্‌কাম দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখার আহ্‌কাম, পানি পবিত্র কিংবা অপবিত্র হওয়ার বিস্তারিত আহ্‌কাম ইত্যাদি কতিপয় বিষয় এমনও রয়েছে যা সালাতের শর্তের মর্যাদা রাখে। সালাতের জন্য উযূর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -

"যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ্ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।" (৫, সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সালাত যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি, সম্বোধন ও মুনাজাতের একটি বিশেষ পদ্ধতি তাই এর শর্ত হচ্ছে উযূ অবস্থায় সম্পাদন করা। পক্ষান্তরে কেউ উযূবিহীন হলে এবং সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে সে যেন সালাত শুরুর পূর্বেই উযূ করে নেয়। কারণ মহান আল্লাহ্‌র

দরবারে এ বিশেষ উপস্থিতির জন্য উযূর বিকল্প নেই। উযূবিহীন সালাত কোন অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় হাদীস পাঠ করা যাক।

٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ - رواه البخارى

৩২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ব্যতীত কারো সালাত কবূল হয় না, যতক্ষণে সে উযূ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلٰوةُ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةَ مِنْ غُلُوْلٍ - رواه مسلم

৩৩. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবূল হয়না এবং হারাম উপায়ে অর্জিত মালের সাদাকাও কবূল হয়না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে طهور (তুহূর) দ্বারা উযূ বুঝানো হয়েছে। এ হাদীস ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের মর্ম একই, উপরের বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল শব্দগত।

٣٤- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ - رواه أبوداؤد والترمذى والدارمى ورواه ابن ماجة عنه وعن أبى سعيد

৩৪. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাহারাত হল সালাতের চাবি। তাক্বীর হল তার (সালাতের মধ্যে কথাবার্তা, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি যাবতীয় হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম হল তার (সালাতের বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ) হালালকারী। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, দারিমী এবং ইব্ন মাজাহ্ আলী (রা) ছাড়াও আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে)

٣٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ - رواه آحمد

৩৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের চাবি হল সালাত আর সালাতের চাবি হল উযূ। (আহমাদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই দুই হাদীস তাহারাত অর্থাৎ উযূকে সালাতের দাবি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ যেন তালার চাবি সদৃশ যা খোলা ব্যতীত ভেতরে, প্রবেশ করা যায় না। অনুরূপভাবে উযূ ছাড়া সালাত শুরু করা যায় না। উপরে বর্ণিত চারটি হাদীসে খানিকটা শাব্দিক আমল পরিলক্ষিত হলেও মূলতঃ সব কয়টির মর্ম প্রায় একই। প্রত্যেক হাদীসেই একথা বলা হয়েছে যে, সালাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে উযূ অপরিহার্য শর্ত। সালাত আল্লাহ্র মহান দরবারের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ, সম্বোধন ও মুনাজাত করার শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত পদ্ধতি। এ দুনিয়ায় এর চাইতে উত্তম কিছু পাওয়া যেতে পারে না। এ হক আদায়ের শ্রেষ্ঠতম পন্থা ছিল, প্রত্যেক সালাত শুরুর পূর্বে দেহ পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে গোসল করার এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছেদ পরার বিশেষ নির্দেশ দান। কিন্তু এ কাজ যেহেতু সর্বদা আঞ্জাম দেওয়া কষ্টকর তাই আল্লাহ্ তা'আলা সালাতের জন্য কেবল পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় এবং গোসল করার পরিবর্তে উযূ করাকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারণ উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহের গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। এ বিবেচনায় উযূ করাকে সারা দেহ পরিচ্ছিন্ন করার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। হাত, পা, চেহারাও অন্যান্য যে সব অঙ্গ সাধারণত পোশাকের বাইরে থাকে তার কোনটি ধৌত করার এবং কোনটি মাসেহ্ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য কথায় উযূবিহীন অবস্থায় যেন মানব স্বভাবে আত্মিক অপবিত্রতা অনূভূত হয় এবং উযূ করার ফলে মানবআত্মা এক বিশেষ পবিত্র অবস্থা ও অন্তরে, জ্যোতি অনুভব করে। এ অনুভূতি আল্লাহ্র যে সকল বান্দার রয়েছে তাঁরা ভাল করেই জানে, সালাতের জন্য উযূ অপরিহার্য শর্ত স্থির করার মূলে কী রহস্য নিহিত। আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ কমপক্ষে এতটুকু অনুভব করে যে, আল্লাহ্র মহান দরবারে উপস্থিতি পেশ করার ক্ষেত্রে এতটুকু শিষ্টাচার রক্ষা করা উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিতির লক্ষ্যে উযূ করবে সেও তার অন্তরে উযূর এক বিশেষ স্বাদ ও জ্যোতি অনুভব করবে।

উযূর নিয়ম

٣٦- عَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى اِلَى الْمَرَافِقِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلٰثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

– رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى

৩৬. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার এরূপ উযূ করেন, "তিনবার তাঁর দুই হাতের উপর পানি ঢালেন এরপর কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন ও বের করে দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন। তারপর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন। প্রথমে তিনবার ডানহাত এবং পরে তিনবার বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর মাথা মসেহ্ করেন। এরপর তিনবার ডান পা এবং পরে তিনবার বাম পা ধৌত করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি যেরূপ উযূ করলাম এরূপ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ উযূ করে ভিন্ন চিন্তাবাদ বাদ দিয়ে পূর্ণ মনোযোগসহ দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে তার পূর্বেকৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা বুখারীর)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উসমান (রা) আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযূর যে নিয়ম কার্যত দেখালেন তাই মূলতঃ উযূর উত্তম সুন্নাত নিয়ম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়বার কুলি দ্বারা মুখ এবং পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করেছিলেন, এ হাদীসে তার উল্লেখ নেই। কিন্তু অপরাপর বর্ণনা দ্বারা তিনবারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

এ হাদীসে একাগ্রতা ও বিণয় নম্রতার সাথে যে দু'রাক'আত সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে তা নফল সালাত নাও হতে পারে। কাজেই বলা যায়, কেউ যদি মাসনূন পদ্ধতিতে উযূ করে ফরয কিংবা সুন্নাত সালাত আদায় করে এবং তাতে পূর্ণ একাগ্রতা থাকে সেও আল্লাহ্ চাহেত প্রতিশ্রুত মাগফিরাত লাভে ধন্য হবে।

হাদীস ভাষ্যকার ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের মতে, মনে যদি এদিক সেদিকের খেয়াল চেপে বসে তবে তাই হচ্ছে বিক্ষিপ্ত চিন্তা। কিন্তু যদি কোন খেয়াল অন্তরে বদ্ধমূল.না হয় এবং তা দূরীকরণের চেষ্টা করা হয় তবে কোন ক্ষতি নেই। কারণ এসব বিষয় কামিল মু'মিনদের সামনেও ভেসে ওঠে।

٣٧– عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتَ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَمَسَحَ

بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طُهُوْرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - رواه الترمذى والنسائى

৩৭. আবূ হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন এবং ভাল করে পরিষ্কার করলেন, তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন, একবার মাথা মাসেহ্ করলেন, এবং উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উযূর অবশিষ্ট পানি তুলে নিয়ে তা দাঁড়ান অবস্থায় পান করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উযূ কিরূপ ছিল তা তোমাদের দেখানোর জন্যই আমি এরূপ করা পসন্দ করলাম। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উসমান ও আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করতেন এবং একবার মাথা মাসেহ্ করতেন, কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে, তিনি উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে আবার কখনো দু'বার করে ধৌত করা যথেষ্ট মনে করেছেন। তবে তাঁর এধরনের কাজের উদ্দেশ্য ছিল লোকদের জানিয়ে ও দেখিয়ে দেওয়া যে এভাবেও উযূ করা যায়। ফিক্হ্বিদদের পরিভাষায়-এর ধরনের উযূ জায়িয ও অনুমোদিত পদ্ধতি। তবে এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, পানির সংকট হেতু তিনি এরূপ উযূ করে থাকবেন।

٣٨- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَى هٰذَا - رواه البخارى

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উযূর প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন অধিকবার ধৌত করেন নি। (বুখারী)

٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - رواه البخارى

৩৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উযূর সময় প্রতিটি অঙ্গ দু'বার করে ধৌত করেছেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'টি হাদীসে কোন কোন সময় উযূর অঙ্গসমূহে কেবল একবার একবার অথবা দু'বার দু'বার ধৌত করার যে বিবরণ রয়েছে। তা মূলতঃ এটা দেখানোর উদ্দেশ্যে যে এতেও উযূ সম্পন্ন হয়ে যায়। অন্যথায় তিনি সাধারণতঃ উযূতে হাত মুখ এবং পা তিনবার করে ধৌত করতেন এবং অন্যকেও তা শিখিয়ে দিতেন। আর এ পদ্ধতিই সর্বোত্তম মাসনূন পদ্ধতি। নিম্নবর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

٤٠- عَنْ عَمَرِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْئَلُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثُلُثًا ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ هكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّى وَظَلَمَ - رواه النسائى وابن ماجة

৪০. আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত, তিনি (আমাদের দাদা) বলেছেন ঃ এক বেদুঈন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উযূ সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি তাকে তিনবার করে (প্রত্যেক অঙ্গ ধুয়ে) দেখালেন। তারপর বললেন ঃ এভাবেই উযূ করতে হয়। কাজেই যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত করবে সে মন্দকাজ করল, সীমালংঘন করল এবং যুলুম করল। (নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর অঙ্গসমূহ তিনবারের অধিক ধোয়া সম্পর্কে যে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন তার মূলকথা হল এই যে, উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করাতেই উযূ পূরোপুরি আদায় হয়ে যায়। সুতরাং কেউ যদি নিজের পক্ষ থেকে বাড়ায় সে যেন পক্ষান্তরে স্বেচ্ছায় শরী'আতে তার ইচ্ছা প্রবিষ্ট করালো। এহেন কাজ নিঃসন্দেহে অনুচিত ও বাড়াবাড়ি।

٤١- وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَيْنِ فَلَهُ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ فَلَهُ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلْثًا فَذلِكَ وُضُوْئِى وَوُضُوْءُ الاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ - رواه احمد

৪১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি উমূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করে তার জন্য তা অবশ্য করণীয় (এটাই নিম্নতম পর্যায়, এটুকু ছাড়া উযূই হয়না)। আর যে ব্যক্তি দু'বার করে ধৌত করে তার জন্য রয়েছে (একবার করে ধৌতকারীর তুলনায়) দ্বিগুণ সাওয়াব। যে ব্যক্তি তিনবার করে উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করে (এটাই উত্তম

ও সুন্নাত তরীকা) এটাই আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের উযূ। (আমি উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করি, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও তাই করতেন। (আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে। মুসনাদের আরেকটি বিবরণে আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করে দেখান এবং বলেন, এ হচ্ছে নিম্ন মর্যাদার উযূ– যা ব্যতীত আল্লাহ্‌র কাছে সালাতই গ্রহণযোগ্য হয় না। এরপর তিনি দু'বার করে উযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করে দেখান এবং বলেন, প্রথম প্রকার উযূর চেয়ে এ উযূর সাওয়াব দ্বিগুণ। অতঃপর তিনি উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধুয়ে দেখান এবং বলেন, এ হচ্ছে আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের উযূ। এ বর্ণনাটি ইমাম দারু কুতনী, বায়হাকী, ইব্‌ন হিব্বান, ইব্‌ন মাজাহ (র) প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। (যুজাজাতুল মাসাবীহ্) এ দু'টি বর্ণনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র।

উযূর সুন্নাত ও আদবসমূহ

উযূতে চার ফরয- এর বিবরণ সূরা মায়িদায় উল্লিখিত আয়াতে রয়েছে, যাতে সালাতের প্রথম উযূর স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। উযূর চারটি ফরয হল এই, ১. মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা ৩. মাথা মাসেহ্ করা এবং ৪. উভয় পায়ের গিরা পর্যন্ত ধৌত করা। এ চারটি ফরয ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূতে যে সকল কাজের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তা-ই হচ্ছে মূলতঃ উযূর সুন্নাত ও আদব। যার দ্বারা উযূর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণতা অর্জিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মুখমণ্ডল, হাত-পা একবারের পরিবর্তে তিনবার করে ঘষেঘষে ধোয়া, দাড়ি এবং হাত পায়ের আঙ্গুলের মাঝে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করিয়ে খিলাল করা,পরিহিত আংটি নাড়াচাড়া করা যাতে পানি পৌঁছার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে; এমনিভাবে কুলি করা, উযূর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা, ভাল করে নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, কানের ভিতর ও বাইরের অংশ মাসেহ্ করা, উযূ শেষে কালেমা শাহাদাত পাঠ করা এবং উযূ শেষে উযূর দু'আ পাঠ করা, এসবই উযূর সুন্নাত এবং আদব বা মুস্তাহাব বিষয়। এগুলোর মাধ্যমেই উযূ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠ করা যাক।

٤٢– عَنْ سَعِيْدِبْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِاسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ– رواه الترمذى وابن ماجة

৪২. সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূকালে আল্লাহ্‌র নাম নেবে না তার উযূ হবেনা। (তিরমিযী ও ইবন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম উম্মাতের অধিকাংশ মুজতাহিদের মতে, যে উযূতে গাফিলতি করে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া ব্যতীত আদায় করা হয়ত অসম্পূর্ণ ও জ্যোতিবিহীন উযূ। আর অসম্পূর্ণ উযূ মূলতঃ আদায় না হওয়ারই নামান্তর। কিতাবুল ঈমানে এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ আলোচনা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন মাসঊদ ও ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে যে হাদীস পরবর্তী নম্বরে বর্ণিত হবে তা থেকে এ কথা ফুটে উঠে যে, যে উযূ 'বিস্‌মিল্লাহ্' ব্যতীত সম্পন্ন করা হয়ত সর্বতোভাবে অনর্থক নয় তবে তা অন্তরে প্রভাব বিস্তার ও জ্যোতি সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُطَهِّرْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُطَهِّرْ اِلاَّ مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ- رواه الدارقطنى

৪৩. হযরত আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন মাসঊদ ও ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করল সে তার সর্বাঙ্গ পবিত্র করে নিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উযূ করল অথচ বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করল না যে কেবল তার উযূর অঙ্গ সমূহ-ই পবিত্র করে নিল। (দারু কুতনী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যে উযূতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য পাঠ করা হয় তার প্রভাবে সর্বাঙ্গ পূতপবিত্র ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে উযূ আল্লাহ্‌র নাম কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য উচ্চারণ হীনভাবেই সম্পন্ন হয় তাতে কেবল উযূর অঙ্গ সমূহ-ই পবিত্র হয়। মোটাকথা এরূপ উযূ এক প্রকার অসম্পূর্ণ উযূ।

٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاِنَّ حَفَظَتَكَ لاَ تَبْرَحَ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتّٰى تُحْدِثَ مِنْ ذَالِكَ الْوُضُوْءِ- رواه الطبرانى فى الصغير

৪৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! উযূকালে তুমি 'বিস্‌মিল্লাহ্ ও আল্-হামদু লিল্লাহ্' পাঠ করবে। এরূপ উযূ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমল লেখক ফিরিশ্‌তা তোমার আমলনামায় সাওয়াব লিখতে থাকবে। (তারারানীর মু'জামুস সাগীর)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি উযূকালে বিস্‌মিল্লাহ্ ও আল্-হামদুলিল্লাহ্ পাঠ করে এবং ঐ উযূ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তার আমলনামায় অব্যাহতভাবেই আমল লেখক ফিরিশতা সাওয়াব লিখতে থাকবেন।

٤٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَفَابْدَءُ وَبِمِيَامِنْكُمْ-- رواه أحمد وأبو داؤد

৪৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার যখন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে এবং উযূ করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে। (আহ্‌মাদ ও আবু দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হচ্ছে যে, যখন কোন পোশাক, জুতা, মোজা, কিংবা অনুরূপভাবে যখন উযূ করা হয় তখন ও প্রতিটি অঙ্গ ডান দিক থেকে শুরু করা উচিৎ।

٤٦- عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَوَخَلِّلْ بَيْنَ الاَصَابِعِ وَ بَالِغْ فِىْ الاِنْتِشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا - رواه أبوداؤد والترمذى النسائى

৪৬. লাকীত ইব্‌ন সাবিরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে উযূ সম্পর্কে অবহিত করুন (যেগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে) । তিনি বললেন ঃ (প্রথমতঃ গোটা) উযূ উত্তমরূপে করবে। (দ্বিতীয়ত) আঙ্গুলসমূহের মধ্যে খিলাল করবে এবং (তৃতীয়ত) সিয়াম পালনকারী না হলে নাকের মধ্যে ভালভাবে পানি পৌঁছিয়ে তা পরিষ্কার করবে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

٤٧- عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ --- رواه الترمذى وأبوداؤد ابن ماجة

৪৭. হযরত মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূ করার সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর হাতের ছোট আঙ্গুল দ্বারা দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যেকার স্থান ঘষতে দেখেছি। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ)

٤٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهٖ فَخَلَّلَ بِهٖ لِحْيَتَه وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ - رواه أبوداؤد

৪৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযূ করতেন তখন এক আঁজলা পানি নিতেন। তারপর তা চিবুকের নিচ দিয়ে দাড়ির ভিতরের অংশে পৌঁছাতেন এবং তা দ্বারা দাড়ি খিলাল (আঙ্গুল ভিতরে ঢুকিয়ে বের) করতেন। এরপর তিনি বলতেন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ)

٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنُهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِاِبْهَامَيْهِ - رواه النسائي

৪৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূতে মাসেহ্ করেছেন মাথা এবং দুই কান, দুই কানের ভেতরের দিক দুই শাহাদত আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা এবং বাইরের দিক বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা । (নাসায়ী)

٥٠- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ حُجْرَىْ اُذُنَيْهِ - رواه أبوداؤد وأحمد وابن ماجة

৫০. হযরত রুবাই বিনত মু'আওয়িয (রা) থেকে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করার সময় দু'টি আঙ্গুল তাঁর দু'কানের ভেতরে ঢুকাতেন। (আবূ দাঊদ, আহ্মাদ ও ইব্ন মাজাহ)

٥١- عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلٰوةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِىْ اِصْبَعِهٖ - رواه الدار قطنى وابن ماجة

৫১. হযরত আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের জন্য উযূ করতেন তখন তাঁর আঙ্গুলে পরিহিত আংটি নাড়াচাড়া করতেন। (দারু কুতনী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীসসমূহে উযূর বিবরণ দানের সাথে সাথে যে যে আমলের বিষয় বর্ণিত হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ দাড়ি এবং হাত পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা, কানের ভিতর ও বাইরের অংশ ভালভাবে মাসেহ্ করা এবং ভিতরে আঙ্গুল ঢুকানো, হাতে পরিহিত আংটি নাড়াচাড়া করা, এসবই উযূ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আদব। এসব বিষয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত্নবান ছিলেন এবং তাঁর বাণী ও কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে শিক্ষাও দিয়েছেন।

উযূতে নিষ্প্রয়োজনে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার অনুচিত

٥٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرْفُ يَاسَعَدُ! قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرْفٌ؟ قَالَ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ- رواه أحمد وابن ماجه

৫২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ (রা) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সা'দ (রা) তখন উযূ করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ হে সা'দ! এরূপ অপচয় করছ কেন? তিনি (সা'দ) বললেন ঃ উযূতেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আছে, যদিও তুমি প্রবহমান নদীর তীরে অবস্থান করে থাক। (আহ্মাদ ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পানি ব্যবহারে যাতে অপচয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উযূর নিয়ম-কানূনের অন্যতম।

উযূর পর তোয়ালে বা রুমাল ব্যবহার করা

٥٣- وَعَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهَ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ — رواه الترمذى

৫৩. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি যে, তিনি উযূ করে তাঁর একটি কাপড়ের কিনারা দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করার পর কাপড়ের এক অংশ স্বীয় চেহারা মুবারক মুছে নিতেন। ইমাম তিরমিযী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উযূ শেষে উযূর অঙ্গসমূহ মুছে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আলাদা কাপড় রাখতেন এবং প্রয়োজনে তা

ব্যবহার করতেন। কোন কোন সাহাবী থেকে কাপড় কিংবা রুমাল রাখার বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি রুমালের মত আলাদা কাপড় এবং কখনো কখনো তিনি নিজ কাপড়ের এক কিনারা কাজটি সম্পাদন করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

প্রত্যেক উযূ শেষে আল্লাহ্‌র কিছু যিক্‌র ও সালাত আদায় করা

১৭নং ক্রমিকে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) সূত্রে ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে উযূ শেষে কালেমা শাহাদাত ও দু'আ মাসূরা পাঠ করার বিবরণী রয়েছে। সেখানে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ –

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের মধ্যে শামিল কর" এর ফযীলত ও বরকত সম্পর্কীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে। উসমান (রা) সূত্রে ৩৬ নং ক্রমিকে বুখারী ও মুসলিমের বরাতে একই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উযূ করার পর একাগ্রতার সাথে দু'রাক'আত সালাত আদায়ের ফলে জীবনের (সাগীরা) গুনাহসমূহ বিমোচিত হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ক আরেকটি হাদীস পাঠ করা যাক ঃ

٥٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الإِسْلَامِ فَانِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ اِلاَّ وَصَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرًا مَاكُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ – رواه البخارى ومسلم

৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা) কে বললেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর যে আমল দ্বারা তুমি জান্নাতের সব চাইতে বেশি আশা কর, সে বিষয় আমাকে অবহিত কর। কারণ জান্নাতে আমি তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। এটা তোমার কোন আমলের বরকত তা জানতে চাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ আমি যার দ্বারা জান্নাতের সব চাইতে বেশী আশা করতে পারে। তা হল রাতে হোক কি দিনে যখনই আমি উযূ করি তখন কিছু সালাত আদায় করি যা আমার তাওফীক হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জান্নাতে হযরত বিলাল (রা)-এর পদধ্বনি শোনার বিষয়টি স্বপ্নে দেখা একটি ঘটনা। ১. এ বিষয়ে এজন্য জানিয়ে দেয়া হল যে, জীবিত থাকা অবস্থায় হযরত বিলাল (রা) কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, সে প্রশ্ন যাতে উত্থাপিত না হয়। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত বিলাল (রা) কে জান্নাতে দেখা এবং তার বিবরণ দান একথারই সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত বিলাল (রা) জান্নাতী। বরং তিনি প্রথম শ্রেণীর জান্নাতীদের অন্যতম।

এ হাদীসের আধ্যাত্মিক দিক হলো এই যে, মানুষ যখনই উযূ করে তখনই যেন সে তার সাধ্য অনুসারে সালাত আদায় করে, চাই ফরয হোক কি নফল কিংবা সুন্নাত।

১. যে সকল বিবেচনায় বিষয়টিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বপ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে তার সবিস্তার বিবরণ জানার জন্য ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

অপবিত্রতা এবং অপবিত্রতার গোসল

প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ও আধ্যাত্মিকবোধ সম্পন্ন মানুষের শরীরের কোন অংশ থেকে যখন দুর্গন্ধময় বস্তু নির্গত হয় অথবা সহজাত পাশবিক ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে যা ঊর্ধ্বজগত থেকে অনেক দূরে, তখন, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অভ্যন্তর ভাগে এক ধরনের অন্ধকার, মালিন্য ও অপবিত্রতা অনুভব করে। এমতাবস্থায় সে নিজকে ইবাদতের যোগ্য মনে করে না একেই বলা হয় 'হাদ্স' (অপবিত্রতা)। এ হাদ্স (অপবিত্রতা) দু'প্রকার। যথাঃ- ১. হাদ্সে আসগার– যা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য কেবল উযূই যথেষ্ট অর্থাৎ উযূ দ্বারা গ্লানি দূরীভূত হয়ে যায়। ২. অপরটি হচ্ছে 'হাদ্সে আক্বার'। এর প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। এ অপবিত্রতা কেবল গোসল দ্বারা দূরীভূত হয়। পেশাব পায়খানা, বায়ু নির্গত হওয়া ইত্যাদি হাদ্স আসগারের এবং স্ত্রী সহবাস, হায়িয, নিফাস ইত্যাদি হাদ্সে আকবারের অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী সহবাস, হায়িয, নিফাস ইত্যাদির ফলে মানব অন্তরে যে কদর্য তার সৃষ্টি হয় তা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক রুচিসম্পন্ন মানুষ গোসল অত্যাবশ্যক মনে করে এবং যতক্ষণ তারা গোসল না করে ততক্ষণে কোন পবিত্র কাজে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজকে অনুপযুক্ত মনে করে। এমনকি পবিত্র স্থান দিয়ে বিচরণ থেকে নিজকে বিরত রাখে। এ সকল অবস্থায় গোসল করে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি যে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত তা সুস্থ বিবেকের অপরিহার্য দাবি। এ

সকল অবস্থায় গোসলের পূর্বে সালাত আদায়, কুরআন কিংবা ওযীফা পাঠ এবং মসজিদে প্রবেশেও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠ করা যাক।

٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ –

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ ঋতুমতী নারী ও অপবিত্র ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয) কুরআনের কোন অংশ পাঠ করবে না। (তিরমিযী)

٥٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَانِّىْ لاَ اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ -- رواه أبو داؤد

৫৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই সকল ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নাও। কারণ আমি মসজিদকে ঋতুমতী নারী ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বৈধ মনে করি না। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম যখন মসজিদে নববীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়, তখন অসংখ্য ঘরের দরজা মসজিদে মুখী ছিল। মসজিদের প্রাঙ্গণের দিকেই তা খুলত। কিছুদিন পর এ নির্দেশ জারী হয় যে, মসজিদের সম্মানের খাতিরে কোন ঋতুমতী ও অপবিত্র লোক যেন আনাগোনা না করে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এফরমান জারী করলেন যে, এ সকল দরজা মসজিদ মুখী অবস্থান থেকে সরিয়ে যেন অন্য মুখী করা হয়।

অপবিত্র ব্যক্তির গোসল পদ্ধতি ও আদব

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথাও কাজের মাধ্যমে যেমন উযূর নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তদ্রুপ গোসলের নিয়ম কানূন ও শিক্ষা দিয়েছেন। এ পর্যায়ে কয়েকটি হাদীস পাঠ করা যাক।

٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ كُلِّ شَعْرٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَةَ –

৫৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি চুলের নিচে অপবিত্রতার প্রভাব থাকে। অতএব চুলগুলো ভাল করে ধৌত কর (যেতে চুলের নিচের শরীরের অংশও ভাল করে পরিষ্কার হয় যায়) (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ)

٥٨- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ، قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِيْ فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلْثًا - رواه أبوداؤد وأحمد والدارمى الاَّ اَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرَا فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ -

৫৮. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপবিত্র (জানাবাতের) গোসলের একচুল পরিমাণ স্থানও ছেড়ে দেবে এবং ধুইবে না তাকে জাহান্নামের এই শাস্তি দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, (একথা শুনে) আমি আমার মাথার চুলের সাথে বৈরী আচরণ করে আসছি (অর্থাৎ চুল বাড়ার সাথে সাথে তা মুড়িয়ে ফেলি। (আবূ দাঊদ) আহমাদ ও দারেমী) আবূ দাউদের বর্ণনা মতে একথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে একচুল পরিমাণ স্থানও যাতে শুকনা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। কোন কোন ভাষ্যকার বলেন, যদিও ঘাড় বরাবর চুল রাখা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অপর তিন খলীফার নিয়মিত আমল ছিল। তথাপি সর্বাঙ্গ ভালভাবে ধৌত করার উদ্দেশ্য হযরত আলী (রা) তাঁর মাথা মুণ্ডনের যে সাধারণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা অবলম্বন করা জায়িয এবং পসন্দনীয়ও বটে।

٥٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَءُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَاْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِيْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنْ قَدِاسْتَبْرَاَ حَفَنَ عَلٰى رَاسِهِ ثَلٰثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ - رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم

৫৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকীর গোসল করতেন তখন এভাবে শুরু করতেনঃ প্রথমে দু'হাত কব্জী পর্যন্ত ধুতেন, তারপর বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ধুতেন এবং ডান হাত দিয়ে পানি ঢালতেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে নিতেন। এরপর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবাতেন এবং তা দ্বারা চুলের গোড়া খিলাল করতেন যখন অনুভব করতেন যে সর্বত্র পানি পৌঁছে গিয়েছে তখন মাথার উপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিতেন। এরপর সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর দু'পা ধুয়ে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা মুসলিমের)

٦٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهٖ عَلٰى فَرْجِهٖ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهٖ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهٖ ثَلٰثَ حَفَنَاتٍ مِلْأَ كَفِّهٖ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهٖ ذَالِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ -

رواه البخارى ومسلم وهذ اللفظ مسلم

৬০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার খালা মায়মুনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নাপাকীর গোসলের জন্য পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি তাঁর উভয় হাতের কব্জী পর্যন্ত দু'বার অথবা তিনবার ধুইলেন। তারপর উভয় হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। এরপর লজ্জাস্থানে পানি ঢেলে দিলেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুলেন। তারপর বাম হাত মাটিতে ভাল ঘষলেন। এরপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। তারপর তাঁর সারা শরীর ধুয়ে ফেললেন। তারপর সে স্থান থেকে একটু সরে তিনি দু'পা ধুয়ে নিলেন। তারপর আমি তাঁকে রুমাল দিলাম। কিন্তু তিনি তা ফেরত দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম কিন্তু শব্দমালা মুসলিমের)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) ও মায়মুনা (রা) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস দু'টি থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোসল পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ জানা গেল। অর্থাৎ তিনি নাপাকীর গোসল করার প্রাক্কালে প্রথমে দু' হাত দু'বার অথবা তিনবার ধুয়ে নিতেন (কেননা হাতের দ্বারা দেহের সর্বত্র পানি প্রবাহিত করা হয়।) তারপর তিনি লজ্জাস্থান বামহাত দিয়ে ধুয়ে নিতেন এবং ডানহাতে পানি ঢাললেন।

এরপর বামহাত মাটিতে ভাল করে ঘষে পানি দিয়ে আবার ধুয়ে নিতেন। পরে উযূ করে নিতেন। (উযূর প্রথমে তিনবার কুলি করে নিতেন। নাকে পানি দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নিতেন। অতঃপর চুলের গোড়া খিলাল করতেন এবং সর্বত্র পানি পৌঁছাতেন। তারপর অতীব যত্নের সাথে মাথার চুল ধুয়ে নিতেন এবং মাথার চুলের মূলে পানি পৌঁছাবার চেষ্টা করতেন। এরপর সারা দেহে পানি প্রবাহিত করতেন । এরপর গোসলের স্থান থেকে একটু সরে পা ধুয়ে নিতেন। বলাবাহুল্য, এ-ই হচ্ছে গোসলের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। গোসলের স্থান থেকে একটু সরে তিনি সম্ভবত এ জন্য পা ধুয়ে থাকবেন যে, গোসলের স্থান সাধারণত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না।

٦١- عَنْ يَعْلَى قَالَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهِ وَاثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيُّى سَتِيْرُ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرُ -- رواه أبو داؤد والنسائى

৬১. হযরত ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (বিবস্ত্র) অবস্থায় উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখে মিম্বারে উঠে দাঁড়ান। প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা- স্তুতি করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক লজ্জাশীল ও লজ্জানিবারক। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। সুতরাং কেউ গোসল করতে চাইলে যেন পর্দা করে নেয় (লোকের সামানে যেন বিবস্ত্র না হয়) ।(আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)

সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব গোসল

শরী'আতে যে যে আবস্থায় গোসল করা ফরয ও ওয়াজিব করা হয়েছে পূর্বেই তা বর্ণিত হয়েছে। এবং সে পর্যায়ে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসও পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন উপলক্ষে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তা ফরয কিংবা ওয়াজিব নয় বরং তা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব। এপর্যায়ে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপায় হাদীস পাঠ করা যাক।

জুমু'আর দিনের গোসল

٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، رواه البخارى ومسلم

৬২. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করতে এলে সে যেন গোসল করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ - رواه البخارى ومسلم

৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাতদিন অন্তর গোসল করে নেয়া উচিৎ এবং সে যেন তার গোসলের সময় তার মাথা এবং সমগ্র দেহ ভালভাবে ধুয়ে নেয়। (বুখারীও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দু'টিতে জুমু'আর দিনে গোসল করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, জুমু'আর দিন গোসল করা 'ওয়াজিব'। কিন্তু প্রাজ্ঞ আলিমগণের মতে, 'ওয়াজিব' দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয় বরং গুরুত্বারোপ করা উদ্দেশ্য। কারণ ইব্ন উমার ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসদ্বয় থেকে তা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ইরাকীদের এক প্রশ্নের উত্তরে যে জবাব দিয়েছেন তা উল্লেখ করলে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। সুনানে আবূ দাঊদে ইব্ন আব্বাস (রা) এ প্রখ্যাত ছাত্র ইকরামা সূত্রে বিস্তারিত প্রশ্ন উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ।

ইকরামার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার ইরাকের কিছু সংখ্যক লোক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে ইব্ন আব্বাস! আপনি কি জুমু'আর দিনের গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন? তিনি বললেন ঃ না। তবে যে ব্যক্তি গোসল করবে তা হবে তার জন্য পবিত্র ও ভাল কাজ। আর যে ব্যক্তি গোসল করবে না সে গুনাহগার হবে না। কেননা তার উপর তা ওয়াজিবও নয়। কিরূপে জুমু'আর গোসলের সূচনা হয় আমি তোমাদের কে সে বিষয় অবহিত করছি। তদানীন্তন যুগের লোকেরা ছিল দরিদ্র এবং তারা মোটা পশমী কাপড় পরিধান করত। এতদ্ব্যতীত তাঁরা পিঠে বোঝা বহন করত। অথচ তাদের মসজিদ ছিল ছোট ও নিচু ছাদ বিশিষ্ট খেজুর শাখার ছাপড়া। এমতাবস্থায় একদিন প্রচণ্ড গরমে সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হন। এমন সময় মোটা পশমী কাপড় পরিহিত লোকেরা ধর্মাক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাঁদের

শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল, যাতে অন্যান্য লোকদের কষ্ট হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেন ঃ হে লোক সকল। যখন এ দিন (জুমু'আর দিন) আসবে তখন তোমরা গোসল করবে এবং প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে তেলও সুগন্ধি ব্যবহার করবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রাচুর্য দান করেন। ফলে তারা মোটা পশমী কাপড় ছাড়াও অন্য কাপড় পরিধান করতে থাকে এবং তাদের সীমাহীন কষ্টেরও অবসান ঘটে তাঁদের মসজিদও সম্প্রসারিত করা হয় এবং একের দ্বারা অন্যের ঘামে কষ্ট পাওয়ার বিষয়টিও তিরোহিত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ আব্বাস (রা)-এর এ ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের বর্ণিত আবস্থায় জুমু'আ বারে গোসল করা অত্যাবশ্যক ছিল। তারপর যখন উক্ত অবস্থার অবসান ঘটে, তখন ঐ বিধানও রহিত হয়ে যায়। মোটকথা, পবিত্র অবস্থা আল্লাহ্র কাছে সব সময়ের জন্যই পসন্দনীয় এবং তাতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও সাওয়াব। অর্থাৎ এ ধরনের গোসল সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠবে।

٦٤- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ- رواه أحمد و أبوداؤد والترمذى والنسائى

৬৪. হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন উযূ করল সে ভাল কাজই করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গোসল করল, সে গোসলই হলো অধিকতর উত্তম কাজ। (আহ্মাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও দারিমী)

(জুমু'আর সালাতের জন্য গোসল সংক্রান্ত হাদীস যখন আসবে তখন সেখানে আল্লাহ্ চাহেত কিছু আলোচনা করা যাবে)

মৃতের গোসলদাতার গোসল

٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ -- رواه ابن ماجة وزاد أحمد والترمذى وأبوداؤد ومن حَمَلَه فَلْيَتَوَضَّأْ -"

৬৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করায় সে যেন গোসল করে নেয়। ইব্ন

মাজাহ্ আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদে বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে ব্যক্তি মৃতের লাশ বহন করে সে যেন উযূ করে নেয়।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যে বিধান রয়েছে তা প্রাজ্ঞ আলিমদের মতে মুস্তাহাব। এজন্যই তাঁদের মতে, মৃতকে গোসল দানকারীর উচিৎ মৃতকে গোসল দানের পর গোসল করে নেয়া। কারণ মৃতকে গোসল দানের সময় তার শরীরে ছিটেফোটা লেগে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য একটি হাদীস ইমাম বায়হাকী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে মৃতকে গোসল দানের পর গোসলদাতার গোসল ওয়াজিব নয় বলে উল্লেখ রয়েছে। এজন্য আলিমগণ মৃতকে গোসল দানের পর গোসল করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। এ নির্দেশ এ কারণেই হয়ে থাকবে যে, মৃতের লাশ বহনকারীর জন্য জানাযার সালাত আদায়ের ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

ঈদের দিন গোসল

٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى - رواه ابن ماجه

৬৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন। (ইব্‌ন মাজাহ্)

জ্ঞাতব্য ঃ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করা সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করার প্রচলন সম্ভবত ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই চলে আসছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মাতকে বাণী প্রদান করে এবং কার্যে পরিণত করে যে অনুপ্রেরণ দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ পর্যায়ে যে সকল হাদীস পাওয়া যায় সে সব সম্পর্কে হাদীস দুর্বল সনদ যুক্ত বলে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ অভিমত দিয়েছেন। এখানে ইব্‌ন মাজাহ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সনদ সূত্রও দুর্বল । এটা একটা সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত যে, কিছু সংখ্যক রিওয়ায়াতে পারিভাষিক দুর্বলতা থাকলেও তার বিষয়বস্তু যথার্থও প্রতিষ্ঠিত সত্য। কোন হাদীসের সনদ সূত্র যদি হাদীস বিশারদগণের নিকট দুর্বলও হয় , আর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা বিশুদ্ধ হাদীসে মত স্বীকৃতি পাবে। এবং দলীল প্রমাণরূপে গৃহীত হবে।

তায়াম্মুম

মানুষ কখনো এমন অবস্থার শিকার হয় যে, তার পক্ষে গোসল কিংবা উযূ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তা রোগজনিত কারণে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক। অনুরূপভাবে মানুষ কখনো এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছে যেখানে পানি পাওয়া কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। এ সকল অবস্থায় যদি বিনা গাসল কিংবা বিনা উযূতে সালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তাতে স্বাভাবিক পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টি বর্জিতও উপেক্ষিত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র দরবারে পবিত্রতার সাথে হাযিরী পেশ করার যে অনুভূতি তা মানুষ হারিয়ে ফেলে। এতে মানুষের মনে এ উপস্থিতির গুরুত্ব ও মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এহেন পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য গোসল ও উযূর পরিবর্তে তায়াম্মুমকে স্থালাভিষিক্ত করেছেন। সুতরাং গোসল ও উযূ করত অপারগ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হওয়ার দাবি রাখে। ফলে নিরূপায় অবস্থায় তায়াম্মুম করতে বাধ্য হওয়ায় তার মন মানসিকতায় পবিত্রতার অনুভূতি বিলুপ্ত হবে না।

তায়াম্মুম করার নিয়ম হল, এই যে, ভূপৃষ্টে তথা, মাটি, পাথর বা বালির উপর হাত মেরে পবিত্রতার নিয়্যাতে মুখমণ্ডল এবং হাত মাসেহ্ করা। এভাবে মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ্ করলে তায়াম্মুম আদায় হয়ে যায়। তবে মুখমমণ্ডল ও হাতে মাটি লাগানো জরুরী নয় এবং মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত যাতে অপরিচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা চাই।

তায়াম্মুমের গুরুত্ব

গোসল ও উযূতে পানি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা অপারগ অবস্থায় তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছেন। আর এতে মাটিও পাথর ব্যবহৃত হয়। এর গূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে যেয়ে কিছু সংখ্যক প্রাজ্ঞ আলিম বলেন, পুরো ভূখণ্ড দু'অংশে বিভক্ত। এর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে পানি এবং অপর অংশ জুড়ে রয়েছে মাটি। আর পানি ও মাটির মধ্যে রয়েছে নিবিড় সর্ম্পক। মানব সৃষ্টির সূচনা প্রধানত মাটি এবং পানি থেকেই হয়েছে। বলাবাহুল্য, সমুদ্র ব্যতীত সর্বত্র মানুষ হাতের নাগালে মাটি পাচ্ছে। এ কথাও সত্য যে, হাতে মাটি লাগিয়ে হাত এবং মুখমণ্ডল মাসেহ্ করার মধ্য দিয়ে আরো অধিক দীনতা-হীনতা প্রকাশ পায়। তাছাড়া মানুষের শেষ ঠিকানা মাটিতেই হবে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে;তায়াম্মুম করার ফলে মৃত্যু ও কবরের কথা স্মরণ হয়। তবে এর প্রকৃত রহস্য আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জ্ঞাত।

এ পর্যায়ে তায়াম্মুম সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীস পাঠ করা যাক। প্রথমতঃ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ঐ ঘটনার উল্লেখ কর যার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়।

তায়াম্মুমের বিধান

٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِىْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَاَتَى النَّاسُ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالُوْا اَلاَ تَرَى اِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ فَجَاءَ اَبُوْبَكْرٍ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذَىْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ قَالَتْ فَعَاتَبَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَاللّٰهَ اَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِىْ بِيَدِهِ فِىْ خَاصِرَتِىْ فَلاَ يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذَىْ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ اُسَيْدُبْنُ الْحُضَيْرِ وَ هُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ مَاهِىَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَااٰلَ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِىْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ - رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم

৬৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে (গ্রহণযোগ্য মতে যাতুর রিকা' অভিযান কালে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ (মদীনা ও খায়বারের মধ্যবর্তী দু'টি স্থান) নামক স্থানে পৌঁছলাম। তখন আমার (আমার বড় বোন আস্‌মা থেকে ধারকৃত) গলার হার (ছিড়ে পড়ে) হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তা জানালে (তিনি) তা তালাশ করতে করতে সেখানে থেমে গেলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সাথে থেমে গেল। তাঁদের কাছাকাছি কোথাও পানি ছিলনা। তারপর লোকজন (আমার পিতা) আবূ বকর (রা) এর কাছে এসে বলতে লাগল, আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে, আয়েশা কি করেছেন? তিনি তো (হার হারিয়ে ফেলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আটকে দিয়েছেন এবং সেই সাথে সমস্ত লোককে আটকা থাকতে বাধ্য করেছেন। অথচ কাছাকাছি কোথাও পানি নেই আর সেনাদলের

সাথেও পানি নেই। তারপর আবূ বকর (রা) আমার কাছে আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার উরুর উপর মাথা রেখে আরাম করছিলেন। তিনি এসে বললেন ঃ তুমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং লোকদেরকে আটকে রেখেছ অথচ তাঁরা না পানির কাছাকাছি, আর না তাঁদের কাছে পানি আছে। আয়েশা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং যা বলার তা বললেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার পাঁজরে আঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে ছিলেন বলে আমি মোটেই নড়াচড়া করি নি পাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এমনি করে পানি বিহীনভাবে সকাল হলো। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। তখন সকলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। বায়'আতে আকাবার অন্যতম দলপতি উসায়দ ইব্ন হুযাইর (রা) বলেন, হে আবূ বাকর তনয়া। এটাই আপনার প্রথম বকরত নয় (এর পূর্বে ও আপনার মাধ্যমে উম্মত বহু বরকত লাভ করেছে)। আয়েশা (র) বলেন এরপর আমি যে উটের উপর ছিলাম সেটিকে চলার জন্য উঠালে উক্ত হারটি তার নিচে পাওয়া গেল। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা মুসলিমের।)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে যে তায়াম্মুমের আয়াত সম্পর্কে ইঙ্গিতে দেয়া হয়েছে তা সম্ভবত সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا–

"তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা মুখ ও হাতে মাসেহ্ করবে। আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।" (৪, সূরা নিসা ঃ ৪৩)

সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ সূরা মায়িদার দ্বিতীয় রুকূতে ও অনুরূপ আয়াত রয়েছে। কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মায়িদার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে সূরা নিসায় বর্ণিত আয়াতই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর সূরা মায়িদার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٦٨– عَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ اَمَا تَذْكُرُ لَنَا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ

اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ هٰذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - رواه البخارى ومسلم

৬৮. হযরত আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি উমর (রা) এর নিকট এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি কিন্তু পানি পাচ্ছি না (সুতরাং এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?)। তখন (সেখানে উপস্থিত) আম্মার (রা) উমর (রা) কে বললেন ঃ আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমি ও আপনি কোন এক সফরে ছিলাম। সে সফরে (আমাদের উভয়ের গোসলের প্রয়োজন হয়) আপনি সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম (কেননা আমার ধারণায় তায়াম্মুমে গোসলের মত সারা দেহসহ করতে হয়) এবং সালাত আদায় করে নিলাম। আমি (সফর থেকে ফিরে এসে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ বিষয় অবহিত করলে তিনি জানালেন যে, তোমার জন্য (সারা দেহের পরিবর্তে) এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'হাত যমীনে মেরে তা থেকে ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলেন। এরপর উভয় হাত দ্বারা তাঁর চেহারাও দু'হাত মাসেহ্ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তাতে হযরত উমর (রা)-এর সালাত আদায় না করার ব্যাপারে ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তম্মধ্যে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, সম্ভবত তিনি পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং এ ব্যাপারে খানিকটা আশাবাদীও ছিলেন। এ জন্যই তিনি ঐ সময় তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা সমীচীন মনে করেননি। আর হযরত আম্মার (রা) তখনও জানতেন না যে, নাপাকীর গোসলের জন্য যে তায়াম্মুম করতে হয় তাও উযূর মত। এজন্য তিনি নিজ ইজ্তিহাদের নিরিখে মাটিতে গড়াগড়ি করেন। তারপর যখন তিনি তাঁর অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবহিত করেন, তখন তিনি তার ভুল সংশোধন করে দেন এবং বলেন, উযূর বিপরীতে তায়াম্মুমে যে সকল অঙ্গ মাসেহ্ করতে হয়, নাপাকীর গোসলের বিপরীতেও ঠিক একইভাবে যে সব মাসেহ্ করে নিতে হয়। হযরত আম্মার (রা) উযূর বিপরীতে তায়াম্মুম সম্পর্কীয় বিষয় অবহিত ছিলেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সে ব্যাপারে শুধু ইঙ্গিত করলেন।

হযরত আম্মার (রা) বর্ণিত এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, তায়াম্মুমে ধূলা বিযুক্ত হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ্ করা করা জরুরী নয়। বরং মাটিতে হাত রাখার পর উক্ত ধূলা ফুঁক দিয়ে মসেহ্ করাই উত্তম।

(٦٩) عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّعِیْدَ الطَّیِّبَ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ یَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِیْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْیُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذَالِكَ خَیْرٌ- رواه أحمد وأبوداؤد

৬৯. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। যখন পানি পাবে সে যেন তার শরীরে তা (অর্থাৎ উযূ গোসল করে) এটাই তার জন্য উত্তম। (আহ্‌মাদ, তির্‌মিযী ও আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি দশ বছর ধরে উযূ অথবা গোসলের জন্য পানি না পায় তার জন্য তায়াম্মুই যথেষ্ট। তবে পানি পাওয়া গেলে তা দ্বারাই গোসল অথবা উযূ করে নেয়া জরুরী হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ প্রায় সারা উম্মাত এ ব্যাপারে একমত যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয কিন্তু পানি না পাওয়া কিংবা রোগগ্রস্ত হয় তবে সে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। তারপর পানি পাওয়া গেলে অথবা রোগ নিরাময় হয়ে গেলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব হবে।

٧٠- عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیْ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِیْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَیْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَیَمَّمَا صَعِیْدًا طَیِّبًا فَصَلَّیَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِی الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ یُعِدِ الاَخَرُ ثُمَّ اَتَیَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَالِكَ فَقَالَ لِلَّذِیْ لَمْ یُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَأَتْكَ صَلوتُكَ وَقَالَ لِلَّذِیْ تَوَضَّأَ وَ اَعَادَلَكَ الاَجْرُ مَرَّتَیْنِ - رواه أبوداؤد والدارمی

৭০. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে সালাতের সময় হল, কিন্তু তাঁদের নিকট পানি ছিল না। সুতরাং তাঁরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নিলেন। এরপর তাঁরা সালাতের সময়ের মধ্যেই পানি পেলেন। তাঁদের একজন উযূ করে সালাত আদায় করলেন এবং অপরজন পুনঃসালাত আদায় করলেন না। তারপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলেন এবং তাঁর কাছে ঘটনাটি অবহিত করলেন। যে ব্যক্তি পুনঃ সালাত আদায় করেন নি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছ এবং তোমার সেই সালাতই তোমার জন্য যথেষ্ট (বিধি মতে এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুমসহ সালাত আদায় যথেষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে পানি পেলেও দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করতে হয়না) জন্য যথেষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উযূ করে পুনঃ সালাত আদায় করেছিলেন তিনি তাঁকে বললেন ঃ তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার (কেননা তোমার দ্বিতীয় বারের সালাত বদল বলে গণ্য হবে) (আবূ দাঊদ ও দারিমী)।

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাত অধ্যায়

الله اكبر -আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ

"سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ"

"হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য যাবতীয় পবিত্রতা ও প্রশংসা, তোমার নাম বরকতময়। তুমি মহান মর্যাদার অধিকারী। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।"

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমার প্রতিপালক। আমার প্রার্থনা কবূল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! যে দিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনদের ক্ষমা করে দিও।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪০-৪১) আমীন হে দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সালাতের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য

নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী মাহাত্ম্য ও অনুগ্রহসমূহ, পবিত্রতা ও একত্ববাদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা মেনে চলা এবং ঈমান আনার প্রথম সহজাত দাবি এই যে, মানুষ যেন নিজকে তাঁর জন্য উৎসর্গ করে, ইবাদত, ভালবাসা ও বিনয় নম্রতা প্রকাশ করে, তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং তাঁকে স্মরণের মধ্য দিয়ে নিজ অন্তর আত্মাকে জ্যোতির্ময় করে তোলে। এটাই সালাতের প্রকৃত বিষয়বস্তু। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এলক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সালাত শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর এজন্য প্রত্যেক নবী-রাসূলের শিক্ষা এবং শরী'আতে আনার পর প্রথম করণীয়রূপে সালাতকে নির্ধারিত করা হয়েছে। তাই

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত শরী'আতেও সালাতের শর্তাবলী, রুক্নসমূহ, সুন্নাতসমূহ, নিয়মকানূন এবং সালাত ভঙ্গের ও মাকরূহ হওয়ার বিষয় সবিস্তার বিবরণ গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। একে এমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন ইবাদতকে দেওয়া হয়নি। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার সালাতের বিবরণের শুরুতে বলেছেন–

"জেনে রেখ, মর্যাদা, দলীল-প্রমাণ ও আল্লাহ্ ভীরু মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধির দিক থেকে সালাত বিশিষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর এরই মাঝে নিহিত রয়েছে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপকারিতা। এজন্যই শরী'আতে সালাতের নির্দিষ্ট সময়, শর্ত, রুক্ন, নিয়ম-কানূন আদব ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। অপরাপর ইবাদতের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে এত গুরুত্বারোপ করা হয়নি। সালাতের বিশেষ অবস্থানিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রে কারণে একে দীলের বিশেষ প্রতীকরূপে গণ্য করা।"

উক্ত গ্রন্থের অন্য একস্থানে সালাতের মৌলিক দিকের হাকীকত বর্ণনা করে বলা হয়েছে" সালাতের মূল বিষয় তিনটি। যথা–

(ক) আল্লাহ্ তা'আলার অপার মাহাত্ম্য ও অশেষ ক্ষমতার বিষয় অনুধাবন করে অন্তরে পরম বিনয় ও ভীতি পোষণ করা।

(খ) আল্লাহ্র মাহাত্মের সামনে সেই বিনয় ও ভীতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মুখে প্রকাশ করা।

(গ) সেই ভীতি ও বিনয় মুতাবিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে আমাদের মাহাত্ম্য ও নিজের ক্ষুদ্রতার সাক্ষ্য দেওয়া।"

তিনি আরো বলেন সালাতের হাকীকত তিনটি বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। যথাঃ–

(ক) আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের কথা নিজ চিন্তায় স্থান দেয়া।

(খ) এমন কতিপয় দু'আ ও যিক্র- আযকার করা, যার মাধ্যমে বান্দার বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নিবেদিত হওয়া এবং নিজ মন মানসিকতা একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্ অভিমুখী করে তোলা বুঝায়। তাছাড়া নিজ চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়া।

(গ) সালাতের কতিপয় মর্যাদাপূর্ণ কাজ যেমন রুকূও সিজ্দা ইত্যাদি ইবাদতে পূর্ণতার এবং আল্লাহ্ অভিমুখী করে তুলতে অনুপ্রাণিত করে।"

এরপরে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) সালাতের আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্যও প্রভাব বিস্তারকারী দিক তুলে ধরেছেন।

(ক) সালাত ঈমানদারের জন্য মি'রাজ। আখিরাতে মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যে দীদার লাভ করবে তার যোগ্যতা সৃষ্টির ব্যাপারে সালাতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

(খ) সালাত আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও রহমত প্রাপ্তির মাধ্যম।

(গ) কোন মানুষের মধ্যে যখন সালাতের হাকীকত অর্জিত হয় এবং সালাত তার আত্মায় প্রভাব বিস্তার করে তখন বান্দা আল্লাহ্‌র জ্যোতির মধ্যেই প্রকারান্তরে ডুব দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে। যেমন ময়লা বিযুক্ত বস্তু নদীতে নিমজ্জিত করার ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় অথবা মরিচা বিযুক্ত লোহা যেমন হাপ দ্বারা পরিষ্কার করা হয়।

(ঘ) অন্তরের একাগ্রতা এবং বিশুদ্ধ নিয়্যাতের সাথে সালাত আদায় জড়তা, কুচিন্তা এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনা দূরকরণের অনুপম পদ্ধতি অব্যর্থ ঔষধ।

(ঙ) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতকে মুসলিম উম্মাতের সাধারণ ইবাদত ঘোষণা করায় তা কুফ্‌র, শির্‌ক, ফিস্‌ক ও ভ্রষ্টতার জাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটি অনন্য উপায় সাব্যস্ত হয়েছে এবং তা মুসলমানের জন্য এমন একটি স্বাতন্ত্র্য রূপ পরিগ্রহ করেছে যা দ্বারা কাফির এবং মুসলমানের মধ্যে পৃথক পরিচিত তুলে ধরা যায়।

(চ) মানুষের স্বভাবকে বুদ্ধিবৃত্তির অনুগামী করার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সালাত বিশেষ মাধ্যমরূপে বিবেচিত।

হযরত শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ (র) সালাতের যে সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা মূলত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিভিন্ন বাণী থেকে নেয়া এবং তিনি সবগুলোর বরাতও দিয়েছেন। এসব হাদীস পরে আসবে বিধায় এখানে উল্লেখ করিনি।

সালাতের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌ (র) সূত্রে উপরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা আমি (গ্রন্থকার) যথেষ্ট মনে করছি। সুধী পাঠক হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌ (র)-এর বাণী নিজ মননে ধারণ করে সালাত সম্পর্কীয় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীস পাঠ করুন।

সালাত বর্জন ঈমানের পরিপন্থী এবং কুফরী কাজ

١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةَ-- رواه مسلم

১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী বস্তু হল সালাত বর্জন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সালাত দীনের এমন এক প্রতীক এবং ঈমানের এমন অনিবার্য দাবি যে, সালাত বর্জনের ফলে বান্দা যেন কুফ্রীর সীমায় পৌঁছে যায়।

٢- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلٰوةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ - رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه

২. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও ইসলাম কুবলকারী সাধারণ লোকদের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা হল সালাত (অর্থাৎ প্রত্যেক নও মুসলিমের নিকট থেকে ইসলামের প্রতীক সালাতের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়)। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত বর্জন করবে সে যেন ইসলামের পথ বর্জন করে কাফিরের পথ অবলম্বন করল। (আহ্মাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ)

٣- عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ اَنْ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِّعَتْ وَحُرِّقَتْ وَلاَ تُشْرِكْ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدَةً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةَ وَلاَ تُشْرِبَ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

৩. হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরম বন্ধু (রাসূলুল্লাহ্ স) আমাকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে কেটে টুক্রো টুক্রো করা হয় বা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। স্বেচ্ছায় কখনো ফরয সালাত বর্জন করবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা বর্জন করবে তার থেকে নিরাপত্তা দূর হয়ে যাবে যা আল্লাহ্র ওরফ থেকে অনুগত মু'মিন বান্দাদের জন্য রয়েছে। মদ পান করবে না। কারণ তা হল, সকল অনিষ্টের মূল। (ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রে যেমনিভাবে প্রজা সাধারণের কতিপয় অধিকার রয়েছে। তারা বিদ্রোহের মত কোন গুরুতর অপরাধ করা পর্যন্ত ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে, একইভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় সকল মু'মিন-মুসলিমের জন্য কতিপয় বিশেষ নি'আমত দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। (যার বহিঃপ্রকাশ আখিরাতে হবে।) আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ দারদা (রা) কে লক্ষ্য করে বলেছেন, স্বেচ্ছায় সালাত বর্জন কেবল অন্যান্য পাপের মত একটি পাপ মাত্র নয় বরং তা এক ধরনের ঘোরতর বিদ্রোহ। যার

লে সালাত বর্জনকারী আল্লাহ্‌র যাবতীয় নি'আমত প্রাপ্তির অধিকার হারিয়ে ফেলে এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

একই বিষয়ের উপর অন্য একটি হাদীস ও হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ শব্দ ব্যবহার জোর তাগিদ দিয়েছেন। তবে উক্ত হাদীসের শেষ কথা এরূপ–"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সালাত বর্জন করবে সে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে।" (তাবারানী, আত্‌তারগীব ওয়াত তারহীব)

এসব হাদীসে সালাত বর্জনকে কুফ্‌র অথবা দীন থেকে বহিস্কারের যে, ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তার কারণ সম্ভবত এই সালাত ঈমানের এমনই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন এবং ইসলামের বিশেষ প্রতীক, যা বর্জনের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সালাত বর্জনকারীর সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন সম্পর্ক নেই এবং সে নিজকে ইসলাম থেকে গুটিয়ে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায় একথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করা যায় না যে, এক ব্যক্তি মু'মিন মুসলিম অথচ সে সালাত বর্জন করবে। এজন্য সে সময় কারো সালাত বর্জন একথারই প্রকাশ্য প্রমাণ ছিল যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান নয়। এখানে বিশিষ্ট তাবিঈ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাফীক (র) সাহাবা কিরাম সম্পর্কে যে বাণী প্রদান করেছেন তা উল্লেখের বিশেষ দাবি রাখে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীগণ সালাত ব্যতীত কোন কাজ বর্জন করাকে কুফরী মনে করতেন না। (মিশকাত : বরাতে তিরমিযী)

এই অধমের মতে, এর মর্ম হল, সাহাবা কিরাম দীনের অপরাপর রুক্‌ন ও আমল যেমন সাওম, হাজ্জ, যাকাত, জিহাদ, এমনিভাবে আখ্‌লাক ও লেন-দেন সম্পর্কীয় বিষয়ে অসতর্কতাকে পাপের কাজ মনে করতেন। তবে সালাত যেহেতু ঈমানের অনিবার্য দাবিও আমলী প্রমাণ এবং দীনের অন্যতম প্রতীক তাই তা বর্জন করাকে দীনের অন্যতম প্রতীকতা বর্জন করাকে দীনের সাথে সম্পর্ক হীনতা ও বেরিয়ে যাবার লক্ষণ বলে মনে করতেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এবং অপরাপর প্রাজ্ঞ আলিমের মতে, সালাত বর্জন করলে মানুষ নির্ঘাত কাফিরও মুরতাদ হয়ে যায় এবং ইসলামের সাথে তার আদৌ সম্পর্ক থাকেনা। এমনকি সে যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তার জানাযা নেই এবং মুসলিম গোরস্তান তার দাফনও হবে না। মোটকথা, তার অবস্থা মুরতাদ ব্যক্তির অনুরূপ হবে। এসকল মহান ব্যক্তিবর্গের মতে, কোন মুসলমাননের সালাত বর্জন প্রকারান্তরে কোন বা ক্রুশের সামনে সিজ্‌দা করা অথবা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর

শানে বে-আদবীর শামিল। এতে মানুষ কাফির হয়ে যায় চাই তার বিশ্বাসে কোন পরিবর্তন আসুক আর নাই আসুক। অপরাপর ইমামগণের মতে, সালাত বর্জন যদিও কুফরী কাজ, ইসলামে যার স্থান নেই। তবে কোন হতভাগ্য লোক যদি অচেতনভাবে সালাত বর্জন করে কিন্তু অন্তরে সালাতের অস্বীকৃতি ভাব না জন্মে এবং বিশ্বাসে কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু পুরোপুরি অমুসলিম বলে গণ্য হবে না এবং তার উপর হদ্দের বিধানও কার্যকর হবে না। উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় এই সকল আলিম অভিমত দেন যে, সালাত বর্জনকে যে কুফ্র বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল, কাজটি কুফরীর শামিল। এর ভয়াবহ শাস্তির কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য এ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ক্ষতিকর আহার্যের ব্যাপারে বলা হয় এ হচ্ছে বিষ পানের শামিল।

٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ اَمْرَ الصَّلٰوةِ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلاَ بُرْهَانًا وَلاَ نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ اُبَىِّ بْنِ خَلْفٍ - رواه أحمد الدرمى والبهيقى فى شعب الايمان

৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। একদা তিনি সালাত প্রসেঙ্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য তা জ্যোতি (কিয়ামতের অন্ধকারে সে আলো পাবে, আল্লাহ্র আনুগত্যের) প্রমাণ ও নাজাতের কারণ হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে না বরং গাফিলতি করল তা তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। সুতরাং কারূন, ফিরাউন, হামান ও (মক্কার কাফিরদের অন্যতম নেতা) উবাই ইবন খালফের সাথে তার কিয়ামত হবে। (আহ্মাদ, দারিমী এবং বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ সালাত বর্জন এমন গুরুতর অপরাধ যার ফলে সালাত বর্জনকারী জাহান্নামে পৌঁছে যায় যেখানে ফির'আউন, হামান, কারূন ও উবাই ইব্ন খাল্ফের স্থান হবে। তবে সকল জাহান্নামীর শাস্তি কিন্তু একই রাখা হবে না। কারণ একটি জেলখানায় অনেক আসামী থাকলেও অপরাধ অনুসারে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি হয়ে থাকে। কেননা ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ "অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর।" (২৪, সূরা নূর ঃ ৪০)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়া এবং তা আদায়কারীকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার

٥- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَلَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ- رواه أحمد وأبو داؤد

৫. হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে যথাসময়ে সালাত আদায় করবে এবং যথার্থরূপে রুকূ ও সিজ্‌দা করবে এবং বিনয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট এ মর্মে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা করবে না (সালাতে গাফিলতি করে) তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন, নতুবা ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। (আহ্‌মাদ ও আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি পূর্ণ গুরুত্ব ও একাগ্রতার সাথে উত্তমরূপে সালাত আদায় করবে সে প্রথমতঃ নিজকে পাপমুক্ত রাখল। এরপরেরও যদি সে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অথবা নফসের ধোঁকায় পড়ে কখনো শাস্তিযোগ্য পাপ করে, তথাপিও সালাতের বরকতে তাকে তাওবা ও ক্ষমার তাওফীক দেওয়া হবে (বাস্তবে এমন বহু ঘটনা ঘটতে দেয়া যায়)। এতদ্ব্যতীত সালাত তার পাপের কাফ্‌ফারা ও প্রতিবিধান হয়ে যাবে। এছাড়াও সালাত অপরাপর পাপের ময়লা পরিষ্কার করে বান্দাকে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের হক্‌দার বানায়। কারণ সালাত এমন ইবাদত যাতে ফিরিশ্‌তারা ঈর্ষাবোধ করেন। সুতরাং যে লোক যাবতীয় শর্ত, নিয়ম কানূন পূর্ণ গুরুত্ব ভীতি ও একাগ্রতার সাথে সালাত করবে তার জন্য ক্ষমা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার দাবিদার অথচ সালাতের ব্যাপারে অসচেতন, তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা নিজ করুণায় ক্ষমা দিবেন। তবে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তার মুক্তি পাবার কোন নিশ্চয়তা নেই।

সালাত পাপ মোচন এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম

٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَئَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَئٌ قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ شَئٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهِ بِهِنَّ الْخَطَايَا - رواه البخارى ومسلم

৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কারো দরজায় পাশে একটি নদী থাকে এবং তাতে কেউ দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার দেহে ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবীগণ বললেন, কোন ময়লাই থাকতে পারে না। তিনি বললেন ঃ এই হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপমা। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ (সালাত আদায়কারীর) পাপসমূহ মোচন করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির যদি সালাতের হাকীকত নসীব হয়, তবে সে যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন যেন সে আল্লাহ্র রহমতের গভীর সমুদ্রেই ডুব দেয়। যেমন ময়লা ও দুর্গন্ধময় কাপড়-চোপড়ের ময়লা যেমন নদীর পানিতে দূরীভূত হয়ে যায়, তদ্রুপ সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে বান্দার অন্তরের ময়লাসমূহ দূর হয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্যোতিতে অন্তর জ্যোতির্ময় পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুতরাং কোন মানুষ যদি দৈনিক এই আমল করে, তবে তার দেহে বিন্দু পরিমাণ ময়লাও থাকতে পারে না। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর মর্ম এটাই। পরবর্তী হাদীসে নবী কারীম (সা.) একদা শীতের মওসূমে বের হন আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল।এ সময় তিনি একটি গাছের দু'টি শাখা , হাতে ধরেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সব পাতা ঝরে পড়ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সালাত আদায় করে তখন তার পাপসমূহ বিমোচিত হয় যেভাবে এই গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (আহ্মাদ)

সূর্যের কিরণ ও মওসূমগত কারণে যেমন গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং যৎসামান্য নাড়া দিলেই যেমন তা ঝরে পড়ে, অনুরূপ কোন মু'মিন লোক যদি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই সালাত আদায় করে, তবে আল্লাহ্র দীপ্তিময় জ্যোতি ও তার পাপরাশির দুর্গন্ধ দূর করে তাকে পূতপবিত্র করে তুলে।

٧- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَةُ قَالَ فَقَالَ

يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُبِهَا وَجْهَ اللّٰهِ تَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَةُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ– رواه أحمد

৭. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শীতের মওসুমে বের হন আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। এসময় তিনি একটি গাছের দু'টি শাখা হাতে ধরেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন ঃ মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশে সালাত আদায় করে তখন তার পাপসমূহ বিমোচিত হয়, যে ভাবে এই গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (আহ্মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ সূর্যের কিরণ ও মওসুমগত কারণে যেমন গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং যৎ সামান্য নাড়া দিলেই যেমন ঝরে পড়ে অনুরূপ কোন মু'মিন লোক যদি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই সালাত আদায় করে। তবে আল্লাহ্র দীপ্তিময় জ্যোতি ও তার পাপ রাশির দুর্গন্ধ দূর করে তাকে পূতপবিত্র করে তুলে।

٨– عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اِمْرَءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلٰوةُ مَكْتُوْبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً وَذَالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ – رواه مسلم

৮. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তি ফরয সালাতের সময় হওয়ার পর উত্তমরূপে উযূ করে পূর্ণ বিণয় ও একাগ্রতা সহকারে ভালোভাবে রুকূ সিজ্দাসহ সালাত আদায় করবে, কবীরাগুনাহ না করার শর্তে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। আর সালাতের এ বরকত সুফল সব সময়ের জন্য অব্যাহত থাকবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, সালাত যথা নিয়মে আদায়ের ফলে তা পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় এবং পরবর্তী গুনাহসমূহ ও দূর হয়ে যায়। তবে শর্ত হল এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন কবীরা গুনাহকারী না হয়। কারণ কবীরাগুনাহ নাপাকী এত মারাত্মক ক্রিয়াশীল ও প্রভাবময়ী যে, যার ক্ষতিপূরণ কেবল তাওবার মাধ্যমেই হতে পারে। তবে আল্লাহ্ যদি নিজ দয়ায় এমনি ক্ষমা করে দেন, তবে তাতে কিছু বলার নেই।

সালাতের বিনিময়ে জান্নাত ও মাগফিরাতের অঙ্গীকার

٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ---- رواه مسلم

৯. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন উত্তমরূপে উযূ করে তারপর অন্তর ও চেহারা আল্লাহ্ অভিমুখী করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা অনুযায়ী উযূ করে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তবে তার মূল্য আল্লাহ্‌র নিকট এতটুকু যে, সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে।

١٠- عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- رواه أحمد

১০. হযরত যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নির্ভুলভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে আল্লাহ্ তার পূর্ববর্তী পাশারাশি (সগীরা গুনাহসমূহ) ক্ষমা করে দিবেন। (আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যাই এ হাদীসের ব্যাখ্যা।

হতভাগ্যদের জন্য আফসোস

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সালাতের প্রতি এত অনুপ্রেরণা ও ভয় প্রদর্শনমূলক অসংখ্য বাণী প্রদানের পরও যারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন ও বেপরোয়া তারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগহ থেকে বঞ্চিত এবং তারা তাদের আখিরাতকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

"আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম করেন নি বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৭)

সালাত সর্বাধিক প্রিয় আমল

١١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَيُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رواه البخارى

১১. হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন্ কাজ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়, সে বিষয় আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন ঃ যথাসময়ে সালাত আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও আল্লাহর্ পথে জিহাদ করাকে উত্তম কাজ বলার সাথে সাথে সালাতকে সর্বাধিক প্রিয় কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিঃসন্দেহে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এসবের মধ্যে সালাতের স্থান সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, "সালাতের হাকীকত" নামক রিসালার এই অধমের সবিস্তার বিবরণ দিয়েছে। কাজেই তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সালাতের সময়সমূহ

সালাতের যে মহান উদ্দেশ্য ও উপকারিতা রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ তাতে যে স্বাদ অনুভব করেন তার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, দিন রাতে সারাক্ষণ না হলেও কমপক্ষে দিন রাতের বেশিরভাগ সময় সালাতে অতিবাহিত করা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর এতদ্ব্যতীত আরো অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর তাই তিনি মানুষের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। তবে তিনি সালাতের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে সালাতের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং বান্দার অপরাপর দায়িত্ব পালনেও ব্যাঘাত না ঘটে।

আল্লাহ্ তা'আলা ফজরের সালাত সুবহে সাদিকের পর নিদ্রাভঙ্গ শেষে এজন্য ফরয করেছেন যাতে ইবাদতের মধ্যে দিয়ে বান্দার কাজের সূচনা হয়। তারপর দুপুরের পর সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত ফরয কোন সালাত নেই, যাতে মানুষ তার নিজ নিজ দায়িত্ব এ দীর্ঘ সময়ে আঞ্জাম দিতে পারে। এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যুহরের সালাত ফরয করা হয়েছে। এ সালাত আদায়ের জন্য এমন দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়েছে যাতে প্রথম সময়ে কিংবা শেষ সময়ে সালাত আদায়

করা যায় এবং এ দীর্ঘ সময়েও যেন কারো অসচেতনা দেখা না যায়। বিকেলের লক্ষণ শুরু হওয়ার সময় আসরের সালাত ফরয করা হয়েছে যাতে এই নির্দিষ্ট সময়ে অধিকাংশে লোক নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের পর আনন্দ স্ফূর্তি করে কাটায় তখন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ সালাতে মশগুল হয়ে যায়। এরপর দিনের অবসানের পর মাগরিবের সালাত ফরয করা হয়েছে যাতে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্-তাহ্‌লীলের মধ্য দিয়ে রাতের সূচনা হয়। তারপর নিদ্রা যাবার পূর্বে ইশার সালাত ফরয করা হয়েছে যাতে দিনের সূচনা যেমন সালাত দ্বারা হয়েছে ঠিক যেরূপ নিদ্রার পূর্বে মুহূর্তেও যেন সালাতের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। আর এর দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমাদের সুবিধার্থে এসব সালাতের মধ্যে ব্যাপক সময় দান করা হয়েছে যাতে আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী আমরা প্রথম, মধ্য কিংবা শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করতে পারি।

এই বিশ্লেষণের উপর যদি কোন লোক গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে তার সামনে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, যুহর থেকে ইশা পর্যন্ত সালাতসমূহের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা অল্প সময়ের হলেও একজন সত্যনিষ্ঠ মু'মিনের কাছে সালাত যে অমূল্য সম্পদ এবং যে স্বাদের বস্তু তার পক্ষে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়াই সাধারণ অবস্থার দাবি এবং এর দ্বারা যেন আল্লাহ্ এবং তাঁরই বান্দার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে যায়। ফজর থেকে যুহরের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান এজন্য রাখা হয়েছে । যাতে মানুষ এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার অপরাপর কর্তব্য কর্ম আঞ্জাম দিতে পারে। তবে যারা ভাগ্যবান তারা এই দীর্ঘ সময়ের ফাঁকে চাশ্‌তের সালাত আদায় করে থাকে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইশার সালাত থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত কোন সালাত ফরয করেন নি যাতে মানুষের সহজাত দাবি অনুযায়ী আরাম করতে পারে। এ সময়ের মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান রাখা হয়েছে। তবে এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সালাতের অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। মুকীম-মুসাফির সর্বাবস্থায় নিজেও তা পালন করতেন। চাশ্‌ত ও তাহাজ্জুদের সালাত সম্পর্কিত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপ্রেরণামূলক যে বাণী প্রদান করেছেন সে বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। নিম্নোক্ত আলোচনা কেবল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ পর্যায়ের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ وَقْتُ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْاَوَّلُ وَوَقْتُ الصَّلٰوةِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَالَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطُ قَرْنُهَا الْاَوَّلُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ -

رواه البخاری ومسلم واللفظ المسلم

১২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, সূর্যের উপরের অংশ উদিত না হওয়া পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময় রয়েছে। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে আসরের সালাতের সময় না হওয়া পর্যন্ত যুহরে সালাতের সময় রয়েছে। সূর্যের আলোকরশ্মি হলুদ বর্ণ ধারণা না করা পর্যন্ত এবং তার নিম্নাংশ অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকে। মাগরিবের সালাতের সময় সূর্যাস্ত থেকে শাফাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত এবং ইশার সালাতের সময় অর্ধরাত পর্যন্ত অবশিষ্ট (বুখারী ও শব্দমালা মুসলিমের)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে জনৈক প্রশ্নকারীর জবাবে সালাতের প্রথম ও শেষ সময় বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রশ্নকারী সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কোন্ সময় পর্যন্ত আদায় করা যায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন এবং সালাতের শেষ সময় কি? সালাতের প্রথম সময় সম্পর্কে সম্ভবতঃ তিনি অবহিত ছিলেন।

মাগরিবের সালাত সম্পর্কে এই হাদীসে বলা হয়েছে 'শাফাক' অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময় থাকে। 'শাফাক' কি এ বিষয় প্রাজ্ঞ আলিমগণ একাধিক মতামত দিয়েছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে লাল আভা ভেসে উঠে।[১] তারপর উক্ত আভা দূর হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ঐগুলি সাদা হয়ে যায়[২]।

এরপর আবার উক্ত সাদা আভা অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর কালো আভা নেমে আসে। সুতরাং অধিকাংশ আলিমের অভিমত হচ্ছে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে

১. বেশির ভাগ সময় এই লাল রং প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়।

২. এই সাদা আভা প্রায় আধা ঘন্টা স্থায়ী হয়।

যে লাল আভা ফুটে ওঠে তাই 'শাফাক। এই অভিমত দানকারীদের মতে, পশ্চিমাকাশের লাল আভা দূরীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হয়ে যায় এবং ইশার সালাতের সূচনা ঘটে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে যে লাল আভা দেখা যায় এবং তারপর যে সাদা আভা দেখা যায় এতদুভয়কে 'শাফাক' বলা হয়। এ অভিমত অনুসারে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এর পশ্চিমাকাশে 'শাফাক' এর পর অর্থাৎ সাদা রেখা যখন অবশিষ্ট না থাকে এবং পশ্চিামকাশ কালো হয়ে যায়, তখন থেকে ইশার সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সূত্রে আরেকটি অভিমত রয়েছে যা অপরাপর ইমামগণের অনুরূপ। এই মাস'আলার ব্যাপারে তাঁর দুই প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এই অভিমত দিয়েছেন। আর এজন্যই বহু প্রবীন হানাফী ফিকহ্‌বিদ এই মতের পক্ষে ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন।

এ হাদীস ও আরো কিছু সংখ্যক হাদীসে ইশার সালাতের শেষ সময় অর্ধরাত বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, ইশার সালাতের সময় সুবহি সাদিক পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, যে সকল হাদীসে ইশার সালাতের শেষ সময় অর্ধরাত বলা হয়েছে। তার মর্ম হচ্ছে, অর্ধরাত পর্যন্ত ইশার সালাতের জায়েয সময় অবশিষ্ট থাকে এবং এর পরে আদায় করা মাকরূহ্ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

١٣- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِىْ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسَ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ اَمَرَهُ فَاَبْرِدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسَ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَصْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ – رواه المسلم

১৩. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সালাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সে মতে তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি আমাদের সাথে (আজও কাল এই) দুই দিন সালাত আদায় কর। (প্রথম দিন) সূর্য ঢলে পড়তেই তিনি বিলাল (রা) কে আযান দিতে বললেন। তিনি আযান দিলেন। এরপর তিনি তাকে যুহরের ইকামত দিতে বললেন এবং যুহরের সালাত আদায় করা হল। আসরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি বিলাল (রা) কে নির্দেশ দিলে তিনি যথারীতি আসরের আযান ইকামত দেন। উল্লেখ্য, তখন সূর্য উপরে অবস্থিত শুভ্র ও স্বচ্ছ ছিল। তারপর সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি তাকে মাগরিবের ইকামত দিতে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন। তারপর তিনি শাফাক অদৃশ্য হওয়া মাত্র তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ইশার ইকামত দেন। তারপর রাত শেষে সুব্হি সাদিক হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ফজরের ইকামত দেন ও সালাত আদায় করেন।

তারপর দ্বিতীয় দিন এলে তিনি তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পরপর যুহরের আযান দানের জন্য বিলালকে নির্দেশ দেন। তিনি তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করেন এবং তাপ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়ার পর যুহরের (শেষ ওয়াক্ত) সালাত আদায় করেন। তারপর আসরের সালাত আদায় করেন। তবে সূর্য তখনো উপরে ছিল। কিন্তু প্রথম দিনের অপেক্ষা অধিক বিলম্বে। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করেন, তবে তখন 'শাফাক' অদৃষ্ট হয় নি। এরপর রাতের এক তৃতীয়াংশের পর ইশার সালাত আদায় করেন। তারপর সুবহি সাদিকের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি বললেন, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ এই দুইদিন যা দেখলে তা-ই হচ্ছে তোমাদের সালাতের সময়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সালাতের প্রথম ও শেষ সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল নিজ যবানীতে বুঝিয়ে দেয়ার চাইতে আমল করে দেখানো উত্তম মনে করেছেন। আর তাই তিনি প্রশ্নকারীকে তাঁর সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি প্রথম দিন প্রথম ওয়াক্তে এবং দ্বিতীয় দিন জায়িয ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করে সালাত আদায় করেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি আমাদেরকে যে সময় সালাত আদায় করতে দেখেছ তা-ই হচ্ছে সালাতের প্রথম ও শেষ সময়।

١٤- عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلَى اَبِىْ بَرْزَةَ الأَسْلَمِّىِ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ

فَقَالَ كَانَ يُصَلِّىْ الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الأولَى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّىْ الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلَى رَحْلِهِ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَنَبِيْتُ فُقَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتْمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلْبَيْهِ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِأَةِ - رواه البخارى

১৪. সায়্যার ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি ও আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবূ বারযা আসলামী (রা)-এর নিকট গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে (কোন সময়) ফরয সালাত আদায় করতেন সে বিষয়ে আমার পিতা তাঁর নিকট জানতে চাইলেন। তিনি বললেন ঃ যুহরের সালাত যাকে তোমরা প্রথম সালাত (যুহর) বল, সূর্য ঢলো পড়ার পর তিনি তা আদায় করতেন। আসরের সালাত তিনি এমন সময় পড়তেন যে সালাতের পর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়ীতে ফিরে যেত অথচ সূর্য তখনো পরিষ্কার থাকত। বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিবের সালাত সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন তা আমি ভুলে গেছি। বর্ণনকারী সাহাবী বলেন, ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বল তা তিনি দেরী করে আদায় করতে পসন্দ করতেন এবং এ সালাত আদায়ের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া কিংবা পরে কথা বলা অপসন্দ করতেন। ফজরের সালাত তিনি এমন সময় শেষ করতেন যখন কেউ তার কাছে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত এবং ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশ' আয়াত পাঠ করতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আবূ বারযা আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাগরিবের সালাতের সময় সম্পর্কে বলেছেন তা আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত সায়্যার ইব্‌ন সালমা (রা) বলতে ভুলে গেছেন। অন্য হাদীস সূত্রে জানা যায় যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যাস্তের পর প্রথম ওয়াক্তেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তবে কখনো কখনো বিশেষ কোন অবস্থা হলে বিলম্বে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

١٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّىْ الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ

وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ - رواه البخارى ومسلم

১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত কখন আদায় করতেন। তিনি বললেন ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়লে আদায় করতেন আর সূর্য দীপ্তিমান থাকার সময় (শীত গ্রীষ্মে কোন পার্থক্য হত না) আসরের সালাত আদায় করতেন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরই মাগরিবের সালাত এবং লোক বেশি হলে তাড়াতাড়ি আর কম হলে বিলম্বে ইশার সালাত আদায় করতেন। ফজরের সালাত অন্ধকারেই আদায় করে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে হযরত জাবির (রা) এবং ইতোপূর্বে হযরত আবূ বারযা আসলামী (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে যুহরের সালাত সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাধারণ আমল জানা গেল। আর তা হল এই যে, তিনি দ্বিপ্রহরের পর পরই যুহরের সালাত আদায় করতেন। তবে পরবর্তী হাদীস থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠবে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ অভ্যাস গ্রীষ্ম ব্যতীত অপরাপর ঋতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কারণ যখনই প্রচণ্ড গরম পড়ত তখনই তিনি গরমে ভাটা পড়লে যুহরের সালাত আদায় করে নিতেন এবং উম্মাতকেও সেই দিক নির্দেশনা দিতেন।

١٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ - رواه النسائى

১৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রীষ্ম ঋতুতে ঠাণ্ডার সময় এবং শীত মওসুমে তাড়াতাড়ি ওয়াক্ত শুরু হতেই সালাত আদায় করতেন। (নাসায়ী)

١٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - رواه البخارى

১৭. হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূর্যের তাপ প্রখর হলে তোমরা যুহরের সালাতকে বিলম্বে (প্রখরতা-প্রশমিত হওয়ার পর) আদায় করবে। কেননা তাপের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ায় আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি তার মধ্যে যেগুলোর বাহ্যিকরূপ রয়েছে তা আমরা জানি ও বুঝি। আর কিছু আছে আভ্যন্তরীণ যা আমাদের অনুভবের ঊর্ধ্বে।

নবী-রাসূলগণ কখনো কখনো ঐ সব বস্তুর প্রতি ইংগিত করেন। যেমন, আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ গরমের মওসূমের তাপের প্রখরতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে উদ্ভূত। গরমের প্রখরতার বাহ্যিক কারণ সূর্য, একথা সর্বজনবিদিত এবং তা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু বাতিনী ও অদৃশ্য জগতে জাহান্নামের আগুনের সাথে রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক। আর এ হচ্ছে ঐ বস্তুরই হাকীকত যা নবী রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে, সর্বাধিক সুখ-শান্তির মূলে রয়েছে জান্নাত এবং সর্ববিধ কষ্ট ও দুঃখের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জাহান্নাম। দুনিয়ায় যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ কষ্ট রয়েছে তা আখিরাতের সীমাহীন সুখ-দুঃখের তুলনায় বিশাল সমুদ্রের অথৈ জলরাশির এক বিন্দুর সাথে তুলনীয়। সুখ-দুঃখের কেন্দ্র যেমন জান্নাত-জাহান্নাম, তদ্রুপ এক বিন্দু পানির উৎস ও সমুদ্র। এই হাদীসের আলোকে তাই বলা যায় যে, গ্রীষ্ম ঋতুর প্রখরতা জাহান্নামের প্রবল তাপের সাথেই সম্পৃক্ত। মোদ্দাকথা, গরমের প্রখরতা ও দাবদাহ জাহান্নামের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তা আল্লাহ্‌র ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। আর শীতলতা ও শৈত্য আল্লাহ্‌র অসীম রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ। এজন্যই যে মওসূমের দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের স্থলভাগ জাহান্নামের রূপ, ধারণ করে সে মওসূমে খানিকটা বিলম্বে খরতাপ কমে ঠাণ্ডা হলেই যুহরের সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

١٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ فَيَأْتِى الْعَوَالِىَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ - رواه البخارى ومسلم

১৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আসরের সালাত আদায় করতেন তখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে দীপ্তিমান থাকত। তারপর কেউ উপকণ্ঠের (মদীনার উঁচু অঞ্চল) দিকে গেলে সূর্য তখনো ঊর্ধ্বাকাশেই থাকত। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আনাস (রা) দীর্ঘজীবি ছিলেন। তিনি হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে ইন্তিকাল করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের অবসানের পর উমায়্যা খিলাফতের প্রায় পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় বনূ

উমায়্যার অনেক শাসক আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করত। হযরত আনাস (রা) এ কাজকে ভুল এবং সুন্নাত পরিপন্থী মনে করতেন এবং সময়-সুযোগমত তিনি এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করতেন। এই হাদীস বর্ণনার মূলে তাঁর এ উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বিলম্বে কখনো আসরের সালাত আদায় করতেন না। তিনি যখন আসরের সালাত আদয় করতেন তখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে দীপ্তি ও অপরিবর্তিত থাকত। এমনকি তাঁর সাথে সালাত আদায় করে যদি কেউ মদীনার উপকণ্ঠে যেত তখনো সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে দীপ্তিমানই প্রতিভাত হতো। 'আওয়ালী' মদীনার নিকটবর্তী উপকণ্ঠকে বলা হয়। এটি মদীনা থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত। এসবের মধ্যে যেটি অদূরে সেটির ব্যবধান দুই মাইল আর যা দূরে তার দূরত্ব পাঁচ থেকে ছয় মাইল।

١٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً - رواه مسلم

১৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বসে বসে কেউ কেউ সূর্যের আলো হলদে বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, এমনকি সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝামাঝি এলে সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর দেয়। এতে সে আল্লাহ্কে খুব কমই স্মরণ করে। আর এটাই হল মুনাফিকের সালাত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিশেষ কোন উযর ব্যতীত আসরের সালাত এতটুকু বিলম্বে আদায় করা যাতে সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং মুসল্লী মোরগের ঠোঁট দ্বারা আহার করার ন্যায় তাড়াতাড়ি করে চার রাকা'আত সালাত আদায় করে, যাতে নামমাত্র আল্লাহ্র যিক্র থাকে-এ হল মুনাফিকের সালাত। মু'মিন ব্যক্তির সকল সালাত বিশেষত আসরের সালাত হাদীসে তাড়াতাড়ি রুকু-সিজ্দা করাকে মোরগের ঠোঁটের ঠোকরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সম্ভবত এর চেয়ে চমৎকার উপমা-উৎপেক্ষা আর হতে পারে না।

শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি কোন কোন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। আমরা যেমন শয়তানের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ, তদ্রুপ শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে সূর্য উদয়-অস্তমিত হওয়ার বিষয়টির হাকীকত সম্পর্কেও অনবহিত। তবে কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেন, এটাও একটি চমৎকার উপমা।

মাগরিবের সময় প্রসঙ্গে

٢٠- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَالَمْ يُؤَخِّرُوْا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ – رواه أبوداؤد

২০. হযরত আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত সর্বদা কল্যাণের উপর থাকবে, অথবা তিনি বলেছেন, সৃষ্ট প্রকৃতির উপর থাকবে, যতক্ষণ তারা নক্ষত্ররাজি ঘনভাবে দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব না করে মাগরিবের সালাত আদায় করবে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সালাত সাধারণত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন। এ হাদীস দ্বারা একথাই জানা যায়। যে উযর ব্যতীত তারকারাজি সমগ্র আকাশে দৃষ্টিগোচর হওয়া অবদি বিলম্বে মাগরিবের সালাত আদায় করা অপসন্দনীয় কাজও মাকরূহ। তবে 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত এই সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকে যেমন ইতোপূর্বে এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনো যদি কোন দীনি কাজের চাপে মাগরিবের সালাত আদায় বিলম্ব হয় তখনই কেবল এহেন বিলম্বের অবকাশ থাকতে পারে। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাফীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আসরের সালাতের পর ওয়ায নসীহত শুরু করেন এমনকি সূর্য ডুবে সারা আকাশ জুড়ে তারকারাজি দীপ্তিমান হয়ে ওঠে আর তিনি তার ওয়ায অব্যাহত রাখেন। উপস্থিত জনতার কেউ কেউ আস্সালাত আস্সালাত বলতে থাকেন। এতদশ্রবণে তিনি ভীষণভাবে ধমক দেন এবং বলেন, এহেন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করতেন। তাই এমন অবস্থায় দেরী করা যায়।

ইশার সময় প্রসঙ্গে

٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوْا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ – رواه أحمدوالترمذى وابن ماجه

২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতকে কষ্টে ফেলব একথা যদি মনে না করতাম, তবে আমি তাদেরকে ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধ রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায়ের নির্দেশ দিতাম। (আহ্মাদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্)

٢٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ الاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلاَ نَدْرِيْ اَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِيْ اَهْلِهٖ اَوْ غَيْرَ ذَالِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ تَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلاَ اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِيْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى - رواه مسلم

২২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ইশার সালাত আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। রাতের এক তৃতীয়াংশে অথবা আরো কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। আমরা জানতাম না যে, জরুরী কোন কাজ তাঁকে তাঁর ঘরে ব্যস্ত রেখেছিলেন, না অন্য কোন কাজে তিনি মশগুল ছিলেন। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে (আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন ঃ তোমরা এমন এক সালাতের জন্য অপেক্ষা করছ, যার জন্য তোমরা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বীগণ অপেক্ষা করে নি। আমার উম্মাতের উপর যদি তা কষ্টকর না হতো, তাহলে তাদের নিয়ে (সব সময়) এই সময়ই সালাত আদায় করতাম। তারপর তিনি মুআ'য্যিনকে আদেশ দিলেন। সে সালাতের ইকামত দিল এবং তিনি সালাত আদায় করলেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'টি হাদীস থেকে একথা পরিষ্কার জানা গেল যে, ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশের পর আদায় করা উত্তম। কিন্তু সাধারণ মুসল্লীদের এতক্ষণ জেগে থেকে সালাত আদায় করা সত্যি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ কষ্টের দিকে লক্ষ্য করেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতের সুবিধার্থে তাড়াতাড়ি করে সালাত আদায় করে নিতেন। হযরত জাবির (রা) সূত্রে এ মর্মে একটি হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইশার সালাতে যদি তাড়াতাড়ি লোক সমাগম হতো তাহলে তাড়াতাড়ি, আর বিলম্বে লোক সমাগম হলে বিলম্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করে নিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ও কাজ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি জানা যায় যে, কোন সামষ্টিক আমল সম্পাদন করতে যেয়ে উত্তম সময় পেতে যদি সাধারণ মানুষের কষ্ট হয়, তবে তা বর্জন করাই উত্তম। আল্লাহ্ চাহেত সাধারণ মানুষের কষ্ট বিবেচনা করে উত্তম সময় বর্জন করায় হয়ত বা আরো অধিক সাওয়াব হবে। অন্যকথায় বলা যায়, সামষ্টিক কাজে সময়ের মর্যাদার তুলনায় সাধারণের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে

অগ্রগামী হওয়ার দাবি রাখে। এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, ইশার সালাত কেবল এই উম্মাতের উপরই ফরয। অন্য কোন উম্মাতের উপর এই সালাত ফরয ছিল না। এই কথা অন্য হাদীসে আরো সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে।

٢٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ الْعِشَاءِ الاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ — رواه أبوداؤد والدارمى

২৩. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের এই শেষ ইশার সালাত সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত আছি। তৃতীয় রাতের চাঁদ অস্তমিত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সালাত আদায় করতেন। (আবূ দাঊদ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ অভিজ্ঞতার নিরিখে ও হিসাব করে দেখা গেছে যে, তৃতীয় রাতের চাঁদ সাধারণত দুই-আড়াই ঘন্টা পর অস্তমিত হয়। এই হাদীস সূত্রে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত এই সময়ে ইশার সালাত আদায় করতেন।

ফজরের সময় প্রসঙ্গ

٢٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفَ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ فِىْ الْغَلَسِ — رواه البخارى ومسلم

২৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে যেত, কিন্তু অন্ধকারে তাদের চেনা যেত না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন এরূপ অন্ধকার থাকত যে, মহিলারা মসজিদ থেকে চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘরে ফিরত কিন্তু কেউ তাদের চিনতে পারত না।

٢٥- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهُ ﷺ وَزَيْدَبْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّافَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَ دُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً — رواه البخارى

২৫. কাতাদা সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একরাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) এক সাথে সাহরী খান। তাঁরা সাহরী খাওয়া শেষ করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সালাত আদায় করেন। আমরা আনাসের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সাহরী খাওয়া শেষ করার এবং সালাতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি পরিমাণ সময় ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, কেউ পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করতে পারে এই পরিমাণ সময়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। এই হিসেবে ঐদিন সম্ভবত রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহি সাদিকের সাথে সাথে ফজরের সালাত আদায় করেছিলেন। তবে তার সাধারণ অভ্যাস ছিল এরূপ, তিনি তাড়াতাড়ি (অন্ধকারে) ফজরের সালাত আদায় করে নিতেন, যেমন উপরে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায়। কিন্তু সুবহি সাদিক হতেই ফজরের সালাত আদায় করা তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল না। একথা আবূ বারযা আসলামী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ও অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায়। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত ঘটনার ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, সম্ভবত বিশেষ কোন কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করেন, যেমনিভাবে আমরা কোন বিশেষ অবস্থায় সালাত আদায় করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٢٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلاَجْرِ - رواه أبوداؤد، جامع ترمذى ، دارمى

২৬. হযরত রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ফর্সার সময় (সুবহি সাদিকের ছড়িয়ে পড়লে) ফজরের সালাত আদায় করবে। কেননা এতে অধিক সাওয়াব রয়েছে (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত হযরত আয়েশার হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত এমন অন্ধকারে আদায় করতেন যে, চাদর পরিহিত মহিলারা সালাত শেষে বাড়ি ফেরার পথে তাদের চেনা যেত না।

পক্ষান্তরে হযরত রাফি' ইব্ন খাদীজা (রা) বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, ফজরের আলো দীপ্তিমান হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায়ে রয়েছে অতিরিক্ত সাওয়াব। প্রাজ্ঞ আলিমগণ এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এই অধম (গ্রন্থকার) এর মতে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) বর্ণিত হাদীস মুতাবিক ফর্সার আলোতে ফজরের সালাত

আদায় করা উত্তম। অর্থাৎ এতটুকু বিলম্ব করা চাই যাতে সুবহি সাদিকের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় বেশির ভাগ লোক তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং ফজরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন, যেমন বর্তমানেও কিছু সংখ্যক মুত্তাকী লোক এরূপ করে থাকেন। তাঁদের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায়ে বিলম্ব করতেন না। কারণ সুবহি সাদিকের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর আদায় করা হলে তাদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষাজনিত কষ্ট করতে হতো। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশির ভাগ সময় অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করে নিতেন। যেমন, ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশে আদায় করা উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুসল্লীদের সুবিধার্থে তাড়াতাড়ি আদায় করে নিতেন। ঠিক একইভাবে লোকদের সুবিধার্থে তিনি অন্ধকারেই ফজরের সালাত আদায় করে নিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বক্তব্যও পেশ করেন যে, লোকদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টিদান সময়ের ফযীলতের চেয়ে অধিক মর্যাদার দাবি রাখে।

আমাদের এই বর্তমান যুগে যেহেতু তাহাজ্জুদগুযার ও ফজরের প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়কারী লোকের সংখ্যা কম, তাই সবার সুবিধার্থে সুবহি সাদিকের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পরই ফজরের সালাত আদায় করা উত্তম। কারণ অন্ধকার থাকতেই যদি প্রথম ওয়াক্তে জামা'আতে অংশ নেবে। এ সকল কারণে আমাদের বর্তমান সময়ে কিছু বিলম্ব ফর্সার সময় ফজরের সালাত আদায় করাই উত্তম হবে। তবে হ্যাঁ, কোন এলাকার মুসল্লীরা যদি প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদয়ের জন্য একত্র হয় এবং বিলম্ব করা তাদের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়, তবে তাদের অন্ধকারে আদায় করা উত্তম হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাধারণ আমল ছিল। একারণেই বহু এলাকা রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরিউক্ত আমলের উপর ভিত্তি করে অন্ধকারের মধ্যে ফজরের সালাত আদায় করা হয়।

শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় প্রসঙ্গ

٢٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً لِوَقْتِهَا الاخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى — رواه الترمذى

২৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর পর দু'বার কোন সালাত শেষ ওয়াক্তে আদায় করেন নি। এমনকি এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) আলোচ্য হাদীসে দু'বারের শর্ত এজন্য জুড়ে দেন যে, একবার এক ব্যক্তিকে সকল সালাতের প্রথম ও শেষ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করে দেখিয়েছিলেন। এ ঘটনা সহীহ্ মুসলিমের সূত্রে ১৩ ক্রমিকে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা হযরত আয়েশার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে বিলম্বে সালাত আদায় করা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভ্যাস ছিল না।

٢٨- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلٰثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَلاَ اَيِّمُ اِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا - رواه الترمذى

২৮. হযরত আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আলী! তিনটি বিষয় বিলম্ব করো না। সালাত যখন তার সময় হয়, জানাযা যখন তা উপস্থিত করা হয় এবং স্বামীবিহীন নারী যখন তুমি উপযুক্ত পাত্র (কুফূ) পাও। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত তিনটি কাজ সর্বদা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা উচিত। কোন স্বামীবিহীন মহিলার যদি সমতাসম্পন্ন পাত্র পাওয়া যায়, তবে বিয়ে সম্পাদন করতে বিলম্ব না করা চাই। অনুরূপভাবে কারো জানাযা উপস্থিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দাফন কাফন করা চাই এবং বিলম্ব করা উচিত নয়। অনুরূপ সালাতের (আদায়ের) সময় হলেই তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা উচিত।

٢٩- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْيُؤَخِّرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ - رواه مسلم

২৯. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমার উপর এমন ভ্রান্ত শাসক হবে যারা সালাতকে মিশ্রণ করে (বিনয়ভাব ও নিষ্ঠা ছাড়াই) সালাত আদায় করবে, অথবা বলেছেন, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করবে তখন তুমি কি করবে? (আবূ যার (রা) বলেন) আমি বললাম, এমন অবস্থায় আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যথাসময় সালাত আদায় করে নিবে।

তারপর তাদের সাথেও যদি সালাত পাও, তবে তুমি আবার সালাত আদায় করে নেবে এবং এ সালাত হবে তোমার জন্য নফল। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বানূ উমায়্যার কোন কোন শাসকের আমলে সালাত আদায়ে এমন গড়িমসি লক্ষ্য করা যেত। হযরত আনাস (রা) সহ যে সকল সাহাবা ও অধিকাংশ প্রবীন তাবিঈ বনূ উমায়্যার যুগে বেঁচে ছিলেন, তাঁরা এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতেন।

নিদ্রা কিংবা ভুলের কারণে সালাত কাযা হলে করণীয়

٣٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً اَوْنَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا اَنْ يُّصَلِّيْهَا اِذَا ذَكَرَهَا -رواه البخارى مسلم

৩০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের কথা ভুলে যায় অথবা সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে যায় সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নেয়, কেননা এই হচ্ছে তার কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি (ওয়াক্ত যাওয়ার পর) ঘুম থেকে উঠে কিংবা সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সে যেন সালাত আদায় করে নেয়। এমতাবস্থায় তার সালাত আদায় হিসেবে গণ্য হবে-কাযার গুনাহ্ হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন কোন সফরে এমন ঘটনা সংঘটিত হয়। গভীর রাতে তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ পথ চলতেন। এরই মাঝে একটু অবসাদ কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে আরাম করতে যেয়ে শুয়ে পড়েন এবং হযরত বিলাল (রা) জেগে থাকার ও সবাইকে ফজরের জন্য ঘুম থেকে ওঠানোর দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ্রই অসমী কুদরত, সুবহি সাদিকের সময় স্বয়ং হযরত বিলাল (রা) ঘুমিয়ে পড়েন এমনকি সূর্য ওঠে যায়। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ খোলেন। তারপর সবাই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেন। সবার সালাত কাযা হওয়ার প্রত্যেকেই বিষণ্ন হন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান দানের ব্যবস্থা করে সালাতের ইমামতি করেন এবং বলেন, নিদ্রাজনিত কারণে সালাতের সময় গড়িয়ে গেলে তাতে গুনাহ নেই। বরং জাগ্রত থেকে যদি কেউ সালাত কাযা করে, তবে তার জন্য রয়েছে গুনাহ্। (মুসলিমের সংক্ষিপ্ত সার)

আযান

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পবিত্র মক্কা থেকে মদীনা তাইয়্যেবা হিজরত করেন তখন জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে নির্মাণ করেন। জামা'আতের সময় হলে কিভাবে সহজে লোকদের জড়ো করা যায় এ বিষয়টি তাঁকে ভাবিয়ে তুলে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করেন। এ পর্যায়ে কেউ কেউ বললেন, সালাতের জামা'আত শুরু করার প্রারম্ভে প্রতীক হিসেবে একটি দীর্ঘ পতাকা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ বললেন, কোন উঁচু জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন ইয়াহূদীরা তাদের ইবাদতখানার যেমন শিঙা বাজায় সেরূপ আমরা শিঙা বাজিয়ে লোকদের জামা'আতে শরীর করতে পারি। কেউ কেউ খ্রিস্টানদের ঘন্টা বাজানোর অভিমত দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব অভিমত কোনটিকেই সন্তুষ্ট হলেন না। তারপর তিনি এ বিষয় চিন্তা-বিভোর থাকেন। তাঁর এ চিন্তিতভাবে সাহাবাদের ভাবিয়ে তুলে। তাঁদের মধ্যকার এক আনসার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আব্দ রাবিবহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চিন্তিত দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। সে রাতেই তিনি স্বপ্নযোগে আযান ও ইকামতের শব্দমালা লাভ করেন। (যার সবিস্তার বিবরণ পরবর্তী হাদীস থেকে জানা যাবে)। তিনি অতি প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে স্বপ্নের বিষয় তাঁকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ চাহেত তোমার স্বপ্ন যথার্থ এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়েছে। (একথার সত্যতা তিনি এজন্য মেনে নেন যে, সাহাবীর স্বপ্ন সংঘটিত বিষয় অবহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ওহী যোগে শব্দমালা অবহিত হয়েছিলেন, অথবা স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনার পর আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি করেন।) মোটকথা তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আব্দ রাব্বিহকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন হযরত বিলাল (রা) কে আযান ও ইকামতের শব্দমালা শিক্ষা দেন। উল্লেখ্য হযরত বিল্লাল (রা) উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য আযান দিতেন। এদিন থেকেই আযানের শুভ সূচনা ঘটে। আজ পর্যন্ত তা ইসলামের বিশেষ প্রতীকরূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এই ভূমিকা পাঠের পর আযান ও ইকামত সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

ইসলামে আযানের শুভ সূচনা

٣١- عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِبْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الاَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِىُّ ﷺ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ

حُضُوْرِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا رَأَوْهَا اذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ قَالَ وَذُكِرَلَهُ الْقِنَعُ يَعْنِى شَبُّوْرَ الْيَهُوْدِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ وَهُوَ مِنْ اَمْرِ الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ النَّصَارٰى فَانْصَرَفَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُرِىَ الاَذَانَ فِىْ مَنَامِهِ قَالَ فَغَدَا عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْضَانَ اِذْ اَتَانِىَ اٰتٍ فَاَرَانِىَ الاَذَانَ ...... فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلاَلُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ فَاَذَّنَ بِلاَل - رواه أبوداؤد

৩১. হযরত আনাস তনয় আবূ উমায়র সূত্রে তাঁর আনসার চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জামা'আতে সালাত আদায় কল্লে কিভাবে লোক জমা করা যায় যে বিষয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ বললেন সালাতের সময় পতাকা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। লোকেরা যখন তা দেখবে তখন অন্যদের সালাতের জামা'আতের কথা জানাবে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিমত পসন্দ করলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর কাছে ইয়াহূদীদের শিঙার (বিউগল) প্রস্তাব দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন, এ হচ্ছে ইয়াহূদীদের ব্যবহৃত একটি বস্তু। বর্ণনাকারী বলেন তারপর তাঁর নিকট খ্রিস্টানদের ঘন্টার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি বললেন, এতে খিস্টানদের ব্যবহৃত বস্তু (মোটকথা সে মজলিসে কোন সিদ্ধান্ত হল না)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভীষণ চিন্তিত দেখে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) ভীষণ চিন্তিত হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। তারপর স্বপ্নে তাঁকে আযানের শব্দাবলী জানানো হয়। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতি প্রত্যুষ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ সংবাদ অবহিত করে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি তখন নিদ্রা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। ইতোমধ্যে এক আগন্তুক এসে আমাকে আযানের শব্দমালা শিখিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বিলাল! উঠো এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ কী বলে তা শিখে নাও। বর্ণনাকারী বলেন বিলাল (রা) কার্যত নির্দেশ মান্য করেন এবং আযান দেন। (আবূ দাঊদ)

জ্ঞাতব্য ঃ আবূ দাঊদের বর্ণনায় এও আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) তাঁর স্বপ্নের বৃত্তান্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবহিত করার পূর্বেই হযরত উমর (রা) অনরূপ স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) প্রথমে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করার কারণে হযরত উমর (রা) তাঁর স্বপ্নের বিষয়টি বলতে সংকোচবোধ করেন। পরে উমর (রা) তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ বাকর (রা) সহ আরো কতিপয় সাহাবী একই স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়।

٣٢- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ قُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرِبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِيْ وَاَنَانَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِيْ يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ ؛ فَقُلْتُ نَدْعُوْبِهِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ - اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ - اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ، لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ -

قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّيْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ- حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةَ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ،لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ، فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَاَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْشَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَارَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَاِنَّ صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ

وَيُؤَذِّنَ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَالِكَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَائَهُ وَيَقُوْلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِيَ فَقَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -رواه أبوداؤد و الدارمى

৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (আমার পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে লোকদের একত্র করার উদ্দেশ্য ঘন্টা বানানোর নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে স্বপ্নে একব্যক্তি আমার নিকট একটি ঘন্টা হাতে নিয়ে উপস্থিত হলো। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! ঘন্টাটি কি বিক্রি করবে? সে জিজ্ঞেস করল, তুমি এর দ্বারা কি করবে? আমি বললাম, আমরা এর দ্বারা লোকদেরকে সালাতের জামা'আতে ডাকব। সে বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম বিষয় বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে মতে সে বলল, তুমি বল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, হায়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাস সালাহ্; হায়্যা আলাল ফালাহ্, হায়্যা আলাল ফালাহ্; আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ রা) বলেন, সে আমাকে আযানের শব্দমালা বলে খানিকটা পিছু হটে গেল এবং কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, এরপর যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন এভাবে ইকামত দিবে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আক্‌বার, আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাল ফালাহ্, ক্বাদ-কামাতিস্ সালাতু ক্বাদ-কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তারপর আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম এবং রাতে যা স্বপ্নে দেখেছি তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ চাহেত তোমার স্বপ্ন সত্য। তুমি যা স্বপ্নে দেখেছ তা বিলালকে শেখাও এবং বিলাল সেই শব্দযোগে যেন আযান দেয়। কেননা সে তোমার চেয়ে উচ্চকণ্ঠের অধিকারী। সুতরাং আমি বিলালের সাথে গেলাম এবং তাঁকে তা শেখালাম। ফলে সে আযান দিল। তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ) বলেন, উমর (রা) তাঁর ঘর থেকে আযান শুনে নিজ চাদর হেঁচড়াতে হেঁচাড়াতে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্তার শপথ

তাকে (আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ) যেরূপ স্বপ্ন দেখান হয়েছে তদ্রূপ আমিও স্বপ্নে দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সকল প্রশংসা ও স্তুতি আল্লাহ্র জন্য। (আবূ দাঊদ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের সম্পর্কে দু'টি কথা পরিষ্কার করা আবশ্যক। যথা (১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সালাতে লোকদের জড়ো করার জন্য ঘন্টা তৈরীর নির্দেশ দিয়েছেন। (২) পক্ষান্তরে আনাস তনয় আবূ উমায়র বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন ঘন্টার তৈরীর কথা বলা হয়, তখন তিনি বলেন, এতো খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বস্তু। অধমের (গ্রন্থকার) নিকট এর বিশুদ্ধ সমাধান এরূপ হতে পারে যে, সালাতে লোকদের জড়ো করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে যে সব বস্তু পেশ করা হয় তন্মধ্যে পতাকা, আগুন প্রজ্জলিতকরণ, ইয়াহূদীদের শিঙা ইত্যাদি বস্তু ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিষয় সরাসরি প্রত্যাখান করেন। তারপর তাঁর অনুমোদনের জন্য দ্বিতীয় কোন বস্তু পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ঘন্টা সম্পর্কে তিনি কেবল এতটুকু বলে ক্ষান্ত করেন যে, এতো খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বস্তু। কিন্তু একথা দ্বারা ঘন্টা অবৈধ হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়নি। বরং তাঁর ভাষণ দ্বারা সম্ভবত কোন সাহাবী বুঝে নিয়েছিলেন যে, অন্যান্য বস্তুর তুলনায় তিনি একে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা এও বুঝে নিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন্টা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমোদন দিয়েছেন এবং যতক্ষণ এর সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে না আসে ততক্ষণ এর উপর আমল করার অনুমোদন দিয়েছেন। (সম্ভবত এ কারণে কারো পক্ষ থেকে কোন বস্তু অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পেশ করা হয়নি) এ অধমের মতে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা) امر بالناقوس (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন্টার নির্দেশ দেন) বলেছেন। কখনো কখনো কোন বস্তুর অনুমোদন ও সম্মতি দানের ক্ষেত্রে امر(নির্দেশ) শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন-হাদীসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে দ্বিতীয় বিষয় হল এই যে, আযানে যে সব শব্দ দুই দুইবার বলা হয়েছে ইকামতে তা বলা হয়েছে একবার করে। হযরত আনাস (রা) সূত্রে পরে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, ইকামতে উক্ত শব্দসমূহ একবার করে বলারই নির্দেশ ছিল। কিন্তু অন্যান্য রিওয়ায়াত যা পরে বর্ণিত হবে। এর মধ্যে সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাও রয়েছে। আযানের মত ইকামতেও শব্দসমূহ দুই দুইবার বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীস বিশারদ নিজ প্রজ্ঞার

উপর ভিত্তি করে (ইকামতের শব্দ) এক একবার এবং অপর কিছু সংখ্যক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুই দুইবারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইকামতের ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। মতবিরোধ কেবল প্রাধান্য ফযীলাতের ক্ষেত্রে, অন্য ক্ষেত্রে নয়।

٣٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوْا اَنْ يُعْلِمُوْا وَقْتَ الصَّلٰوةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُوْنَهُ فَذَكَرُوْا اَنْ يُوْرُوْا نَارًا اَوْ يَضْرِبُوْانَاقُوْسًا فَاُمِرَ بِلَالُ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ - رواه البخارى ومسلم واللفظ له

৩৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালাত আদায়ের লক্ষ্যে আগত মুসল্লী সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন সাহাবা কিরাম পরিচিত জিনিসের মাধ্যমে সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়ার বিষয় আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে তারা আগুন জ্বালানো অথবা ঘন্টা বাজানোর কথা উল্লেখ করেন। তারপর বিলাল (রা) কে আযানের শব্দমালা দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দমালা একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দমালা মুসলিমের)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ (রা)-এর স্বপ্ন ও অপরাপর ঘটনাও বর্ণিত হয়নি। ঘটনা বর্ণনাকারী এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতে কোন আপত্তি আছে বলে মনে করছেন না। এ ধারণায় যে, আমাদের শ্রোতা সাধারণ হয়ত এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে অবহিত আছেন অথবা অন্য কোন কারণে পুরো ঘটনা বর্ণনা করা সংগত মনে করছেন না।

যেমন উপরে বর্ণিত হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে ইকামতের শব্দ একবার করে উল্লিখিত হয়েছে। তবে যে সকল সুধি ইকামতের শব্দ দু'বার করে বলেন, তাঁরা এই দুই হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, এ হল আযানের সূচনাকালের প্রারম্ভিক ঘটনা। দীর্ঘদিন এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। সাত-আট বছর পর হুনায়ন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মাহযূরাকে যে আযান ও ইকামতের তালকীন (প্রশিক্ষণ) দেন তাতে আযান ও ইকামতের শব্দমালা দু'বার করে ছিল, যা পরবর্তী দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হবে। এ জন্যই পরবর্তী হুকুমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অধম (গ্রন্থকার) হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর সর্বশেষ ফয়সালা পেশ করতে আগ্রহী। তাহল আযান ও ইকামতের শব্দমালার ব্যাপারে যে মতপার্থক্য তা মূলত কুরআন মজীদের বিভিন্ন কিরা'আতের মতপার্থক্যের মত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে পদ্ধতিই বর্ণিত হোক নিঃসন্দেহে তা বিশুদ্ধও প্রতিষ্ঠিত।[১]

আবূ মাহযূরা (রা) কে আযান শিক্ষাদান

٣٤- عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَلْقى عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرَ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ- اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ ثُمَّ تَعُوْدُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًارَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ- رواه مسلم

৩৪. হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমাকে আযান শিক্ষা দেন এবং বলেনঃ তুমি বল আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশাহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লালাহ্, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লালাহ্; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ তারঃপর তুমি পুনরায় বলঃ আশাহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা-ইলাহা আল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলূল্লাহ্, হায়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাস্ সালাহ্, হায়্যা আলাল ফালাহ্, হায়্যা আলাল ফালাহ্; আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লালাহ্ (মুসলিম)।

٣٥- عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً - رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى والدارمى وابن ماجة

---

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খ, পৃ-১৯১।

৩৫. হযরত আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উনিশ বাক্যে আযান শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন সতের বাক্যে। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারিমীও ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবূ মাহযূরা (রা) বর্ণিত এ রিওয়ায়েতে আযানের বাক্য উনিশটি বলে উল্লেখ রয়েছে। কারণ শাহাদাত সম্বলিত বাক্য অতিরিক্ত চার বার এসেছে। ইকামতে শাহাদাত সম্বলিত বাক্য অতিরিক্ত চার বার না আসায় এবং ক্বাদ কামতিস সালাহ্ দু'বার আসায় সতেরটি বাক্য হয়েছে। এই কম বেশির কারণে ইকামতের বাক্য সংখ্যা হয়েছে সতেরটি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীতে হুনায়ন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আবূ মাহযূরাকে আযান শিক্ষাদান সম্বলিত ঘটনা সংঘটিত হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে এঘটনার যে সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যায় তা খুবই হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর এবং ঈমানের জ্যোতি বর্ধনে সহায়ক। এজন্য তা উল্লেখ করা আমি সমীচীন মনে করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেন। মক্কা বিজয় কালীন সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত একদল লোক নিয়ে হুনায়নের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। আবূ মাহযূরা (রা) তখন একজন উদ্ধত যুবক। তখনো তিনি ইসলামে দীক্ষিত হননি। তিনি তাঁর সমবয়সী নয়জন বন্ধু নিয়ে হুনায়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়ন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সালাতের সময় হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'আয্যিন আযান দেন। কিন্তু আমরা সবাই আযানকে (বরং আযান সম্বলিত দীনকেও) ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতাম। আমি আমার সাথীদের নিয়ে ঠাট্টা উপহাস ছলে আযান দিচ্ছিলাম এবং আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'আয্যিনের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে আযান দিতে শুরু করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের শব্দ শুনে আমাদের ডেকে পাঠান। আমরা তাঁর সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কার কণ্ঠ স্বর ছিল সবচাইতে উচু ? আবূ মাহযূরা (রা) বলেন, আমার সাথীরা আমার দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানিয়ে দিল। আর তাদের একথা ছিল নির্ঘাত সত্য। তিনি আমি ছাড়া সবাইকে চলে যাবার অনুমতি দেন এবং আমাকে বলেন, হে আবূ মাহযূরা! তুমি আযান দাও। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন তখন আযানের উপর ছিল আমার এমন তীব্র ঘৃণা ও অপসন্দের ভাব যা অন্য কোন বস্তুর উপর ছিল না। আল্লাহ্র পানাহ। তাঁর প্রতিও ছিল আমার তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তবে আমি তখন একান্ত নিরুপায়। তাই বাধ্য হয়ে তাঁর হুকুম তামিল করে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের তাল্কীন (প্রশিক্ষণ) দেন এবং বলেন ঃ তুমি বল,

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার------ থেকে শেষ পর্যন্ত (যেমনটি পূর্ববর্তী হাদীসে হযরত আবূ মহযূরা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে)। আমি যখন আযান শেষ করলাম তখন তিনি আমাকে রূপা ভর্তি একটি থলে উপহার দেন এবং তাঁর মুবারক হাত আমার মাথার সম্মুখ ভাগে রাখেন। তারপর তাঁর মুবারক হাত আমার মুখমণ্ডল ও বুকের উপর রাখেন। এরপর তিনি তাঁর মুবারক হাত নাভি পর্যন্ত মুছে এই দু'আ পাঠ করেন بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ "আল্লাহ্ তোমার মধ্যে বরকাত দান করুন এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন।" তিনি তিনবার আমার জন্য এই দু'আ করেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এই দু'আ ও মুবারক হাতের স্পর্শে আমার অন্তর থেকে কুফ্র ও ঘৃণা চিরতরে দূর হয়ে যায় এবং তাতে ঈমান ও ভালবাসা স্থান লাভ করে। আমি তাঁর কাছে এই বলে আরয করলাম যে, আমাকে যেন মক্কা নগরীর মসজিদুল হারামের মু'আয্যিন নিয়োগ করা হয়। তিনি বললেন ঃ যাও আজ থেকে তুমি মসজিদুল হারামে আযান দিবে।

এ বিস্তারিত বিবরণ থেকে একথা খুব সহজেই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তাঁকে দিয়ে শাহাদাতাইন (আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্) দুই দুই বারের পরিবর্তে চারচার বার বলিয়েছিলেন। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, তখনো তাঁর অন্তরে ঈমানের জ্যোতি সৃষ্টি হয়নি বরং বাধ্য হয়ে নির্দেশ পালন করেন মাত্র। তিনি তাঁর তখনকার আকীদার পরিপন্থী আযান দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য আযানের বাক্য সমূহের মধ্যে তাঁর কাছে শাহাদাতাইন ছিল সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যখন তিনি তা একবার বলে তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দ্বিতীয় বারের মত উচ্চকণ্ঠে বলার নির্দেশ দেন। অধমের ধারণা, তিনি তাঁর যবান থেকে শাহাদাতের বাক্য উচ্চারণ করানোর ব্যাপারে অটল ছিলেন এবং আল্লাহ্ যাতে উক্ত বাক্য তাঁর অন্তরে দৃঢ়মূল করে দেন, সেজন্য সর্বতোভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে তাওয়াজ্জুহ করেন। মোটকথা খুব সম্ভব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মাহযূরা (রা)-এর সে সময়কার বিশেষ মানসিক অবস্থার কারণে শাহাদাতের বাক্য, বার বার পাঠ করান। নতুবা কোন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত দ্বারা একথা জানা যায় না যে, তিনি তাঁর মু'আয্যিন বিলাল (রা) কে শাহাদাতের বাক্য চার বার বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা)-এর বিশুদ্ধ বর্ণনায় ও কেবল দু'বার করে শাহাদাতের কথা জানা যায়। তবে এ কাথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, আবূ মাহযূরা (রা) মাসজিদুল হারামে সর্বদা এরূপ আযান দিতেন। অর্থাৎ শাহাদাতের বাক্যসমূহ চার বার করে পাঠ করতেন। হাদীস বিশারদদের

পরিভাষায় এই প্রক্রিয়াকে 'তারজী' বলে। তবে তার এ তারজী করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যেরূপ আযানের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং যার বদৌলতে তাঁর দীন নসীব হয়েছিল সেজন্য গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তিনি 'তারজী" করতেন। অন্যথায় তিনি হযরত বিলাল (রা)-এর আযান সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। ঘটনার ধারাবাহিকতায় এও পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুবারক হাত দ্বারা আবূ মাহযূরা (রা) সম্মুখ ভাগের যে চুলগুচ্ছ স্পর্শ করেন তা তিনি কখনো কাটতেন না, তবে এই অধমের মতে, এও যেমন তাঁর অপূর্ব প্রীতির লক্ষণ, তেমনি আযানে তারজীও ছিল অনুরূপ ব্যাপার। তাই তিনি সর্বদা তারজী সহকারে আযান দিতেন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। কিন্তু তথাপিও তিনি কখনো নিষেধ করেননি। তাই এ প্রক্রিয়া জায়িয হওেয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের আবকাশ নেই। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রা) এ বিষয়ে যে সমাধান দিয়েছেন তা মূলতঃ এরূপ যে, আযান ও ইকামতের শব্দমালার পার্থক্য মূলত আল কুরআনের বিভিন্ন কিরা'আতের পার্থক্যের অনুরূপ।

আযান ও ইকামতে দীনের মৌলিক শিক্ষাও দাওয়াত নিহিত

যদিও বাহ্যত আযান ও ইকামত সালাতের সময়ে নির্দেশ করে তথাপি একথা লক্ষণীয় যে আযান ও ইকামতের হাকীকতের যে আল্লাহ্ তা'আলা আযান ও ইকামতে বিশেষ অর্থবোধক শব্দের সমাহার ঘটিয়েছেন যা মূলতঃ দীনের প্রাণ। বরং বলা চলে, তিনি দীনের পূর্ণ বুনিয়াদী শিক্ষা ও দাওয়াত এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। দীনের মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী । এ পর্যায়ে যে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ধবনি দিয়ে লোকদের সালাতের দিকে আহবান করা হয় এব চাইতে উত্তম বাক্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এটাই হচ্ছে একত্ববাদের মূলকথা এবং এত রয়েছে আল্লাহ্র গুণবাচক নামের সমাহার। কোননা 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, এর মধ্যে যে প্রভাবময়ী শব্দগুচ্ছ রয়েছে, সংক্ষেপে এর চেয়ে চমৎকার শব্দগুচ্ছ নির্বাচন করা সত্যিই অসম্ভব। একথার মূলে রয়েছে এ স্বীকারোক্তি যে আল্লাহ্ আমাদের ইলাহ্ ও উপাস্য। এর সাথে সাথে এ প্রশ্ন জাগে যে, তাঁর দাসত্বের বিশুদ্ধ পদ্ধতি কিভাবে শেখা যাবে? এর উত্তরে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" এর চেয়ে উত্তম ও যুক্ত বাক্য আর হতে পারে না। এর পর 'হায়্যা আলাস সালাত'। বলে সালাতের দাওয়াত দেওয়া হয়। আর এ ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এর পর 'হায়্যা আলাল ফালাহ্' বলে মূলত এই ঘোষণাই দেওয়া হয় যে, এই ইবাদতই

মানুষ কে কল্যাণ, মুক্তি ও সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এপথ ছেড়ে অন্য পথে বিচরণ করে সে মূলত সফলতা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। মনে করা যেতে পারে যে, এযেন আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের একটি, অনন্য ঘোষণা। এ আহবান এমন শব্দ যোগে করা হয় যা কেবল বিশ্বাসের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয় বরং জীবনের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবেও গণ্য। পরিশেষে আল্লাহু আকবার; আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা এই ঘোষণাই দেওয়া হয় যে, সর্বাবিধ বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তিনি অংশীদার মুক্ত এবং শাশ্বত সত্য সত্তা। সুতরাং তাঁর সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্যও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আযান ও ইকামাতে দীনের মৌলিক বিষয়ে যে বিশেষ অর্থবোধক বাক্যসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রভাবময়ী দাওয়াত বিঘোষিত হয়েছে তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। বলাবাহুল্য আমাদের মসজিদসমূহ থেকে দৈনিক পাঁচবার এহেন দীনী দাওয়াত উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়।

কাজেই প্রত্যেক মুসলমান যদি তার শিশু সন্তানদের আযান তথা আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্' এর মর্ম সবিস্তার বুঝিয়ে দেয় তাহলে আশা করা যায় যে, তারা পারিপার্শ্বিক অনৈসলামিক দাওয়াতের শিকারে পরিণত হবে না।

আযান ও ইকামত সম্পর্কীয় কতিপয় নির্দেশ

٣٦- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدَرْ وَجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرَغُ الاكِلُ مِنْ اَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوا حَتّٰى تَرَوْنِىْ- رواه الترمذى

৩৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা) কে বললেন ঃ হে বিলাল! যখন তুমি আযন দেবে , ধীরস্থিরভাবে ও দীর্ঘস্বরে আযান দেবে এবং যখন ইকামত দেবে তাড়াতাড়ি ও অনুচ্চস্বরে ইকামত দেবে, তোমার আযান ও ইকামতের মাঝখানে এতটুকু সময় অবকাশ দেবে যাতে আহার গ্রহণকারী তার আহার থেকে, পানকারী তার পান থেকে এবং যার পায়খানা পেশাবের প্রয়োজন সে যেন তা সেরে নিতে পারে। আর তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত সালাতে দাঁড়াবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে আযান ও ইকামত সম্পর্কীয় বিষয় যে সব নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে হাদীসের সর্বশেষ অংশ 'তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত সালাতে দাঁড়াবে না'। ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজ্‌রা থেকে বেরিয়ে শিগ্‌গির মসজিদে তাশরীফ আনবেন এ অনুমানের বশবর্তী হয়ে সাহাবা কিরাম কখনো কখনো সালাতের জন্য দাঁড়ায়ে থাকতেন। তিনি তাঁদের এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমি যতক্ষণ মসজিদে না আসব এবং তোমরা আমাকে না দেখবে ততক্ষণ তোমরা সালাতের জন্য দাড়াবে না। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ সুস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদে তাশরীফ আনয়নের পূর্বে সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা অনর্থক কষ্টের ব্যাপার। কেননা কখনো কোন কারণে তাঁর আগমনে বিলম্বও হতে পারে। তা ছাড়া তাঁর বিনয়ী স্বভাব তাঁকে পীড়া দিত যে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ তাঁর জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

٣٧- عَنْ سَعْدٍ مُوَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ قَالَ اِنَّهُ اَرْفَعَ لِصَوْتِكَ - رواه ابن ماجه

৩৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (কু'বা মসজিদের) মু'আয্‌যিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা) কে তাঁর দুই আঙ্গুল দুই কানের মধ্যে ঢুকাতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, এ পদ্ধতি তোমার কণ্ঠস্বর উচ্চ করবে। (ইব্‌ন মাজাহ)

٣٨- عَنْ زِيَادِبْنِ الْحَارِثِ الصُّدَاىْ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَذِّنَ فِىْ صَلٰوةٍ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتَ فَاَرَادَ بِلاَلُ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ - رواه الترمذى آبوداؤد وابن ماجة

৩৮. হযরত যিয়াদ ইব্‌ন হারিস সুদায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের সালাতের আযান দিতে বললেন। সে মতে আমি আযান দিলাম। বিলাল (রা) একামত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সুদায়ী আযান দিয়েছে। কাজেই যে আযান দেবে, ইকামতও সেই দেবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ)

٣٩- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ الْعَاصِ قَالَ اِنَّ مِنْ اخِرِ مَاعَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ اتَّخَذُ مُؤَذِّنًا لاَ يَاْخُذُ عَلَى اَذَانِهِ اَجْرًا - رواه الترمذى

৩৯. হযরত উসমান ইব্‌ন আবুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ থেকে সর্বশেষ যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তা ছিল এই আমি এমন একজন মু'আয্‌যিন রাখব যে আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যাঁদের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও অন্তর্ভুক্ত বলেন, আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়িয নয়। অন্যান্য আলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এই বাণীকে তাক্‌ওয়া ও আযীমাতের বিষয় বলে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী হানাফী আলিমগণের অনেকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় সমর্থন করেছেন। তবে আযান ও ইকামাত যেহেতু দীনের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কাজ, তাই এর দাবি হচ্ছে, কাজ দু'টি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা চাই। পারিশ্রমিক নিতে বাধ্য হলে তা অন্যান্য দায়িত্বের বিনিময়ে গ্রহণ করা উচিত এবং কাজে যোগদানের পূর্বেই সে বিষয় মীমাংসা করে নেয়া চাই।

٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ -رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى والشافعى

৪০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ইমাম হলো যামিন এবং মু'আয্‌যিন হলো আমানতদার। হে আল্লাহ্! ইমামদের সৎপথ দেখাও এবং মু'আযযিনদের ক্ষমা কর। (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও শাফিয়ী)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তার নিজের সালাত ব্যতীত মুক্তাদীদের সালাতেরও যিম্মাদার। সুতরাং সাধ্যমত বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ সর্বদিক সুসামঞ্জস্য করে সালাতের ইমামতি করার চেষ্টা করা উচিত। মু'আয্‌যিনের আযানের উপর লোকেরা সাধারণত ভরসা করে থাকে। সুতরাং কঠোরভাবে নিজ প্রবৃত্তি দমন ও নিজকে বিশুদ্ধ চিত্ত করে যথাসময়ে আযান দেওয়া চাই। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম ও মু'আযযিনের যিম্মাদারীর ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে দু'আ করেছেন।

٤١- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِّىْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَ اَقِيْمَا وَالْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا - رواه البخارى

৪১. হযরত মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন ঃ যখন তোমরা উভয়ে সফর করবে তখন আযান দিবে ও ইকামত বলবে। তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে তোমাদের সালাতের ইমামতি করবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ সহীহ্ বুখারীর অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা) নিজ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে যান এবং তাঁর সাহচর্য-ধন্য হওয়ার আশায় দীর্ঘ বিশদিন অবস্থান করেন। এ হাদীসে যে কথা বলা হয়েছে তা মূলত তাদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময়ের ঘটনা। এ পর্যায়ে তিনি তাদেরকে দু'টি বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন।

১. সফরে থাকাকালে আযান ও ইকামত দিবে। ২. তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন সালাতের ইমামতি করে। সম্ভবত ইল্মে দীন এর ক্ষেত্রে তাঁর সাথীগণ একই মানের ছিলেন, কারো উপর কারো বিশেষ মর্যাদা কিংবা মাহাত্ম্য ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্য বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন সালাতের ইমামতি করে। বলাবাহুল্য, ইমামতির ক্ষেত্রে এটাই নীতি।

আযান এবং মু'আয্যিনের মর্যাদা

٤٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ –

رواه البخارى

৪২. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন জিন, কিংবা অন্য কোন বস্তু মু'আযযিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশ্বের সমগ্র বস্তুতে তাঁর মা'রিফাত ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্র বাণী وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ "এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে না।" (১৭, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

কাজেই মু'আয্যিন যখন আযান দেয় এবং তাতে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য, একত্ব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত এবং দীনের দাওয়াত প্রকাশ পায় তখন

জিন্-ইনসান ব্যতীত অপরাপর সৃষ্টি ও তা শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে। এসব বস্তু কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আযান দানে এবং মু'আয্যিনের রয়েছে ঈর্ষণীয় মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

" এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" (৮৩, সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ২৬)

٤٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ — رواه مسلم

৪৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ শয়তান যখন সালাতের আযান শুনে তখন (মদীনা থেকে) রাওহা নামক স্থানে চলে যায়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলে এমন অনেক সৃষ্টি রয়েছে যার একটি অপরটির জন্য অসহনীয় ও প্রতিপক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে– অন্ধকারের কাজে সূর্য অসহ্য। কাজেই সূর্যের আলো ভেসে উঠে তখন সাথে সাথে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে শীতের কাছে গরমের খরতাপ অসহনীয়। কারণ যেখানে আগুন জ্বালান হয় সেখান থেকে শীত বিদায় নেয়। ঠিক তদ্রূপ হয় আযান শুনার পর শয়তানের অবস্থা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীর মর্ম এটাই। কারণ শয়তান যখনই আযানের শব্দ শুনতে পায় তখন আলায়ে মদীনা থেকে পালিয়ে রাওহা নামক স্থানে চলে যায়। হযরত জাবির (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনাকারী তালহা ইব্ন নাফি সূত্রে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মদীনা থেকে রাওহার দূরত্ব হল ছত্রিশ মাইল। আযানে তাওহীদ ও ঈমানের সূর ধ্বনিত হয় এবং আযান শুনে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা মসজিদে আসে- এই হচ্ছে আযানের মূল প্রাণশক্তি। পক্ষান্তরে অভিশপ্ত শয়তানের জন্য বোমার আঘাতস্বরূপ। মু'আয্যিন যখন আযান শুরু করে তখন শয়তান ঐভাবে পালিয়ে যায় যেভাবে আলোর উপস্থিতিতে অন্ধকার পালায়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٤٤- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - رواه مسلم

৪৪. হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মু'আয্যিনদের ঘাড় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত اطول الناس اعناقا এর শাব্দিক অনুবাদ হলো– "দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট হবে।" কিন্তু ভাষ্যকারগণ এর একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই অধমের নিকট এর দ্বারা মু'আয্যিনের মাথা উঁচু করা ও মর্যাদা বৃদ্ধি বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন অপরাপর লোকদের তুলনায় তার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হবে। পরবর্তী হাদীসে কিয়ামতের দিন তারা মিশ্‌কের স্তুপের উপর অবস্থান করবে।

٤٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَبْدٌ اَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلاَهُ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلٰوةِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

رواه الترمذيا

৪৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মিশ্‌কের স্তুপের উপর অবস্থান করবে। তারা হল ঃ ১. ক্রীতদাস যে আল্লাহ্ এবং তার মনিবের হক আদায় করে। ২. যে ব্যক্তি কোন কাওমের ইমামতি করে আর তারা (তার নেকআমল ও সদাচারের জন্য) তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং ৩. যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযান দেয়। (তিরমিযী)

٤٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ – رواه الترمذى وأبوداؤد وابن ماجة

৪৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একাধারে সাত বছর আযান দেবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্ধারিত রয়েছে যে জাহান্নাম তাকে স্পর্শও করতে পারবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ)

٤٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ وَالْمُلَبِّيْنَ يَخْرُجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَيُلَبِّى الْمُلَبِّىُّ — رواه الطبرانى فى الاوسط

৪৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'আয্যিনগণ এবং তালবিয়া[১] পাঠকগণ তাদের কবর থেকে যথাক্রমে মু'আয্যিন আযানদানরত অবস্থায় এবং তালাবীয়া পাঠক তালবীয়া পাঠরত অবস্থায় করব থেকে (কিয়ামতের মাঠের দিকে) বেরিয়ে আসবে। (তাবারাণী মু'জাম আওসাত গ্রন্থ)

ব্যাখ্যা ঃ আযান এবং মু'আযযিনের যে অসাধারণ সাওয়াব এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার রহস্য হচ্ছে এই যে, আযান ঈমান ও ইসলামের প্রতীক এবং দীনের প্রভাবময়ী বিশিষ্ট অর্থবোধক দাওয়াত। মু'আয্যিন এই আহবানকারী। মনে করা যেতে পারে, সে আল্লাহ্ নির্বাচিত আহবায়ক। আফসোস! আজ আমরা মুসলিম জনগোষ্ঠি আযানের এই গূঢ় রহস্য ভুলে গেছি এবং আযান দেওয়া একটি তুচ্ছ পেশায় পরিণত হয়েছে। আলাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এই ভয়াবহ সামাজিক পাপ থেকে রক্ষা করুন এবং তাওবা ও সংশোধনের তাওফীক দিন।

٤٨- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ ثُمَّ قَالَ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ — رواه مسلم

৪৮. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'আয্যিন যখন আল্লাহু আকবার বলে, তখন তোমাদের কেউ যদি (তার জবাবে) আল্লাহু আকবার বলে, তারপর মু'আয্যিন যখন আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে তখন সেও যদি বলে আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ; তারপর মু'আয্যিন যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলে, তখন যদি সেও বলে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, পরে মু'আয্যিন যখন 'হায়্যা

---

১. তালাবিয়া হচ্ছে হজ্জ ও উমরাকারী বিশেষ দু'আ আর তা হচ্ছে

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك

আলাস সালাহ' বলে, তখন সেও যদি 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলে; এরপর মু'আয্যিন যখন 'হায়্যা আলাল ফালাহ্' বলে, তখন সেও যদি 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলে, এরপর মু'আয্যিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, তখন সেও যদি (জবাবে) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে, তারপর মু'আয্যিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, তখন সে ও যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে– এসবই যদি সে আন্তরিকতার সাথে বলে থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ইতোপূর্বে পাঠকগণ জানতে পেরেছেন যে, আযানের দু'টি বিশিষ্ট দিক রয়েছে ১, জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের ঘোষণা দেওয়া এবং ২, ঈমান ও দীনের দাওয়াত। প্রথমটি তথা আযান শুনার পর প্রত্যেক মুসলমানের জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদের উদ্দেশ্য রওনা করা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আযানের ধ্বনি শুনার সাথে সাথে এর প্রতিশব্দের ঈমানী দাওয়াতে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য এবং মুখে ও অন্তরে তার প্রত্যয় ঘোষণা করা চাই। অনুরূপভাবে প্রত্যেক আযানের সময় ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়া চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের জবাবে দানের এবং দু'আয় কালিমা শাহাদাত পাঠের যে নির্দেশ দিয়েছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন এটাই তার রহস্য। এর দ্বারা একথাও পরিষ্কার বুঝা যায়, যে, আযানের মৌখিক জবাব আপাতদৃষ্টিতে একটি সাধারণ আমল মনে হলেও এর উপর ভিত্তি করে জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দানের রহস্য কী?

٤٩– عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِىْ وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَّبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ – رواه مسلم

৪৯. হযরত সা'দ ইবন্ আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মু'আয্যিনের আযান শুনে "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদিতু বিল্লাহি রাববাওঁ ওয়া বি মুহাম্মাদির রাসূলাঁও ওয়া বিল ইসলামি দিনা" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট"–এই দু'আ পাঠ করবে তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সৎকাজ করার ফলে যে পাপ বিমোচিত হয় সে বিষয় উযূর ফযীলাত অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে স্মরণ রাখা উচিত।

٥٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -- رواه البخارى

৫০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে, হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমিই প্রভূ। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দান কর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানিত স্থান এবং তাঁকে তোমার প্রতিশ্রুত প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর"– কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তিনটি দু'আর বিষয় উল্লেখিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর উল্লিখিত তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দান করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে সে নির্ঘাত কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফা'আত লাভ করবে। তিনটি বিষয় হলো– (১) ওয়াসীলা (২) ফাযীলাহ এবং (৩) মাকামে মাহমূদ। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে ওয়াসীলার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছ। ওয়াসীলা হলো, আল্লাহ্র প্রেমের এক বিশেষ মাকাম ও মর্যাদার স্থান এবং জান্নাতের একটি অনন্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। আর তা কেবল তাঁর একজন বান্দারই ভাগ্যে জুটবে। ফাযীলাহ্ ও একটি বিশেষ মাকাম। মাকামে মাহমূদ হচ্ছে এমন সম্মানজনক মাকাম যিনি এতে ধন্য হবেন, তিনি হবেন একজন প্রশংসিত ও সম্মানিত ব্যক্তি এবং সবাই তাঁর গুণ-কীর্তনে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সততঃ মশগূল থাকবে।

এ পর্যায়ে মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডে শাফা'আতের বর্ণনায় সবিস্তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। সে হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন হবে এমনই একটি দিন যাতে আল্লাহ্ তাঁর মাহাত্ম্য ও শক্তিমত্তা নিয়ে প্রকাশিত করেন এবং বিশ্ব মানবতা নিজ নিজ আমল বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে অস্থির থাকবে, এমনকি হযরত নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আ) প্রমুখ নবী-রাসূলগণও তখন কোন বিষয়ে আরযি পেশ করার সাহস পাবেন না। নবীগণের দলপতি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলবেন ঃ হে মহান বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক! আমি এর জন্য প্রস্তুত, বলে গোটা মানব জাতির জন্য হিসাবও শাফা'আতের লক্ষ্যে এগিয়ে আসবেন। তিনি

পাপীদের সুপারিশ করার এবং জাহান্নামীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানানোর ক্ষেত্রে হবে পথিকৃৎ। তিনি নিজেই ইরশাদ করেন ঃ “আমিই হব সর্বপ্রথম শাফা‘আতকারী এবং আমার শাফা‘আতই সর্বাগ্রে গ্রহণ করা হবে।” তিনি আরো বলেছেন ঃ “কিয়ামতের দিন আমি হব প্রশংসার পতাকাবাহী। আদম (আ) থেকে শুরু করে সবাই আমার পতাকা (লেওয়াহে হামদের) নিচে সমবেত হবে, কিন্তু এতে আমার বিন্দুমাত্র গর্ব নেই।”

বলাবাহুল্য, এ-ই হচ্ছে মাকামে মাহমূদ যে বিষয় কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

“আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।” (১৭, সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

হাদীসে এই একান্ত বিশেষ মর্যাদাকে ওয়াসীলা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে যাকে ওয়াসীলা ও ফাযীলাহ্ বলা হয়েছে, তাই কুরআন মজীদেও এই হাদীসে ‘মাকামে মাহমূদ’ বলা হয়েছে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্যাদায় ভূষিত হবেন এবং এ জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর মুবারক নাম তালিকাভুক্ত করে রেখেছেন। তবে তাঁর এই মর্যাদার পাশাপাশি হাদীসের ব্যাখ্যায় আমাদেরকে তার জন্য এই মর্যাদা দানের দু‘আ করতে বলা হয়েছে যেন আল্লাহ্ তাঁকে এই মহান মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য এই দু‘আ করবে তার জন্য আমার শাফা‘আত নির্ধারিত।

জ্ঞাতব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীসের মর্মানুযায়ী আমল করার নিয়ম হচ্ছে এই যে, হযরত উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে যেরূপ উদ্ধৃত হয়েছে তদ্রুপ মু'আয্যিনের আযান দেওয়ার সাথে সাথে অনুরূপ বাক্য মুখে উচ্চারণ করা। এরপর হযরত সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসের আলোকে “আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা। এরপর আল্লাহ্র কাছে নিম্নবর্ণিত দু'আ করা

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ......

হাফিয ইব্ন হাজার (র) “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় এই দু'আর শেষ অংশে اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করে না অঙ্গীকার) রয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে উপরে বর্ণিত কাজসমূহের মর্ম উপলব্ধি করে কাজে পরিণত করার তাওফীক দিন।

মসজিদ

মসজিদের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব, আদব ও হক

সালাতের সাথে যে সব বাক্য উদ্দেশ্য জড়িত সে বিষয়ে ইতোপূর্বে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র)-এর বরাত আমি কিন্তু ইঙ্গিত করেছি। এগুলো পূর্ণভাবে অর্জনের জন্য একত্রে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা জরুরী। ইসলামী শরী'আতে এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মসজিদ নির্মাণ ও জামা'আতের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। চিন্তাশীল মানুষ একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, এই উম্মাতের ধর্মীয় জীবনের এবং শৃঙ্খলা ও সুবিন্যস্ত জীবন বিনির্মাণে মসজিদ এবং জামা'আতের গুরুত্ব কতখানি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং জামা'আত বর্জনের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। (আলোচনা একটু আসছে) অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং কা'বা ঘরের পরেই এমনকি কা'বার সাথে সম্পর্কিত করে মসজিদকে আল্লাহ্র ঘর এবং উম্মাতের দীনী মিলনকেন্দ্র ঘোষণা করেছেন। তারপর তিনি এর বরকত, মাহাত্ম্য ও পসন্দনীয় দিক ঘোষণা করে উম্মাতকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করেছেন। যাতে সর্বক্ষণ তাদের অন্তর মসজিদের সাথে সম্পর্কিত থাকে। এবং মসজিদের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর সাথে তিনি মসজিদের হকসমূহ ও পালনীয় রীতিনীতির ব্যাপারে দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠ করা যাক ঃ

٥١– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا —— رواه مسلم

৫১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় স্থান হলো মসজিদ এবং সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয় স্থান হলো বাজার। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মানব জীবনের দু'টি ধারা রয়েছে। একটি হলো আধ্যাত্মিক এবং অপরটি বৈষয়িক ও পাশবিক। আধ্যাত্মিক অনিবার্য দাবি হলো, আল্লাহ্র

ইবাদাত, যিক্‌র-আযকার ও অপরাপর সৎকাজে মশগুল থাকা। এভাবে এ ধারার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত লাভ করে এবং তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। উল্লেখ্য এ সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়ার শ্রেষ্ঠতম স্থান হলো মসজিদ। কেননা ইবাদত ও যিক্‌র-আযকারের জন্যই মূলত মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে বায়তুল্লাহ্‌র সাথে রয়েছে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এজন্যই মানুষের আবাস গৃহের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় স্থান হলো মসজিদ। পক্ষান্তরে হাট-বাজার মানুষের বৈষয়িক ও পাশবিক প্রবৃত্তির দাবি পূরণের কেন্দ্ররূপে বিবেচিত। আর মানুষ সেখানে প্রবেশ করে আল্লাহ্ সম্পর্কে বে-খবর হয়ে পড়ে। এর ফলে তার অন্তরে পাপাচারের ময়লার স্তূপ জমে যায়। এজন্যেই বাজার আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মানুষের আবাসগৃহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান বলে বিবেচিত।

তবে হাদীসের মূল দাবি হচ্ছে এই যে, মু'মিন লোকদের উচিত বেশির ভাগ সময় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং তা মিলন কেন্দ্রে পরিণত করা এবং একান্ত বিশেষ প্রয়োজনে বাজারে যাওয়া। তবে বাজারের কলুষিত পরিবেশের সাথে যাতে অন্তর বদ্ধমূল হয়ে না পড়ে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, প্রতারণা করা, খিয়ানত করা ইত্যাদি কাজ থেকে নিজকে হিফাযত রাখা একান্ত কর্তব্য। এ সকল বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই কেবল হাট-বাজারের সাথে সম্পর্ক রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য এহেন সদাচারী ও সত্যপন্থী ব্যবসায়ীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন। বাজারকে পায়খানার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেননা পায়খানা অপসন্দনীয় ও রুচি পরিপন্থী স্থান তবুও যেমন প্রয়োজনে সেখানে যেতে হয়, বাজারের বিষয়টিও তদ্রূপ। বরং মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কাজ যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল প্রদর্শিত নির্দেশ মুতাবিক সম্পন্ন করে, তবে সেজন্য রয়েছে বিরাট সাওয়াব ও প্রতিদান।

٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ، اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ -- رواه البخارى ومسلم

৫২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেদিন আল্লাহ্ প্রদত্ত ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন–

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,
২. সেই যুবক যার জীবন শিশুকাল থেকে গড়ে ওঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদাতের মাঝে এবং যৌবনেও বিপথগামী হয়নি,
৩. সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লটকে আছে,
৪. সেই দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসে, একত্র হয় আল্লাহ্র জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্র জন্য,
৫. সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্র যিক্র করে, ফলে তার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়,
৬. সেই ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী অভিজাত রমনী অবৈধ কাজের প্রতি আহ্বান জানায়, কিন্তু সে তা একথা বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি,
৭. সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত খরচ করে অথচ বাম হাত জানে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের তৃতীয় নম্বরে বলা হয়েছে যে, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লটকে থাকে কিয়ামতের দিন রহমতের ছায়াযুক্ত স্থানের সুসংবাদ দান করা হয়েছে। মু'মিন লোকের অবস্থা এরূপ হওয়া একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা উপরে বর্ণিত সাত শ্রেণীর মধ্যকার যে কোন শ্রেণীর মধ্যে আমাদের শামিল করুন।

٥٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ عَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ– رواه البخارى ومسلم

৫৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য ততবার মেহমানদারীর আয়োজন করে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, কোন লোক সকাল কিংবা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায় আল্লাহ্ তা'আলা তার এই মেহমানের প্রতি ততবার বিশেষ খেয়াল

রাখেন এবং তার প্রতি উপস্থিতির জন্য জান্নাতে আপ্যায়নের বস্তু বিশেষভাবে প্রস্তুত করে থাকেন। বান্দা জান্নাতে পৌঁছার পর তা সামনে উপস্থিত পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে উক্ত অতিথিদের যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এ পৃথিবীতে তার কল্পণাও করা যায় না। এ বিষয়ে কানযুল উম্মালে তারিখে হাকিমের বরাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নিম্নবর্ণিত শব্দযোগে বিধৃত হয়েছে ঃ

اَلْمَسَاجِدُ بُيُوْتُ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ زُوَّارُ اللّٰهِ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ اَنْ يُّكْرِمُ زَائِرَهُ

"মসজিদসমূহ আল্লাহ্র ঘর। এতে আগমণকারী মু'মিনগণ আল্লাহ্র মেহমান। সুতরাং যার সাক্ষাতে কেউ আসে তার উচিত আগন্তুকের হক আদায় করা এবং যথাযথভাবে তার আপ্যায়ন করা।" (কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪)

কানযুল উম্মলে তারীখে হাকিম সূত্রে উপরে যে রিওয়ায়া ৩টি বর্ণিত হয়েছে তা হাদীস বিশারদগণের নিকট যাঈফ (দুর্বল) রূপে বিবেচিত। কানযুল উম্মালের গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয় পরিষ্কার আলোচনা করেছেন। তার উক্ত রিওয়ায়াত ৩টি হযরত আবূ হুরায়র (রা.) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের পূর্বোল্লিখিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় হাদীসটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেছি।[১]

٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسَةً وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَالِكَ اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رُفِعَتْ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً فَاِذَا صَلَّى عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ - رواه البخارى

৫৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায়ের সাওয়াব তার নিজের ঘরে কিংবা বাজারে আদায়কৃত সালাতের সাওয়াব থেকে পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উযূ করেন, তারপর একমাত্র

১. কানযুল উম্মালে একই বিষয়ের উপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে মু'জামুত তাবারানী বরাতে অন্য একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি করে মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি পাপ ক্ষমা করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে, ফিরিশ্তাগণ তার জন্য জন্য এই বলে দু'আ করেন–"হে আল্লাহ্! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর এবং তার প্রতি দয়া কর।" তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতরত বলে গণ্য হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নিজ বাড়ীতে কিংবা বাজারে সালাত আদায়ের চাইতে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ে পঁচিশ গুণ সাওয়াব রয়েছে এবং মসজিদের দিকে প্রতি পদক্ষেপে একটি করে সাওয়াব দান এবং একটি করে পাপমোচন করা হয়। এ কতই না মূল্যবান অথচ কত সস্তা সম্পদ। এতদ্ব্যতীত রয়েছে ফিরিশতাকুলের দু'আ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

"হে আল্লাহ্! তুমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ কর এবং তার প্রতি দয়া কর।" এই রিওয়ায়াতের শেষাংশে নিম্নোক্ত ও বর্ণিত হয়েছে–

" مَالَمْ يُوْذِنِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ

"সালাত আদায়ের পর মসজিদে প্রতীক্ষাকারী মুসল্লীর জন্য ফিরিশ্তাগণ দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় কিংবা উযূ ভঙ্গ না করে।"

৫৫– عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ اَئْذَنَ لَنَا فِى التَّرَهُّبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تُرَهُّبَ اُمَّتِىْ الْجُلُوْسُ فِى الْمَسْجِدِ انْتِظَارَ الصَّلٰوةِ – رواه فى شرح السنة

৫৫. হযরত উসমান ইব্ন মাযঊন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে বৈরাগ্য অবলম্বনের অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মাতের বৈরাগ্য হচ্ছে সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা। (শারহুস্ সুন্নাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন সাহাবীর মধ্যে দুনিয়া ত্যাগের ও বৈরাগ্যের জীবন অবলম্বনের অনুভূতি জেগেছিল। এই হাদীসে তাঁদের সেই প্রশ্নই স্থান পেয়েছে। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উসমান ইব্ন মাযউন (রা) ছিলেন ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। একদা তিনি এমনই কিছু বিষয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পেশ করেন। তার বক্তব্যের শেষ কথা ছিল এই যে, আমি আপনার কাছে বৈরাগ্যের জীবন যাপনের অনুমতি প্রার্থনা করছি। কাজেই আপনি

অনুমতি দিন যাতে আমি দুনিয়া ত্যাগী হতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পর্যায়ে যে উত্তর দেন তার মর্ম হল এই যে, যে আধ্যাত্মিক এবং পারলৌকিক উদ্দেশ্যে হাসিলের পূর্ববর্তী উম্মাতের জন্য বৈরাগ্য ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার উম্মাতের মসজিদে সালাতের জন্য প্রতীক্ষাকারীকে তা দান করবেন এবং এ-ই হচ্ছে আমার উম্মাতের বৈরাগ্য। প্রকৃতপক্ষে, সালাতের জন্য মসজিদে প্রতীক্ষা করা এক ধরনের ইতি'কাফ। আফসোস, আমরা যদি এর মূল্য অনুধাবন করতাম!

٥٦- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيمَةِ - رواه الترمذى وأبو داؤد

৫৬. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা অন্ধকারে মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতি প্রাপ্তির সুসংবাদ দাও। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাতের ঘোর অন্ধকার উপেক্ষা করে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য মসজিদে গমন করা নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য কাজ এবং আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্কের অকাট্য দলীল। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের যবানীতে সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার এহেন কাজের পুরস্কার স্বরূপ কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতি দান করবেন। "فَبُشْرى لَهُمْ وَطُوْبى لَهُمْ" "তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এবং সন্তোষ।"

মসজিদে প্রবশের ও বের হওয়ার দু'আ

٥٧- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - رواه مسلم

৫৭. হযরত আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বলে - "اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ" "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার করুণার দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও।"

আর যখন বের হয় তখন যেন বলে " اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " "হে আল্লাহ্! আমি তোমার ফযল ও অনুগ্রহ কামনা করি।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন ও হাদীসে 'রহ্মত' শব্দটি আখিরাতে বিশাল দয়া ও করুণার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'ফায্ল' শব্দটি দুনিয়ায় জীবিকা ও অপরাপর প্রচুর নি'আমত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মসজিদে দীনি, আধ্যাত্মিক ও আখিরাতে নি'আমত অর্জনের শ্রেষ্ঠতম স্থান এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র ফযল ও অনুগ্রহ চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা মসজিদ থেকে বের হয়ে দুনিয়ার জীবনে এ দু'আ করাই বাঞ্ছনীয়। এ উভয় দু'আর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, মানুষ যাতে মসজিদে প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় সর্বতোভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়।

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

৫৮- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ- رواه البخارى ومسلم

৫৮. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন মসজিদে বসার পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র সাথে মসজিদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। এ সম্পর্কের সূত্র ধরে মসজিদকে আল্লাহ্র ঘর বলা হয়। মসজিদের হক ও প্রবেশের আদব হচ্ছে এই যে, সেখানে প্রবেশ করে প্রথমত বসার পূর্বেই দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিবে। এ যেন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দরবারে সালাত পেশ করা। এ জন্যই এ সালাতকে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বলা হয়। অবশ্য অধিকাংশ ইমামের মতে এই সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

জ্ঞাতব্য ঃ এই হাদীসে এ মর্মে পরিষ্কার নির্দেশ এসেছে যে, মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা চাই। কখনো কখনো দেখা যায় যে, মুসল্লীরা মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে স্বেচ্ছায় কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে। না জানি কোত্থেকে এই ভ্রান্ত প্রথার প্রচলন হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (র)-এর বিবরণ থেকে জানা

যায় যে, চারশ বছর পূর্বে তাঁর যুগেও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এই ভ্রান্ত রুসম চালু ছিল।

٥٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ الاَّ نَهَارًا فِى الضُّحَى فَاِذَا قَدِمَ بَدَءَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ--- رواه البخارى ومسلم

৫৯. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফর শেষে কেবলমাত্র দিনের বেলা চাশ্‌তের সময় বাড়ী ফিরতেন। তবে যখনই আসতেন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করে সেখানে কিছুক্ষণ বসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অপরাপর হাদীস সূত্রে সবিস্তার জানা যায় যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন তখন মদীনার অদূরে কোথাও শেষ অবস্থান নিতেন। ফলে মদীনায় এ মর্মে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ত যে, তিনি অমুক স্থানে যাত্রা বিরতি করছেন এবং আগামীকাল ভোরে মদীনার তাশরীফ আনবেন। তারপর তিনি ভোরবেলা রওয়ানা করে চাশ্‌তের সময় মদীনায় উপস্থিত হতেন এবং প্রথমে মসজিদে অবস্থান নিতেন। তিনি যেন তাঁর ঘরে প্রবেশের পূর্বে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর ইবাদতের নযরানা পেশ করতেন। তারপর কিছুক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেন এবং সাক্ষাৎ প্রার্থীরা তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করে ধন্য হতেন। এই ছিল মসজিদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সর্বোত্তম আদর্শিকে নমুনা। আল্লাহ্ তা'আলা আমদের সবাইকে এর মর্ম বুঝার এবং তা অনুসরণ করার তাওফীক দিন।

মসজিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ঈমানের লক্ষণ

٦٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ «اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ» -رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

৬০. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা যখন কাউকে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে, তখন তার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে।" (৯, সূরা তাওবা ঃ ১৮) (তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ আল্লাহ্র ইবাদতের কেন্দ্রস্থল এবং দীনের অন্যতম প্রতীক। কাজেই এর সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং মসজিদকে আল্লাহ্র ইবাদত দ্বারা আবাদ করা কর্তব্য। এগুলো সাচ্চা ঈমানের লক্ষণ ও প্রমাণ।

মসজিদ পরিষ্কার করা এবং সুগন্ধময় করে রাখা

٦١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ - رواه أبوداؤد والترمذى وبن ماجه

৬১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুগন্ধিময় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ যেসব এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছে সেসব এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা উচিত এবং সর্ববিধ ময়লা থেকে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। মসজিদে সুগন্ধি ছিটানো চাই। মসজিদের ধর্মীয় গুরুত্ব এবং আল্লাহ্র সাথে এর সম্পর্কে এটাই দাবি।

মসজিদের নির্মাণের সাওয়াব

٦٢- عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ- رواه البخارى ومسلم

৬২. হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন-হাদীস-এর অসংখ্য বাণী থেকে জানা যায় যে, আখিরাতে প্রত্যেক কাজের যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে,

মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য জান্নাতে একটি চমৎকার মহল নির্মাণ করা যুক্তি সঙ্গত।

মসজিদের বাহ্যাড়ম্বর ও শান-শওকত অপসন্দীয়

٦٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى - رواه أبوداؤد

৬৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মসজিদকে (অতিরিক্ত) উঁচু ও চাকচিক্যময় করতে আদিষ্ট হই নি। এ হাদীস বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারী ইব্‌ন আব্বাস (রা) ভবিষ্যতবাণী করেন এমন সময় আসবে যখন তোমরা ইয়াহূদী- নাসারাদের ন্যায় তা চাকচিক্যময় করে তুলবে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী-"আমি মসজিদকে চাকচিক্যময় করতে আদিষ্ট হই নি।" এর মর্ম হচ্ছে এই যে, মসজিদের বাহ্যাড়ম্বর ও চাকচিক্য অবস্থা কোন প্রশংসনীয় কাজ নয়। বরং মসজিদ সাদসিধে করে নির্মাণ করাই সমীচীন। এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) উম্মাতের ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন। তার কারণ হয়ত এই যে তিনি কোন এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে এ বিষয় শুনে থাকবেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-"আমার দেখতে পাচ্ছি এমন এক সময় আসবে যখন (আমি তোমাদের মধ্যে থাকব না) তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করে তুলবে যেমনিভাবে ইয়াহূদীরা তাদের উপাসনালয় ও খ্রিস্টানরা তাদরে গির্জা আড়ম্বরপূর্ণ ও চাকচিক্যময় করে থাকে।"

আবার এটাও সম্ভব যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুসলমানদের মেযাজ, মন-মানসিকতা ও জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ্য করে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে তার ভবিষ্যদ্বাণী যে অবস্থার প্রেক্ষিতেই হোক না কেন তা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কেননা উপমহাদেশে আমরা এমন সব চাকচিক্যময়পূর্ণ মসজিদ দেখতে পাই যার সাথে ইয়াহূদী-নাসারাবাদের উপাসনালয়ের কোন তুলনাই হয় না।

(٦٤) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَبَاهِيَ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ- رواه أبوداؤد والنسائى والدارمى وابن ماجة

৬৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদ নিয়ে গর্ববোধ কিয়ামতের নিদর্শন সমূহের অন্যতম (নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মসজিদ নির্মাণ করবে)। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারিমী ও ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের লক্ষণসমূহের মধ্যে এমনও কতিপয় নিদর্শন রয়েছে যা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার নিকট সময়ে প্রকাশিত হবে। যেমন- দাজ্জালের আবির্ভাব, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া ইত্যাদি। কতিপয় এমন লক্ষণও রয়েছে যা কিয়ামতের পূর্বে কোন এক সময় প্রকাশিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতের মধ্যে যে সকল অনিষ্ট ও ফিতনার আশংকা করেছেন এবং কিয়ামতের লক্ষণ বলেছেন তার অধিকাংশই এরূপ। আর মসজিদ নিয়ে পরাস্পরিক গর্ববোধও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমগণ বহু পূর্বে থেকে এ অবস্থার শিকার হয়েছেন। হে আল্লাহ্! উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সংশোধিত হওয়ার তাওফীক দিন।

দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু আহার করে মসজিদে আসা নিষেধ

٦٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ- رواه البخارى ومسلم

৬৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ আহার করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে। কারণ মানুষ যাতে কষ্ট অনুভব করে, ফিরিশ্‌তাগণও তাতে কষ্ট পায়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদকে সব ধরনের দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখা মসজিদের ধর্মীয় গুরুত্ব ও আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এর সম্পর্কের অনিবার্য দাবি। বলাবাহুল্য, পিয়াজ-রসূনে রয়েছে এক ধরনের দুর্গন্ধ। কোন কোন এলাকায় উৎপাদিত পিয়াজ রসূনের দুর্গন্ধ অত্যন্ত উৎকট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় লোকেরা কাঁচা পিয়াজ-রসুন খেত। এজন্যই তিনি এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেউ যেন তা

খেয়ে মসজিদে না আসে। তিনি এর কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ যে বস্তু সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে কষ্ট দেয় তা আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাদেরও কষ্ট দেয়। ফিরিশ্‌তারা অধিক হারে মসজিদে আনাগোনা করে থাকেন। বিশেষ করে সালাত আদায়ের সময় মানুষের সাথে তাদের এক বিরাট জামা'আত শরীক হয়। কাজেই এহেন সম্মানিত অতিথিদের যাতে দুর্গন্ধ কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিয়াজ-রসুন সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ দু'টি বস্তু খেয়ে যেন কেউ আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে। এই হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, "কারো যদি এগুলো বস্তু খেতেই হয়, তবে যেন পাক করে খায় যাতে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়"।[১]

এ সব হাদীসে যদিও পিয়াজ-রসূনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে তবুও সুস্থ মানুষকে কষ্টদায়ক সর্ববিধ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হবে।

মসজিদে কবিতাবাজি এবং ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

٦٦– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَنَاشُدِ الاَشْعَارِ فِىْ الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالاِشْتِرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ – رواه أبو داؤد والترمذى

৬৬. আম্‌র ইব্‌ন শুআয়ব (র) পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতাবাজি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমু'আর দিন জুমু'আর সালাতের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ যেসব কাজ জায়িয হলেও আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দীনের সাথে সম্পর্কহীন (যেমন, ব্যবসায় বা বিনোদনমূলক অথবা কাব্য ও সাহিত্য মজলিস) এহেন কাজের জন্যও মসজিদ ব্যবহার না করা চাই। মসজিদে কবিতাবাজি ও ক্রয়-বিক্রয় নিষেধের এটাই হচ্ছে ভিত্তি। হাদীসের শেষাংশ জুমু'আর দিনের যে বিষয় রয়েছে তার মর্ম হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য প্রথম ওয়াক্তেই মসজিদে আসে (যে বিষয়ে হাদীসে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে) সে যেন একাগ্রতার সাথে ইবাদাতে মশগূল থাকে এবং মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে না বসে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

---

১. এ রিওয়ায়াতটি মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররা (রা) সূত্রে ইমাম আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করেছেন।

অবোধ শিশু ও হট্টগোল ইত্যাদি থেকে মসজিদ মুক্ত রাখা

٦٧– عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعِ اَصْوَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ – رواه ابن ماجة

৬৭. হযরত ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবোধ শিশু, উন্মাদ (কে মসজিদে আসা থেকে) দূরে রাখ, তেমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, উচ্চঃস্বর-হট্টগোল, শাস্তি কার্যকর করা এবং তরবারি কোষমুক্ত করা থেকে তোমাদের মসজিদকে মুক্ত রাখো (এসব মসজিদের আদব পরিপন্থী কাজ যেন না হয়। (ইব্‌ন মাজাহ)

মসজিদে দুনিয়ার কথা বলা নিষেধ

٦٨– عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِ حَاجَةٌ –رواه البيهقى شعب الايمان

৬৮. হযরত হাসান বাস্‌রী (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানব সমাজে এমন সময় আসবে যে, মানুষ মসজিদে দুনিয়া সম্পর্কিত কথায় মত্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে বসো না এবং আল্লাহ্‌রও তাদের কোন প্রয়োজন নেই। (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। কাজেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিপন্থী এবং ধর্ম বিবর্জিত আলোচনায় মত্ত না হওয়া এর মর্যাদা রক্ষার অনিবার্য দাবি। তবে হ্যাঁ, মুসলিম জনগোষ্ঠির কোন জাতীয় বা সামাজিক বিষয় সম্পর্কে, চাই তা মুসলমানদের জীবনের যে কোন বিষয় হোক না কেন, পরামর্শ করা যেতে পারে। কিন্তু এমতাবস্থায়ও মসজিদের সাধারণ মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। এর আরেকটি শর্ত হল, যা কিছু হবে তা হবে আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশের আওতায় বিরুদ্ধে নয়, হিদায়াতমুক্ত নয়।

জ্ঞাতব্যঃ এ হাদীসের বর্ণনাকারী একজন খ্যাতিমান তাবিঈ। তিনি এই হাদীসটি হয়তবা কোন সাহাবী সূত্রে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি উক্ত সাহাবীর সূত্র

উল্লেখ করেন নি। সুতরাং কোন তাবিঈ যদি সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে হাদীস বর্ণনা করেন তবে তাকে হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় 'মুরসাল' বলা হয়। আলোচ্য হাদীসটিও মুরসাল।

মসজিদে মহিলাদের সালাত আদায়ের অনুমতি

٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اسْتَاذَنَكُمْ نِسَائُكُمْ بِاللَّيْلِ فَأْذَنُوْلَهُنَّ - رواه البخارى ومسلم

৬৯. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ রাতে মসজিদে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের অনুমতি দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ -رواه ابوداؤد

৭০. হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে ঘরে সালাত আদায় করাই তাদের জন্য উত্তম । (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনকালে যখন মসজিদে নববীতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করতেন, তখন তিনি একথা পরিষ্কার করে বলেছেন ঃ মহিলাদের নিজ ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম এবং তাতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। বহু সংখ্যক সতী সাধবী নারী একান্তভাবেই আগ্রহী ছিলেন যে, তাঁরা কমপক্ষে তাঁর পিছনে এশা ও ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করবেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তাদের স্ত্রীদের অনুমতি দিচ্ছিলেন না। তবে তাঁদের অনুমতি না দেওয়ার পেছন কোন ফিতনা কিংবা কু-ধারণা নিহিত ছিল না। কারণ তখন পুরো সমাজ ইসলামী ভাবধারা অবগাহিত ছিল। বরং শরী'আত পরিপন্থী একটি চেতনাই নিষেধের ভিত্তি ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা রাতের সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ে আগ্রহী, তোমরা তাদের অনুমতি দিবে। কিন্তু তিনি নারীদের সর্বদা একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, নিজ ঘরে সালাত আদায়ে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক সাওয়াব। পরবর্তী হাদীস থেকে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

٧١– عَنْ اُمِّ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّةِ اَنَّهَا جَائَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ الصَّلٰوةَ مَعَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَلِمْتُ
اَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلٰوةَ مَعِىَ وَصَلٰوتُكِ فِىْ بَيْتِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكِ فِىْ حُجْرَتِكِ
وَصَلٰوتُكِ فِىْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكِ فِىْ دَارِكِ وَصَلٰوتُكِ فِىْ دَارِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ
وَصَلٰوتُكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكِ فِىْ مَسْجِدِىْ – رواه
أحمد (كنزالعمال)

৭১. হযরত উম্মু হুমায়দ সাঈদিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি আপনার সাথে সালাত আদায় করতে আগ্রহী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি আমার সাথে (জামা'আতে) সালাত আদায়ে আগ্রহী। তবে (শরী'আতের বিধান হল) তোমার ঘরের বাইরের অংশে সালাত আদায়ের চাইতে তোমার ঘরের ভিতরের অংশে সালাত আদায় করা উত্তম। নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় সালাত আদায়ের চাইতে তোমার ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম। নিজ মহল্লার মসজিদে সালাত আদায়ের চাইতে তোমার নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় সালাত আদায় করা উত্তম। আমার মসজিদের (মসজিদে নববী) চাইতে তোমার মহল্লার মসজিদে সালাত আদায় করা তোমার জন্য উত্তম। (কানযুল উম্মাল, ইমাম আহ্‌মাদ (র) এর বরাতে)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস ছাড়াও অনেক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলাদের মসজিদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মনে ঘরে সালাত আদায়ে অনেক সাওয়াব হওয়ার বিষয়টি স্থান পেলেও তাঁরা এতটুকু আবেগপ্রবণ হয়েছিলেন যে, কমপক্ষে তাঁরা রাতে মসজিদে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে সালাত আদায় করবেন।

এ আবেগের মূলে ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাদের ঈমানী ভালবাসা। কারণ সে যুগে কোন ধরনের ফিতনার আশংকা ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের স্ত্রীরা রাতের সালাত আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে যাবার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের অনুমতি দিবে। বলাবাহুল্য, মহিলাদের মসজিদে যাবার অনুমতি তখন কার্যকর ছিল, যখন কোন প্রকার ফিতনার আশংকা ছিল না। কোন কোন সাহাবী নিজ চিন্তা-চেতনার বশবর্তী হয়ে নিজ স্ত্রীদের মসজিদ

যেতে বারণ করতেন। তারপর নারী পুরুষ উভয় মহলে যখন দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ফিতনার তীব্র আশংকা সৃষ্টি হয় তখন হযরত আয়েশা (রা) (যিনি মহিলাদের ভেতর-বাইর সর্ববিধ বিষয়ে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেযাজ মরযি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন) যা বলেন তা পরবর্তী হাদীস থেকে জানা যাবে।[১]

٧٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ- رواه البخارى ومسلم

৭২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বর্তমানকালের মহিলাদের দেখতেন, তবে তিনি স্বয়ং তাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন, যেমনিভাবে–বনী ইসরাঈলের মহিলাদের (এসব কারণে) মসজিদে আসতে বারণ করা হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এ ভাষ্য হযরত আয়েশা (রা) এর। তিনি অধিকাংশ সাহাবীর বরাতে বলেন, বর্তমান যুগে মহিলাদের মসজিদে না যাওয়া উচিত। এরপর সমাজ ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তাতে একথা স্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দানের প্রশ্নই উঠে না।

---

১. আলোচ্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় যা লেখা হয়েছে তা মূলত হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) প্রণীত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা থেকে সংগৃহীত। (২য় খণ্ড, পৃ. ২৬)

জামা'আত

সালাত অধ্যায়ের শুরুতে একথা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সালাত কেবল ফরয ইবাদতই নয় বরং ঈমান ও ইসলামের অন্যতম প্রতীক। যথাযথভাবে সালাত আদায় করা মুসলিম হওয়ার প্রমাণ এবং তা বর্জন দীনের প্রতি উদাসীনতার নামান্তর ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সম্পর্কহীনতার লক্ষণ। সালাত আদায়ের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, বান্দা যেন লোকচক্ষুর সামনে তা আদায় করে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্য জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের সুব্যবস্থা করেন এবং অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন উযর না থাকা পর্যন্ত জামা'আতে সালাত আদায় অপরিহার্য ঘোষণা করেন। আমার মতে, জামা'আতে সালাত আদায়ের বিশেষ রহস্য হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা বান্দার পাঁচবার হিসাব গ্রহণ করা হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যেতে পারে যে, যারা নিজ ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা কাটিয়ে নিয়মিত সালাত আদায় করতে পারে না তারাও জামা'আতবদ্ধভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার মধ্য দিয়ে নিয়মিত মুসল্লী হয়ে যায়। তাছাড়া জামা'আতের সালাত আদায়ের পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহ্‌র দীনী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ দিকও বটে। অনুরূপভাবে এটা পারস্পরিক খোঁজ নেয়ার এক অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি যার বিকল্প অচিন্তনীয়।

জামা'আতের সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহ্ ইবাদতে অধিক মশগুল হয়। এত সে আল্লাহ্ অভিমুখী হয় এবং তার অন্তরে এর বিশেষ প্রভাব পড়ে। ফলে আসমানী রহমত প্রাপ্ত হয়ে। আল্লাহ্‌র সাথে তার আন্তরিক বন্ধন স্থাপিত হয় এবং (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন হাদীসের বর্ননা অনুযায়ী) সালাতে ফিরিশ্‌তাদের অংশগ্রহণের ফলে মানুষ ও ফিরিশ্‌তাদের সহাবস্থান ও সান্নিধ্য লাভ ঘটে। এও হচ্ছে জামা'আত সালাত আদায়ের অন্যতম বরকত। এতদ্ব্যতীত জামা'আতের সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত' সালাত, সপ্তাহান্তে জুমু'আর সালাত এবং বছরে দুই বার ঈদের সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের মধ্য দিয়ে যে আরো বৃহত্তর ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতির ব্যাপক উপকার লাভ করা যায়, তা অনুধাবন করা

বর্তমান কালের প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত সহজ। মোটকথা জামা'আতে সালাত আদায়ে এহেন বরকত ও উপকারিত নিহিত থাকায় প্রত্যেকের উপর জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, যতক্ষণ না এমন কোন উযর পরিদৃষ্ট হয় যা জামা'আতে সালাত আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জামা'আতে সালাত আদায়ের যে শিক্ষা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন মানুষ যত দিন যথাযথভাবে কার্যকারী ছিল ততদিন পর্যন্ত -মুনাফিক অথবা অপারগ ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকেই জামা'আতে সালাত আদায়ে করতেন এবং এতে অসতর্কতাকে মুনাফিকের লক্ষণ বলে মনে করতেন। এই ভূমিকার পর জামা'আতে সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

জামা'আতের গুরুত্ব

٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لِيَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِيَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى وَ اِنَّهُنَّ (اَىِّ الصَّلَوَاتُ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ) مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ .... رواه مسلم

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা দেখছি যে, সেই সকল মুনাফিক যাদের মুনাফিকী জানাজানি হয়ে গিয়েছিল এবং রোগী ব্যক্তিরা ব্যতীত (মুসলমাদের) অন্য কেউ জামা'আতে অনুপস্থিত থাকে না, এমন কি যেসব রোগী দুই জনের কাঁধে ভর করে চলতে সক্ষম, তারাও জামা'আতে শরীক হত। তারপর তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (দীন ও শরী'আতের) সত্যপথ প্রদর্শন করেছেন। এ সকল পথের একটি হলো, সেই মসজিদে সালাত আদায় করা যেখানে আযান দেওয়া হয়। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে হিদায়াতের সকল পথ বাতলে দিয়েছেন আর পাঁচ ওয়াক্তের সালাত মসজিদে আদায় কর এ সব হিদায়াতের পথসমূহের অন্যতম। তোমরা যদি এই সকল

সালাত (ঐ ব্যক্তির মত জামা'আত থেকে পৃথক) কর তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকেই ছেড়ে দিলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন মূলত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ নির্দেশনা ও শিক্ষার অন্যতম দিক, যার মাধ্যমে উম্মাত সৎপথ লাভ করতে পারে। আলোচ্য হাদীসের শেষ দিকে তিনি বলেছেন ঃ জামা'আত ছেড়ে ঘরে সালাত আদায় করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ ত্যাগ করারই নামান্তর । তিনি আরো বলেছেন ঃ এই উম্মাতের প্রাথমিক পর্যায়ের লোকেরা যেহেতু আমাদের আদর্শ ছিলেন তাই মুনাফিক ও রোগের কারণে অপারগ ব্যক্তি ছাড়া সকল মুসলমানই জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ্র কোন কোন বান্দা অসুস্থ হলেও লোকের সাহায্যে জামা'আতে শরীক হতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর এই বর্ণনা থেকে একথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠে যে, তাঁর এবং সাধারণ সাহাবীদের দৃষ্টিতে জামা'আতে সালাত আদায় কর ওয়াজিব। যারা হাদীসে উদ্ধৃত سُنَنُ الْهُدَى " দ্বারা জামা'আতকে ফিক্‌হের পরিভাষায় 'সুন্নাত' বলেন তাঁরা সম্ভবত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর কথা সার্বিকভাবে তলিয়ে দেখেন নি। পরবর্তী হদীসসমূহ থেকে এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اٰخُذُ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلٰى مَنْ لاَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ بَعْدُ - رواه البخارى ومسلم

৭৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার সালাতের চাইতে অধিক কষ্টকর সালাত নেই। অথচ এই দুই সালাতে কী ফযীলত রয়েছে তা যদি তারা জানত, তাহলে (অসুস্থ তার কারণে হেঁটে আসতে না পারলে) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার উপস্থিত হত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, (কোন

একদিন) মু'আয্যিনকে ইকামত দিতে বলি এবং কাউকে (আমার স্থলে) লোকদের ইমামতি করতে বলে আমি নিজে আগুনের একটি মশাল নিয়ে যারা সালাতে আসেনি (ভিতরে রেখে তাদের ঘরে) আগুন জ্বালিয়ে দেই, যারা (আযান শুনেও) সালাতের জন্য ঘর থেকে বেরোয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ আকবার! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় যে সকল লোক জামা'আতে সালাত আদায় করত না, তিনি তাদের বিরুদ্ধে কী কঠিন সতর্ক বাণী ও ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রভাবময়ী বাণী আরো স্পষ্টরূপে হযরত উসামা (রা) থেকে ইব্ন মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে। এতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"লোকদের জামা'আত বর্জন করা থেকে বিরত থাকা উচিত নতুবা অবশ্যই আমি তাদের ঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দেব।" (কানযুল উম্মাল, ইব্ন মাজার বরাতে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল জামা'আত বর্জনকারীদের ব্যাপারে এহেন কঠিন ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তারা হয়ত আকীদার দিক থেকে ছিল মুনাফিক নতুবা কার্যের দিক থেকে ছিল (বে-আমল) মুনাফিক। জামা'আত বর্জন কারীদের সম্পর্কেই ছিল তাঁর এহেন ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। এই কথার ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক ইমাম (এ যাঁদের মধ্যে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও রয়েছেন) বলেন, সক্ষম ব্যক্তিদের জামা'আতে সালাত আদায় করা ফরয। অর্থাৎ তাঁদের মতে সালাত যেমন ফরয, তদ্রূপ জামা'আতে সালাত আদায়ও একটি পৃথক ফরয এবং জামা'আত বর্জনকারী একটি ফরযে আঈনের বর্জনকারী। কিন্তু প্রাজ্ঞ হানাফী আলিমগণ জামা'আত সংক্রান্ত সকল হাদীস সামনে রেখে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব এবং তার বর্জনকারী একজন গুনাহগার। উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষণে মূলত এক ধরনের সতর্কবাণী ও ধমক দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٧٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىْ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِى صَلّٰى - رواه أبوداؤد والدار القطنى

৭৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মু'আয্যিনের আযানে শুনতে পায়, আর কোন উযর তাকে (জামা'আতে অংশগ্রহণ) থেকে বিরত না রাখে, (তা সত্ত্বেও যদি সে জামা'আতে শরীক না হয়ে তবে, তার সালাত কবুল হবে না। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন ঃ

উযর কি? তিনি বললেন জানমালের ক্ষতির আশংকা কিংবা রোগ ব্যাধি। (আবূ দাঊদ ও দারু কুতনী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে সালাতের জামা'আত বর্জনকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন সতর্কবাণী ও ধমক উচ্চারিত হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, উযূ যেমন সালাতের জন্য শর্ত, তেমনি জামা'আত ও (সালাত কবূলের জন্য শর্ত)। উযর ছাড়া সালাতের জামা'আত ত্যাগ জনিত কারণে সালাতই আদায় হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ইমামগণের মতে এহেন ব্যক্তির সালাত আদায় হয়ে যাবে, তবে তা হবে নিতান্ত অসম্পূর্ণ আদায়, তার সাওয়াবও হবে খুবই কম এবং আমলের যে উদ্দেশ্য– আল্লাহ্‌র বিশেষ সন্তোষ অর্জন তা থেকেও সে বঞ্চিত হবে । অধিকাংশ আলিমের মতে, এটাই হল সালাত কবূল না হওয়ার মর্ম। অন্যান্য হাদীসে যেখানে জামা'আতের সাথে এবং জামা'আত বিহীন সালাতের সাওয়াবের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের উল্লেখ রয়েছে তাতেও জমহুর আলিমদের অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। তবে এ কথা সত্য যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জামা'আত বর্জন মূলত রহমত ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া ও দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়ারই নামান্তর।

٧٦– عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْرٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَعْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ – رواه أحمد وأبوداؤد وَالنَّسَائِى

৭৬. হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিন জন লোক ও অবস্থান করে অথচ সালাতের জামা'আত কায়েম করেন, তাদের শয়তান কাবু করে ফেলে। কাজেই জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ দলছুট একক বকরীকেই বাঘে ধরে খায়। (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ কোথাও যদি তিন জন মুসল্লী থাকে, তাদেরও জামা'আতে সালাত আদায় কর উচিত। যদি তারা তা না করে তাহলে শয়তান অতি সহজেই তাদেরকে শিকারে পরিণত করবে।

জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত ও বরকত

٧٦– عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْرٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدْ اسْتَعْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ

بِالْجَمَاعَةِ فَانَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - رواه أحمد وأبوداؤد والنَّسَائى

٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً- رواه البخارى ومسلم

৭৭. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জামা'আতে সালাত আদায় করার ফযীলত একাকী সালাত আদায় করার চাইতে সাতাশ গুণ বেশি। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের পর্থিব জগতে বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ক্ষেত্র মর্যাদায় যেমন পার্থক্য রয়েছে যার ভিত্তিতে বস্তুর উপকারিতা ও মূল্যায়নে পার্থক্য হয়ে থাকে,তেমনি আমালের মধ্যেও মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে, তার সবিস্তার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই কোন আমালের বিষয় এরূপ মন্তব্য করেন যে, অমুকে কাজের মুকাবিলায় অমুক কাজের এত গুণ অধিক মর্যাদা রয়েছে। যখন তিনি আল্লাহ্র তরফ থেকে তা জ্ঞাত হন। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী "একাকী সালাত আদায় করার চাইতে জামা'আতে সালাত আদায়ে রয়েছে সাতাশ গুণ সাওয়াব বেশী"। বলার হাকীকত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি তা মু'মিনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই প্রত্যেক মু'মিনের জামা'আতে সালাত আদায় করা উচিত। এই হাদীসের আলোকে একাথাও জানা গেল যে, একাকী সালাত আদায়কারীর সালাত নিরর্থক নয় এতেও সালাত আদায় হবে। কিন্তু সাওয়াব ছাব্বিশ গুণ কম হবে। এটাও একটা বিরাট ক্ষতি এবং বড় ধরনের বঞ্চিত হওয়া।

(٧٨) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الاُوْلٰى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاةٌ مِنَ النِّفَاقِ - رواه الترمذى

৭৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য একাধারে চল্লিশ দিন তাক্বীরে উলার (প্রথম তাক্বীর) সাথে জামা'আতে সালাত আদায় করতে পারল তাকে দু'টি মুক্তির সনদ দেওয়া হয়– জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফিকী থেকে নিষ্কৃতি। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ একাধারে চল্লিশ দিন তাক্‌বীরে উলার সাথে সালাত আদায় করা আল্লাহ্‌র নিকট একটি প্রিয় কাজ এবং বান্দা তার একাজের মাধ্যমে এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, তার অন্তর নিফাকমুক্ত এবং এ এমনই একটি কাজ যার দ্বারা বান্দা জান্নাত লাভ করবে, কখনো জাহান্নামের আগুনের শিকার হবেনা। কাজেই কোন লোক যদি আন্তরিকতার সাথে দৃঢ়সংকল্প করে এবং সাহস রাখে, তবে আল্লাহ্‌র তাওফীকের আশা করা যায়। এটা কোন কঠিন কাজ নয়। এ হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, ধারাবাহিক চল্লিশ দিন ভাল কাজ করার মধ্যে বিশেষ কার্যকারিতা নিহিত রয়েছে।

জামা'আতের নিয়্যাতের মধ্যে জামা'আতের পূর্ণ সাওয়াব নিহিত

৭৯– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا ، لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا – رواه أبوداؤد والنسائى

৭৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেউ উত্তমরূপে (পূরো পাবন্দিসহ) উযূ করে, তারপর মসজিদে গিয়ে দেখে লোকের (জামা'আতের সাথে) সালাত আদায় করে নিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তিকে জামা'আতে অংশগ্রহণকারীদের অনুরূপ সাওয়াব দিবেন। কিন্তু এতে তাদের সাওয়াব বিন্দুমাত্র কম হবে না। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের মর্ম হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি জামা'আতে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত এবং সতর্ক, সে যদি উত্তমরূপে উযূ করে নিজ অভ্যাস মত জামা'আতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য মসজিদে গিয়ে দেখে যে, জামা'আত হয়ে গেছে, আল্লাহ্ তাকে তার বিশুদ্ধ নিয়্যাতের কারণে জামা'আতের পূর্ণ সাওয়াব দিবেন। কারণ একথা পরিষ্কার যে, উক্ত ব্যক্তির অলসতা কিংবা অমনোযোগীভাব ইত্যাদির কারণে জামা'আত হারায় নি বরং সময় জ্ঞানে ভুল হওয়ায় বা অনুরূপ কোন কারণে জামা'আত থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যাতে তার কোন ত্রুটি ছিল না।

কোন্ অবস্থায় জামা'আতে সালাত আদায় করা জরুরী নয়

৮০– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتَ بَرْدٍ وَّ رِيْحٍ ثُمَّ قَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ

اذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَّمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ - رواه البخارى ومسلم

৮০. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার প্রচণ্ড শীত ও প্রবল বাতাসের রাতে সালাতের আযান দিলেন। তারপর ঘোষণা দিলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও। এরপর তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মু'আয্যিনকে একথা বলার নির্দেশ দিতেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসে সালাত আদায় করে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে যে শীত ও বাতাসের রাতের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা প্রচণ্ড শীত ও ঝড়ো বাতাস বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে যদি এরূপ প্রবল বৃষ্টি হয় যাতে মসজিদে পর্যন্ত পৌঁছতে ভিজে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় অথবা রাস্তায় পানি, কাদা থাকে বা পথ পিচ্ছিল হয়ে যায় এমতাবস্থায়ও নিজ ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। এসব অবস্থায় সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া জরুরী নয়।

٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَةُ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يُعَجِّلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ - رواه البخارى ومسلم

৮১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো সামনে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়, ওদিকে (মসজিদে) সালাতের ইকামাতও শুরু হয়ে যায় তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নেবে। খাবার শেষ না করে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ভাষ্যকারগণ লিখেছেন, কারো যদি তীব্র ক্ষুধা অনুভূত হয় এবং সামনে খানা পরিবেশন করা হয় এমতাবস্থায় যদি সে খাবার গ্রহণ না করে সালাতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তার মনে সালাতের মধ্যে খানার কথা স্মরণ হবে। এজন্য এহেন অবস্থায় শরী'আতের বিধানের অনিবার্য দাবি হলো প্রথমত খাবার শেষ করে তারপর সালাত আদায় করা।

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে কখনও কখনও আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতেন। তাঁর সামনে খানা পরিবশেন করা হচ্ছিল, ওদিকে সালাতেরও ইকামাত চলছিল।

এমতাবস্থায় তিনি আহার করে নিতেন অথচ ইমামের কিরা'আত তাঁর কানে ঝংকৃত হত। কিন্তু তিনি খাবার শেষ করে সালাত আদায় করে নিতেন। উল্লেখ্য, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) শরী'আত ও সুন্নাতের একজন অনন্য অনুসারী বরং প্রেমিক ছিলেন। তিনি একাজ মূলত (উপরে বর্ণিত হাদীসের আলোকেই করেছিলেন।

٨٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلٰوةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الاَخْبَثَانِ - رواه مسلم

৮২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, খানা সামনে আসার পর কোন সালাত নেই এবং পেশাব পায়খানার বেগ থাকা অবস্থায়ও কোন সালাত নেই। (মুসলিম)

٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَبْدَءْ بِالْخَلاَءِ - رواه الترمذى وروى مالك وأبوداؤد والنسائى نحوه

৮৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যখন সালাতের জামা'আত শুরু হয় এবং তোমাদের কারো পেশাব পায়খানার বেগ শুরু হয়, তখন তার পেশাব পায়খানা করে নেয়া উচিত।

(তিরমিযী, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত হাদীসমূহে প্রবল বাতাস, বৃষ্টি, প্রচণ্ড শীত, পানাহার এবং পেশাব পায়খানার বেগের সময় জামা'আতের সালাত আদায় করতে না পারায় একাকী সালাত আদায়ের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এতে একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলাম মানুষের অপারগতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছে।

জামা'আতে সালাত আদায়কালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান

সালাতের যেহেতু সামষ্টিক দিক রয়েছে তাই এতে রয়েছে জামা'আতের ব্যবস্থা। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পথ নির্দেশ হচ্ছে এই যে, লোকেরা সালাত আদায়কালে যেন কাতার বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সালাতের মত সামষ্টিক ইবাদতে সারিবদ্ধভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পদ্ধতির কোন বিকল্প

নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারিগুলো পুরোপুরি সোজা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন, যাতে কেউ আগে-পিছে না দাঁড়ায়। প্রথমত প্রথম সারি পূরো করার পর পেছনের সারিসমূহ সোজা করে নিতে হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও প্রবীণদের সামনের সারিতে ইমামের কাছাকাছি স্থানে জায়গা দিতে হবে। ছোট শিশুদের পেছনে এবং নারীদেরকে পেছনে সর্বশেষ সারিতে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। ইমাম সাহেব সবার সামনে মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়াবেন। উল্লেখ্য, এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো, জামা'আতে মহান উদ্দেশ্য সফলতা ও পূর্ণতা বয়ে আনা এবং একে অধিক উপকারী ও প্রভাবময়ী করে তোলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এগুলো বাস্তবে করে দেখিয়েছেন, উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এর সাওয়াব বাতলে দিয়ে তা কার্যে পরিণত করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এসব ব্যাপারে যারা বেপরোয়া ও উদাসীন তাদের তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এ ভূমিকার পর নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যাক।

কাতার সোজা করার গুরুত্ব এবং তাকিদ

٨٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ - رواه البخارى

৮৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাতারগুলো সোজা কর। কারণ কাতার সোজা ও সমান করা সালাতকে সুষ্ঠুভাবে আদায় করার অর্ন্তভূক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ইকামাতে সালাত, যে বিষয়ে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা মুসলমানদের উপর অন্যতম ফরয, এর পূর্ণতা বিধানের জন্য যে সকল শর্তারোপ করা হয়েছে তন্মধ্যে জামা'আতে দাঁড়ানোর সময় কাতার সোজা ও সমান করার বিষয়টি অন্যতম। সুনানে আবূ দাঊদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের ইমামতি করার জন্য দাঁড়াতেন তখন প্রথমে ডানদিকে ফিরে বলতেন ঃ তোমরা কাতার সোজা ও সমান করে দাঁড়াও। অনুরূপ বামদিকে ফিরে বলতেন ঃ তোমরা কাতার সোজা ও সমান করে নাও। এই হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে সালাতে দাঁড়ানোর সময় প্রায়ই এ বিষয়ে তাকিদ দিতেন।

٨٥- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ سُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَمَ حَتّٰى رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يُكَبِّرَ فَرَاٰى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرَاهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ -- رواه مسلم

৮৫. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করতেন যেন তা দিয়ে তীর সোজা করবেন। এভাবে করতে করতে এক সময় তিনি দেখলেন, আমরা একাজটি (কিভাবে সোজা দাঁড়াতে হয়) শিখে গেছি। তারপর তিনি একদিন বেরিয়ে এসে নিজের জায়গায় দাঁড়ালেন। এমনকি তিনি তাক্‌বীর বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার বুক কাতারের বাইরে বের হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দারা কাতার সোজা করে নাও, অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিরোধীতা সৃষ্টি করে দিবেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ "এমন কি তিনি কাতার দিয়ে তীর সোজা করে নিবেন" এর তাৎপর্য বুঝার জন্য প্রথমে জেনে নেয়া আবশ্যক যে, আরবরা জন্তু শিকার কিংবা রণাঙ্গনে ব্যবহারের লক্ষ্যে যে তীর তৈরি করত তা পূর্ণ সোজা ও সমান করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাত। এজন্য কোন সোজা বস্তুর প্রশংসা করতে গিয়ে বলত, বস্তুটি এমন সোজা এটা দিয়ে সোজা করা যায়। অর্থাৎ তা তীর সোজা ও সমান করার মাপকাঠিরূপে স্বীকৃত। মোদ্দাকথা, আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীরের বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো এমনভাবে সোজা করতেন যাতে আমরা এক সূতা পরিমাণ আগে কিংবা পিছেনা দাঁড়াই। দীর্ঘদিন ধরাবাহিকভাবে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের পর তাঁর এ বিশ্বাস জন্মায় যে, আমরা বিষয়টি পুরোপুরি কার্যে পরিণত করতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এরপর যখন তিনি একদিন এক ব্যক্তির মধ্যে এরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করেন তখন অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ! আমি এ বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, সালাতের কাতারগুলো সোজা ও সমান করার ব্যাপারে যদি তোমাদের মধ্যে বে-পরোয়াভাব ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে থাকে, তবে আল্লাহ্ শাস্তিস্বরূপ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। অর্থাৎ তোমাদের ঐক্য ও সংহতি তিনি নষ্ট করে দিবেন। ফলে তোমরা কলহ-বিবাদে

জড়িয়ে পড়বে যা দুনিয়ায় উম্মাতের জন্য এক ধরনের শাস্তি। সালাতের কাতারসমূহ সোজা করার ক্ষেত্রে ত্রুটির ও অসচেতনার ফলে যে পারস্পরিক সংঘাত ও কলহ-বিবাদ অনিবার্য এবং এ ব্যাপারে যে হুশিয়ারী ও সতর্কবাণী সম্বলিত বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। নিঃসন্দেহে রূপ ত্রুটি ও শাস্তির মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। আফসোস! অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়েও বিশেষ করে কোন কোন এলাকার মুসল্লীদের মধ্যে এ ত্রুটি সাধারণ রূপ নিয়েছে।

٨٦- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُاْ وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُوْاالاَرْحَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

رواه مسلم

৮৬. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে (আদায় পূর্বক্ষণে) আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে বলতেনঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, আগে-পিছে হয়ে যেও না, অন্যথায় তোমাদের মনের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিবে। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের যেন আমার নিকটবর্তী থাকে। তারপর তারা থাকবে যারা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে তাদের কাছাকাছি। তারপর তারা যারা তাদের কাছাকাছি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কাতারসমূহ সোজা করা ছাড়াও কাতারসমূহে দাঁড়ানো লোকদের পর্যায়ক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো এই যে, আমার কাছে ঐ সকল লোক দাঁড়াবে আল্লাহ্ যাদের দীনের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তারপর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক থেকে যারা তাদের কাছাকাছি তারা থাকবে। তারপর থাকবে যারা তাদের কাছাকাছি। বলাবাহুল্য, এ বিন্যাস পদ্ধতি মানুষের সহজাত অভ্যাসের অনিবার্য দাবি। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ও দাবি এই যে, উত্তম ব্যক্তিবর্গ মর্যাদার অনুযায়ী সামনে ও নিকটে অবস্থান গ্রহণ করবেন।

٨٧- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا اِذَاقُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِذَاسْتَوَيْنَا كَبَّرَ - رواه أبو داؤد

৮৭. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়াতেন তখন আমাদের কাতারগুলো সোজা ও সমান করে নিতেন। এরপর আমরা সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি (সালাতের) তাক্বীর বলতেন। (আবূ দাঊদ)

সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পুরা করা

٨٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِن نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُوَخَّرِ - رواه أبوداؤد

৮৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রথম কাতার পুরা কর, তারপর এর পরের সারি। যদি কোন কমতি থাকে তাহলে সেটা হবে শেষ সারিতে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসল্লীরা যখন সালাতে দাঁড়ায় প্রথমে তাদের প্রথম কাতার, তারপর পর্যায়ক্রমে খালি স্থান থাকা পর্যন্ত কাতারসমূহ পুরা করে নিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সামনের সারিতে ফাঁকা জায়গা থাকবে ততক্ষণে পেছনে দাঁড়াবে না। এর ফল এই দাঁড়াবে যে, প্রথম সারিগুলো পূরা হয়ে যাবে, কমতি শুধু শেষ সারিতে থাকবে।

প্রথম কাতারের ফযীলত

٨٩- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الاَوَّلِ، قَالُوْا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِيْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الاَوَّلِ قَالُوْا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِيْ قَالَ وَعَلَى الثَّانِيْ - رواه أحمد

৮৯. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম সারির ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ এবং ফিরিশ্তাকুল রহমতের দু'আ করেন। সাহাবা কিরাম বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় সারির জন্য ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম সারির ব্যক্তিদের প্রতি রহমত বর্ষণ এবং ফিরিশ্তাগণ রহমতের দু'আ করেন। তাঁরা আবার বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্বিতীয় সারির জন্য? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্

তা'আলা প্রথম সারির ব্যক্তিদের প্রতি রহমত বর্ষণ এবং ফিরিশ্‌তাগণ রহমতের দু'আ করেন। তাঁরা আবার বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বিতীয় সারির জন্য? তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয় সারির জন্যও। (আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত এবং ফিরিশতাদের দু'আ বিশেষত প্রথম সারির লোকদের জন্য বরাদ্ধ। দ্বিতীয় সারির লোকেরা এ সকল ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হলেও মর্যাদার দিক থেকে অনেক পেছনে। মোদ্দাকথা, আমাদের দৃষ্টিতে প্রথম ও দ্বিতীয় সারির মধ্যে রয়েছে যৎসামান্য ব্যবধান, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার দিক থেকে দুই সারির মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। এজন্য আল্লাহ্‌র রহমত প্রত্যাশীদের যথাসম্ভব প্রথম সারিতে স্থান নেয়ার চেষ্টা করা উচিত। এর অনিবার্য দাবি হচ্ছে, প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে উপস্থিত হওয়া। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানত প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি (পরিমাণ সাওয়াব) আছে, তাহলে তা অর্জন করার জন্য তারা প্রয়োজন হলে অবশ্যই লটারী করত। আল্লাহ্ এসব হাকীকতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের তাওফীক দিন। আমীন!

কাতারের বিন্যাস পদ্ধতি

٩٠- عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الاَشْعَرِىِّ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلٰوتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ اُمَّتِىْ -رواه أبو داؤد

৯০. হযরত আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সালাতের বিষয়ে অবহিত করব না? এরপর তিনি বলেন, সালাত আদায়ের প্রথমে তিনি পুরুষদের, তারপর বালকদের সারি বিন্যাস করতেন। এরপর তিনি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি বলতেন ঃ এটাই আমার উম্মাতের সালাতের বিন্যাস পদ্ধতি।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে সঠিক ও সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, প্রথম হবে পুরুষদের কাতার তার পেছনে হবে শিশুদের কাতার, পরবর্তী হাদীস থেকে আরো জানা যাবে যে, জামা'আতে যদি মহিলারা অংশগ্রহণ করেন তবে তারা শিশুদের পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন।

ইমাম মাঝিমাঝি স্থানে দাঁড়াবেন

٩١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَسَّطُوْا الاِمَامَ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ - رواه أبو داؤد

৯১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ইমামকে (সারির) মাঝামাঝি স্থানে দাঁড় করাও এবং সারির মধ্যকার ফাঁকা জায়গাসমূহ বন্ধ করে নাও। (আবূ দাঊদ)

মুক্তাদী একজন কিংবা দু'জন হলে কিভাবে দাঁড়াবে?

٩٢- عَنْ جَابِرٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّى فَجِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَمِنِيْهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدِيْنَا فَدَفَعَنَا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ - رواه مسلم

৯২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। ইতোমধ্যে আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে আমাকে তাঁর পিছন দিয়ে নিয়ে এসে ডানে দাঁড় করান। তারপর জাব্বার ইব্ন সাখর আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বামপাশে দাঁড়িয়ে যান। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরে পিছনে দাঁড় করান। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইমামের সাথে যদি কেবলমাত্র একজন মুক্তাদী থাকে, তবে সে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। যদি সে ভুলবশতঃ বামদিকে দাঁড়ায়, তবে ইমাম তাকে ডান দিকে এনে দাঁড় করিয়ে দিবেন। তারপর যদি আরও একজন এসে যোগ দেয়, তবে ইমামকে আগে যেয়ে তাদেরকে পিছনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।

٩٣- عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّعِيْدَ الصَّلٰوةَ - رواه الترمذى وأبوداؤد

৯৩. হযরত ওয়াবিসা ইব্ন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায় করতে

দেখেন। তখন তিনি তাকে পুনর্বার সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যাঃ কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা কোন অবস্থায়ই জামা'আত ও সামষ্টিক সালাতের জন্য শোভন নয়। এজন্য শরী'আতে তা মাকরূহ এবং অপসন্দনীয় যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে পুনর্বার সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জ্ঞাতব্যঃ কোন ব্যক্তি যদি এসে দেখতে পায় যে, মসজিদে তার সামনের কাতার পুরা হয়ে গেছে এবং তার সাথে দাঁড়ানোর জন্য যদি কোন লোক না থাকে তবে একজন অভিজ্ঞ মুসল্লীকে পেছনে টেনে এনে দু'জনে একত্রে দাঁড়াবে। তবে শর্ত হলো, ঐ ব্যক্তি যেন সহজেই পেছনে চলে আসে। এরূপ লোক না পাওয়া গেলে একাকী দাঁড়িয়ে যাবে এবং এ অবস্থাটি আল্লাহ্‌র কাছে উযর হিসেবে গণ্য হবে।

নারীদেরকে পুরুষের এমনকি বালকদের পেছনে দাঁড়াতে হবে

٩٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا - رواه مسلم

৯৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি এবং (আমার ভাই) ইয়াতীম আমাদের ঘরে নবী করীম ﷺ এর পেছনে সালাত আদায় করি। আর (আমাদের মা) উম্মু সুলায়ম (রা) আমাদের পেছনে (সালাতে) দাঁড়িয়ে ছিলেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, জামা'আতে যদি একজন মহিলাও অংশগ্রহণ করে, তবুও তাকে পুরুষ ও বালকদের পেছনে দাঁড়াতে হবে। এমনকি সামনের কাতারে দাঁড়ানোর স্থান থাকলেও। পৃথকভাবে একাকী পেছনে দাঁড়াতে হবে। মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং উম্মু সুলায়মকে পেছনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

পূর্বে উল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, পেছনের সারিতে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা কত অপসন্দনীয় কাজ। কিন্তু পুরুষ তো দূরের কথা বালকদের সাথে মহিলাদের একত্রে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শরী'আতের দৃষ্টিতে আরও অপসন্দনীয় কাজ এবং বিপদজ্জনকও বটে। সুতরাং একজন মহিলা হলেও তাকে কেবল অনুমতি নয় বরং এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন সর্বশেষ কাতারের পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে।

ইমামত

একথা সর্বজনবিদিত যে, দীনে ইসলামে সালাতে- সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ আমল এবং এর মর্যাদা ঐরূপ যেমন মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের স্থান। এজন্য সালাতের ইমামতি বিরাট মর্যাদা ও দায়িত্বশীলতার ব্যবহার এবং এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এক প্রকার প্রতিনিধিত্বও বটে। কাজেই ইমামতির জন্য এমন লোক মনোনীত করা প্রয়োজন, যিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মর্যাদাবান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে বিবেচিত এবং যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সর্বাধিক নিকট সম্পর্ক রাখেন। কারণ তিনি দীনের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অধিক খিদ্‌মত আঞ্জাম দিয়েছেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরাধিকারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল কুরআনুল করীম, তাই যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুরআন মাজীদের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, তা মুখস্থ করে অন্তরে রেখে দেয় এবং এর দাওয়াতও সমীহত বুঝে এবং নিজে তা কার্যে পরিণত করে সে-ই প্রকৃত অর্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উত্তরাধিকারের বিরাট অংশ লাভ করেছে। সব গুণাবলীতে পিছিয়ে থাকা লোকের তুলনায় ঐ ব্যক্তি ইমামতির জন্য অধিকতর যোগ্য বিবেচিত হবেন। যদি এক্ষেত্রে সকল মুসল্লী একই মানের হন, তবে যিনি সুন্নাতের ক্ষেত্রে অধিক পারদর্শী তিনি ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। যদি এক্ষেত্রেও সবাই সমান হন, তবে যিনি অধিক আল্লাহ্ ভীরু এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী তিনি ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। যদি এ ক্ষেত্রেও সবাই সমান হন, তবে যিনি অধিক আল্লাহ্ ভীরু এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী তিনি ইমামতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন। এ বিষয়ে যদি সবাই একই মানের হন, হবে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। কারণ বয়োজ্যেষ্ঠতাও মর্যাদা নির্ণয়ের অন্যতম স্বীকৃত মাপকাঠি।

মোটকথা, ইমামতির জন্য উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ সুস্থ বিবেকের ও প্রজ্ঞার দাবি এবং এ-ই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষার দিক নির্দেশ।

ইমামতির ক্ষেত্রে উপযুক্ততার বিন্যাস

৯৫- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ

هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَلاَ يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهٖ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ – رواه مسلم ؛

৯৫. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। সেই ব্যক্তিই লোকদের ইমামতি করবে যে আল্লাহ্র কিতাব পাঠে সর্বাধিক জ্ঞাত। যদি কিরা'আত পাঠে সবাই সমান হয় , তবে যে আগে হিজরত করেছে সে ইমামতি করবে। যদি হিজরতের ক্ষেত্রেও সবাই সমান হয় , তবে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে ইমামতি করবে। তোমাদের কেউ অন্য কারো কর্তৃত্বের স্থলে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তার আসনে বসবে না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসে উদ্ধৃত اقرأهم لكتاب الله এর অর্থ হলে , "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব পাঠে সর্বাধিক জ্ঞাত।" কিন্তু কেবল কুরআন হিফ্য করা অধিক পাঠ করা এর উদ্দেশ্যে নয়। বরং এর উদ্দেশ্যে, কুরআন হিফযের সাথে সাথে কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জন এবং কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে 'কুর্রা' উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন । তাই হাদীসের মর্ম হল যে ব্যক্তি কুরআনের যত অধিক জ্ঞানের অধিকারী হবে সেই ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে যারা এ সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন তাঁরাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উত্তরাধিকারী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর সুন্নাহ্ এবং শরী'আতের জ্ঞান ছিল মর্যাদার অন্যতম মাপকাঠি। (সেকালে কুরআন-সুন্নাহয় যার দক্ষতা ছিল তিনি তার আমালকারীও ছিলেন, তার পক্ষে আমালশূণ্য হওয়ার বিষয়টি চিন্তাও করা যেত না।)

নবী যুগে মর্যাদার তৃতীয় মাপকাঠি ছিল হিজরাতের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হওয়ার বিষয়টি। তাই হাদীসে সেটিকে তৃতীয় স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এমন সময় এসে গেল যখন তাঁদের অস্তিত্ব বাকি থাকল না। তাই ফিক্হবিদগণ তাক্ওয়া পরহিযগারীকে ও মর্যাদার মানদণ্ড স্থির করেছেন এবং প্রাধান্য দিয়েছেন যা সত্যিকারভাবে তৃতীয় মাপকাঠি হওয়ার দাবি রাখে।

আলোচ্য হাদীসে প্রাধান্য প্রাপ্তির চতুর্থ মানদণ্ড হচ্ছে, বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া । তাই বলা হয়েছে, উপরে বর্ণিত তিনটি গুণের ব্যাপারে যদি সবাই সমান হয়, তবে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ,তিনি হবেন ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য।

হাদীসের শেষাংশে দু'টি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ১. যদি কেউ কারো কর্তৃত্বের এলাকায় গমন করে , তবে সে যেন ইমামতি না করে বরং তার মুক্তাদী হিসেবে সালাত আদায় করে। তবে ঐ ব্যক্তি নিজে যদি তাকে বাধ্য করেন, তবে ভিন্ন কথা, ২. যদি কেউ কারো ঘরে যায়, তবে সে যেন তার বসার নির্দিষ্ট আসনে না বসে । অবশ্য সে যদি বসায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এ দু'টি নির্দেশনার রহস্য ও কার্যকারিতা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার।

নিজেদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করবে

٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْا اَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَاِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ - رواه الدار قطنى والبيهقى (كنز العمال)

৯৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের ইমাম নিয়োগ করবে । কারণ তিনি হবেন তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রতিনিধি। (দারু কুতনী ও বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ এ কথা পরিষ্কার যে ইমাম তার অধীনস্থ লোকদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র দারবারে প্রতিনিধিত্ব করেন। জামা'আত যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তাই এ পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে একজন উত্তম ব্যক্তি নির্বাচন করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত দিন দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন, ততদিন ইমামতি করেছেন এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কে ইমামতি করার জন্য নাম ধরে নির্দেশ দেন।

হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) বর্ণিত হাদীসে ইমামতির হক্‌দার হবার ব্যাপারে যে বিস্তারিত পর্যায়ক্রমা বাতলান হয়েছে তার উদ্দেশ্যে হচ্ছে, জামা'আতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মানোনীত করা। কোন না উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اِقْرَاَهم لكتاب الله ، اعلمهم بالسنة

(তোমাদের মধ্যে যে কুরআন তারপর সুন্নাহ্‌র ব্যাপারে পারদর্শী সে ব্যক্তি ইমামতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে)

এ টি আসলে ধর্মীয় দিক থেকে মর্যাদার মাপাকাঠির ব্যাখ্যা মাত্র। আফসোস! বর্তমান সময়ে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়। ফলে উম্মাতের পুরো কাঠামো তছনছ হয়ে গেছে।

ইমামের দায়িত্ব ও জবাদিহিতা

৯৭- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُوْلٌ لِمَا ضَمِنَ وَاِنْ أَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الاَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ - رواه الطبرانى فى الاسط (كنز العمال)

৯৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাওমের ইমাম নিযুক্ত হয়, সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যেন জেনে রাখে যে, সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। যদি সে তার দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়, তবে তার পশ্চাদবর্তী মুসল্লীর সমপরিমাণ সাওয়াব সে লাভ করবে। কিন্তু তাদের সাওয়াব সামান্যও কম করা হবে না। তবে সালাতে যদি কোন ত্রুটি হয়, তবে তার দায় দায়িত্ব তারই। (তাবারানীর মু'জাম আওসাত গ্রন্থ সূত্র– কানযুল উম্মাল)

ইমাম কর্তৃক মুক্তাদীর প্রতি লক্ষ্য রাখা

৯৮- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرِ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ - رواه البخارى ومسلم

৯৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন লোকদের সালাতের ইমামতি করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ (বেশি দীর্ঘ না) করে। কেননা তাদের মাঝে অসুস্থ, দর্বল ও বয়োবৃদ্ধ লোক রয়েছে (যাদের জন্য দীর্ঘ সালাত কষ্টদায়ক হতে পারে)। তবে যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন সাহাবী তাদের মহল্লার মসজিদে সালাতের ইমামতি করতেন। ইবাদতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকায় তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। ফলে অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধ মুত্তাকীদের ভীষণ কষ্ট হত, এই ভুল সংশোধনের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ের উপর ভাষণ দেন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল ইমাম যেন তার অসুস্থ , দুর্বল ও বৃদ্ধ মুক্তাদীদের

প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ না করেন। তবে এর দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, ইমাম সর্বদা প্রত্যেক সালাতে ছোট ছোট সূরা পাঠ করবে এবং রুকু সিজ্‌দায় তিনবারের বেশি তাসবীহ্ পাঠ করবে না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ ভারসাম্য রক্ষা করে সালাত আদায় করতেন উম্মাতের জন্য তাই হচ্ছে প্রকৃত মাপকাঠি ও শ্রেষ্ঠ নমূনা। এ আলোকেই তাঁর দিকনির্দেশের মূল্যায়ন করতে হবে। সালাত আদায়ের সবিস্তার বিবরণও কিরা'আতের পরিমাণ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহ ইনশাআল্লাহ পরে বর্ণিত হবে।

٩٩- عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْمَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَ تَاَخَّرُ عَنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَالْحَاجَةِ - رواه البخارى ومسلم

৯৯. হযরত কায়স ইব্‌ন আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবূ মাসঊদ (রা) জানিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি (এবং বাধ্য হয়ে একাকী সালাত আদায় করি) তিনি জামা'আতে সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবূ মাসঊদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভাষণ দিতে যেয়ে সে দিনের ন্যায় এত বেশী ক্রুদ্ধ হতে আর কখনো দেখি নি। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে (ভুল পদ্ধতির কারণে আল্লাহ্‌র বান্দাদের) ঘৃণা উদ্রেককারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে, সে যেন সালাত সংক্ষেপ করে (অতিরিক্ত দীর্ঘ না করে)। কেননা তাদের মাঝে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমান্দ লোকও থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে দীর্ঘ সালাত আদায় করার যে অভিযোগ তা মূলত হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) সম্পর্কেই করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় একাধিক ঘটনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। হযরত মু'আয (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি সাধারণত ইশার সালাত দীর্ঘ করে আদায় করতেন। একদিন তিনি যথারীতি বিলম্বে সালাত শুরু করেন এবং

তাতে সূরা বাকারা পাঠ শুরু করেন। সাহাবীদের মধ্যে একজন (সারাদিনের ক্লান্তির কারণে) নিয়্যাত ছেড়ে দিয়ে একাকী সালাত আদায় করেন, তারপর বাড়ী চলে যান। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট পৌঁছে। তিনি মু'আয (রা) কে ধমক দিয়ে বললেন ঃ "হে মু'আয! তুমি লোকদের ফিত্নার কারণ হতে চাও এবং তাদেরকে ফিত্নার শিকারে পরিণত করতে চাও? এ হাদীসের শেষাংশে আছে তিনি তাকে বললেন ঃ "তুমি সূরা আশ্ শাম্স, আল-লায়ল, আদ্-দুহা এবং সূরা আ'লা পাঠ করবে।"

١٠٠- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَدْخُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلٰوتِىْ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهٖ مِنْ بُكَائِهٖ - رواه البخارى

১০০. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি অনেক সময় দীর্ঘ সালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে সালাত সংক্ষেপ করি। কারণ শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ বাণীর মর্ম হচ্ছে সালাত আদায়ের সময় শিশুর কান্নার শব্দ তাঁর কানে পৌঁছলে তিনি এই খেয়ালে সালাত সংক্ষেপ করতেন যাতে জামা'আতে শরীক মহিলারা কষ্টে নিঃপতিত না হয়।

١٠١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلٰوةً وَلَا اَتَمَّ صَلٰوةً مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَنْ تُفْتَنَ اُمُّهُ - رواه البخارى ومسلم

১০১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাইতে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোঁন ইমামের পেছনে কখনো আদায় করি নি। আর তা এজন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের অস্থির হয়ে পড়ার (ও তার সালাত নষ্ট হওয়ার) আশংকায় সংক্ষেপ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ একজন ইমামের বিশুদ্ধ মাপকাঠি ও পথ নির্দেশিকামূলক নীতি এই হওয়া উচিত যে, তার সালাত হবে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ তিনি যাবতীয় রুক্ন-শর্ত এবং সুন্নাত মুতাবিক সালাত আদায় করবেন। এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।

মুক্তাদীর প্রতি নির্দেশক

١٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُبَادِرُوْ الاِمَامَ اِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوْا وَاِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ وَلاَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ – رواه البخارى

১০২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইমামের থেকে আগে বেড়ে যেও না (বরং তার অনুগামী হবে) সে তাক্‌বীর বললে তোমরাও তাক্‌বীর বলবে। সে 'ওয়ালাদ্‌দাল্লীন' বললে তোমরা 'আমীন' বলবে। সে রুকূ করলে তোমরা রুকূ করবে। সে 'সামি আল্লাহ্ লিমান হামিদা' বললে তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বান্না লাকাল হামদ' বলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সালাতের সকল কাজে ইমামের অনুসরণে মুক্তাদী পশ্চাদ্‌বর্তী থাকবে এবং কোন কাজে ইমামের অগ্রবর্তী হবে না।

মুসনাদে বায্‌যারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠায়, তার ললাট প্রকারান্তরে শয়তানের হাতে থাকে এবং শয়তানই তাকে এরূপ করায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে এও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে রুকূ অথবা সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠায় তার জন্য এ আশংকা রয়েছে যে, তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা পানাহ দিন।

١٠٣- عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ وَالاِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الاِمَامُ – رواه الترمذى

১০৩. হযরত আলী ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সালাত আদায় করতে এসে ইমামকে কোন এক অবস্থায় পেলে। ইমাম যেরূপ করে সেও যেন তদ্রুপ করে। (তাকে রুকূ, সিজ্‌দা ইত্যাদি অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় তার সাথে সালাতে অংশগ্রহণ করবে)। (তিরমিযী)

١٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهُ شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ - رواه أبوداؤد

১০৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি সালাতে এসে আমাদেরকে সিজ্‌দারত পাও, তবে সিজ্‌দা করে নিবে কিন্তু তা (রাকা'আত হিসেবে) গণনা করবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) রুকূ পেল সে সালাতের (ঐ রাক'আত) পেল। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে শরীক হয় এবং রুকূ পায়, তবে সে যেন এক রাকা'আত সালাত পেল। পক্ষান্তরে সিজ্‌দার পেলে আল্লাহ্ তার পূর্ণ সাওয়াব দিবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সিজ্‌দা (এক রাক'আত) হিসেবে গণ্য হবে না।

সালাত কীরূপে আদায় করবে?

١٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرْجَعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الَّتِىْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اَرْفَعَ حَتّٰى جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا - رواه البخارى ومسلم

১০৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল আর তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক প্রান্তে বসা ছিলেন। লোকটি সালাত আদায় করল। তারপর এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তার সালামের

জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি চলে যাও এবং সালাত আদায় করে এসো, কেননা তুমি (সঠিকভাবে) সালাত আদায় করনি। লোকটি চলে গেল এবং সালাত আদায় করল। এরপর এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি যাও এবং পুনর্বার সালাত আদায় করে এসো, কেননা তুমি তো সঠিকভাবে সালাত আদায় করনি। তৃতীয়বার অথবা এর পরের বার লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কিভাবে সালাত আদায় করব সে বিষয়ে আমাকে অবহিত করুন (কেননা আমি যেভাবে জানি, যেভাবেও কয়েকবার আদায় করেছি) । তিনি বললেন ঃ তুমি সালাতে দাঁড়াবার প্রাক্‌কালে উত্তমভাবে উযূ করে নিবে। এরপর কিব্‌লামুখী হয়ে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলে সালাত শুরু করবে। এরপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার পক্ষে সহজ ততটুকু পাঠ করবে (কোন কোন বর্ণনায় আছে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং এর সাথে যা ইচ্ছা পাঠ করবে) তারপর রুকূ করবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ আদায় করবে। এরপর রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজ্‌দা করবে যাতে সিজ্‌দার প্রশান্তি আসে। এরপর সিজ্‌দা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজ্‌দায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজ্‌দা করবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তারপর রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর পুরা সালাত এভাবে (রুকূ, সিজ্‌দা, কাওমা, জালসাসহ সব রকম ধীরস্থিরভাবে) আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হচ্ছেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত রিফয়া ইব্‌ন রাফি (রা) এর ভাই খাল্লাদ ইব্‌ন রাফি (রা)। সুনানে নাসায়ীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি মসজিদে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন। কোন কোন ভাষ্যকার লিখেন, সম্ভবত এই দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত ছিল। কিন্তু তিনি এত তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করেন যে, রুকু ও সিজ্‌দা যেরূপ ধীরস্থিরভাবে আদায় করা উচিত ছিল তিনি ঠিক সেভাবে আদায় করেন নি। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "তুমি যথাযথভাবে সালাত আদায় করনি।" কাজেই তিনি পুনর্বার সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন।

তিনি প্রথমবারেই পরিষ্কার করে একথা বলেন্ নি যে. "তোমার সালাতে এই ভুল হয়েছে এবং তুমি এভাবে সালাত আদায় কর।" বরং তিনি তৃতীয় কিংবা চতুর্থবারে জিজ্ঞাসার জবাবে তার ভুল সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, প্রত্যেক জ্ঞানবানই জানে যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। কাউকে যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত এই পন্থায় কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে পুরা জীবনেও সে তা ভুলবে না এবং অপরাপর লোকের মধ্যেও এর ব্যাপক

চর্চা হবে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রুকূ,দাঁড়ানো ও সিজ্‌দা অবস্থায় কী পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে তিনি দিক নির্দেশনা দেন নি, এমনকি শেষ বৈঠক, তাশহ্‌হুদ ও সালামের বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়ে তিনি হয়ত ঐ ব্যক্তির জানা থাকায় পূণর্ব্যক্ত করেন নি। তবে বিশেষত তার যে ভুল পরিলক্ষিত হয়েছিল তা ছিল মূলত রুকূ, সিজ্‌দা ও ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায়ের বিষয়ে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধনের নির্দেশ দেন।

হাদীসের শেষ অংশ নিয়ে বর্ণনাকারীদের মধ্যে খানিকটা দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, দ্বিতীয় সিজ্‌দা থেকে তাকে উঠার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ "তুমি উঠ এবং ধীরস্থিরভাবে বসো।" অন্যান্য বর্ণনায় আছে, তারপর তুমি উঠ এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।" এ দু'টি বর্ণনাই ইমাম বুখারী (র) স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। প্রথম তৃতীয় রাক'আতে দুই সিজ্‌দার পর দাঁড়ানোর পূর্বে কিছুক্ষণ বসার জাল্‌সায়ে ইস্তিরাহাত বা আরামের বৈঠকের পক্ষে যে সব আলিম পোষণ করেন তাঁরা প্রথম রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞগণ দ্বিতীয় বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তবে এই হাদীসের বিশেষ দিক নির্দেশনা হচ্ছে এই যে, পূর্ণ সালাত ধীরস্থিরভাবে আদায় করা উচিত। কেউ যদি এমন তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করে যে, সালাতে তার রুকনসমূহ পুরোপুরি আদায় না হয় উদাহরণস্বরূপ রুকূ-সিজ্‌দায় শুধু উঠা-বসা এবং যতক্ষণ বিরতি প্রয়োজন তা না হয়, তবে এ ধরনের সালাত অগ্রহণযোগ্য এবং তা পুনর্বার আদায় করা ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে সালাত আদায় করতেন ?

١٠٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاْءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذَالِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السِّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ

يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى اَنْ يَّفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ – رواه مسلم

১০৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাক্‌বীর দ্বারা সালাত এবং আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) দ্বারা কিরা'আত আরম্ভ করতেন। যখন রুকূ' করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক উঠিয়েও রাখতেন না, ঝুঁকিয়েও রাখতেন না বরং মাঝামাঝি রাখতেন। আর যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজ্‌দায় যেতেন না। তিনি প্রতি দুই রাক'আতে 'আত-তাহিয়্যাতু' (তাশাহুদ) পাঠ করতেন। তখন তিনি বাম পা বিছিয়ে রাখতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি শয়তানের মত নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করতেন। পুরুষকে তার (কনুই পর্যন্ত) দুই হাত হিংস্র জন্তুর মত বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি সালামের দ্বারা সালাত শেষ করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। তাই এর জন্য দাঁড়ানো, বসা, রুকূ-সিজ্‌দা ইত্যাদির নিয়ম নির্দিষ্ট করা হয়েছে যা এ ইবাদাতে পূর্ণতার সর্বোত্তম চিত্র। বিশেষতঃ অহমিকা, বে-পরোয়াভাব, দৃষ্টিকটু এবং অশোভন হিংস্র জন্তুর সাথে সাদৃশ্য ইত্যাকার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কুকুর, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি হিংস জন্তুর, ন্যায় নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে 'শয়তানের ন্যায়' এবং অন্য হাদীসে কুকুরের ন্যায় বসতে নিষেধ করেছেন। ভাষ্যকার ও ফিক্‌হবিদগণ এর দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অধমের (গ্রন্থকার) নিকট দু' পায়ের পাঞ্জা খাড়া রেখে গোড়ালীর উপর বসা পদ্ধতিটি প্রাধান্য পাবার দাবি রাখে। বলাবাহুল্য, এ অবস্থাটি কিছুটা অহমিকাবোধ ও তাড়াহুড়ার লক্ষণ বটে। এ পদ্ধতিতে কেবল হাঁটু ও হাতের তালু মাটিতে লাগে। কুকুর, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী নিতম্বের উপর ভর করে বসে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে এরূপ বসতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত পদ্ধতি কেবলমাত্র উযরবিহীন অবস্থান কার্যকর। তবে কারো যদি কোন উযর থাকে, তবে তা উযর হিসেবেই গণ্য হবে এবং তা মাকরূহ নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর পায়ে আঘাত থাকায় তিনি মাসনূন পদ্ধতিতে বসতে পারতেন না। কাজেই কখনো কখনো তিনি এরূপ বসতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ ধরনের বসাকে "তোমাদের নবীর সুন্নাত" বলে আখ্যায়িত করেছেন। একথার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো উযরবশত হয়ত বা এরূপ বসে থাকবেন। অন্যথায় উযরবিহীন অবস্থায় সালাতে এরূপ বসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

١٠٧- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ فِىْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَحْفَظُكُمْ لِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُهُ اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ اسْتَوَا حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَنَصَبَ الْاُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ - رواه البخارى

১০৭. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একদল সাহাবীসহ আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) বলেন ঃ আমি আপনাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সালাত অধিক স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি যখন তাক্বীরে তাহ্রীমা বলতেন তখন দু'হাত দু'কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন রুকূ' করতেন দু'হাত দ্বারা দু'হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠকে কোমর ও ঘাড়ের সোজা রাখতেন। আর যখন মাথা উঠাতেন ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। যাতে (পিঠের) প্রত্যেকে গ্রন্থি স্ব-স্ব-স্থানে পৌঁছে যায়। তারপর যখন সিজ্দা করতেন তখন দু'হাত যমীনে না বিছিয়ে ও পেটের সাথে না মিশিয়ে (চেহারার পাশে রেখে কনুই উঁচু করে) এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ কিবলামুখী করে রাখতেন। এরপর দুই রাক'আতের পর নিজের বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এরপর শেষ রাক'আতে বাম পা বাড়িয়ে দিতেন, অপর পা খাড়া রাখতেন এবং নিতম্বের উপর বসতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) বর্ণিত হাদীসে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় কাঁধ বরাবর হাত উঠানোর কথা উল্লিখিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম মালিক ইব্‌ন্ হুয়াইরিস (রা) নামে এক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, " حتى يحاذى بها اذنيه " "তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় তিনি তাঁর হাত উভয় কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন"। কিন্তু এ দুই বক্তব্য পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কেননা যখন হাত কানের লতি বরাবর ওঠানো হয় তখন হাতের নিম্নভাগ মূলত কাঁধের বরাবর থাকে এবং পদ্ধতিকে কান পর্যন্ত আবার কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোও বলা যেতে পারে।

ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজর (রা) নামে এক সাহাবী এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন। সুনানে আবূ দাউদে নিম্নবর্ণিত শব্দযোগে তার ভাষ্য বিবৃত হয়েছে ঃ

" رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى ابْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ "

"তিনি তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় তাঁর হাত এত দূর উঠাতেন যে, তা কাঁধ বরাবর হয়ে যেত এবং বৃদ্ধ আঙ্গুল দু'টি কান বরাবর করতেন।"

হযরত আবূ হুমায়দ সাঈদী (র) বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বৈঠকে 'তাওয়াররুক' পদ্ধতিতে বসতেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত পূর্বে উল্লিখিত হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) এর হাদীসে প্রথম বৈঠক বসার যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যাকে 'ইফ্‌তিরাশ' বলে। তিনি সাধারণত শেষ বৈঠকে অনুরূপ বসতেন। কিছু সংখ্যক আলিম এবং ভাষ্যকার বলেন, হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে ঠিক যেভাবে বসতেন। কিন্তু কখনো সহজ আবার কখনো জায়িয একথা বুঝানোর লক্ষ্যে তিনি 'তাওয়াররুক' করতেন। দ্বিতীয় অভিমত প্রথম অভিমতের সম্পূর্ণ উল্টা। আবার এও বলা যেতে পারে যে, উভয় পদ্ধতিই শরী'আতে স্বীকৃত।

কতিপয় বিশেষ যিক্‌র ও দু'আ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের বিভিন্ন অংশ যেমন দাঁড়ানো (কিয়াম) রুকূ এবং সিজ্‌দা অবস্থায় যে সকল বাক্যযোগে আল্লাহ্‌র গুণাগুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করতেন এবং যে সব দু'আ করতেন (যার কিছু সংখ্যক ইনশাআল্লাহ্ পাঠকগণ পরবর্তী হাদীস থেকে জানতে পারবেন) সে সবের কতিপয় বিশেষ যিক্‌র যা পাঠে অন্তরে এক বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হয় তা-ই হচ্ছে মূলতঃ সালাতের হাকীকত ও প্রাণ। এ হাদীসগুলো এ দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত অবস্থা অন্তরে সৃষ্টির লক্ষ্যে দু'আ পাঠ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই মহাসম্পদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তারাধিকার।

١٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَأَةِ اِسْكَاتَةً فَقُلْتُ يَابِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَأَةِ مَا تَقُوْلُ ؟ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ - رواه البخارى ومسلم

১০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের তাক্বীরে তাহ্‌রীমা বলে কিরা'আত পাঠ করার পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব (চুপি চুপি কিছু পড়তেন) থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোন, আপনি তাক্বীরে তাহ্‌রীমা ও কিরা'আতের মাঝে নীরব থেকে কী পাঠ করেন তা আমাকে অহিত করুন। তিনি বললেন, আমি বলি–

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَاىَ كَمَا يُنَقِّىْ الثَّوْبُ الاَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ-

"হে আল্লাহ্! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ তুমি ব্যবধান করে দিয়েছ পূর্বও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেরূপ পরিষ্কার করা হয়ে থাকে সাদা কাপড় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার পাপসমূহকে ধুয়ে ফেল বরফ, পানি ও শিলা (বৃষ্টির ন্যায় স্বচ্ছ পানি) দ্বারা"। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও যাবতীয় পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে পূতঃ পবিত্র ছিলেন। তথাপি আল্লাহ্‌র পরম নৈকট্য লাভের পরম আগ্রহ এবং মানবিক বিচ্যুতি ও পদস্খলন থেকে সর্বতোভাবে সংরক্ষিত থাকার লক্ষ্যে যাতে উত্তম মর্যাদার পরিপন্থী কিছু সংঘটিত না হয় এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ না ঘটে সে জন্য সদা সতর্ক থাকতেন। তাই তো বলা হয় قریبا رابیش بود এবং جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے حیرانی "যার মর্যাদা যত বেশী, তার পেরেশানী তত বেশী।" মোটকথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিভিন্ন দু'আয় যে خطایا অথবা ذنوب শব্দ এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এরূপ মানবিক পদস্খলন ও বিচ্যুতি। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য হাদীসে যে দু'আ উল্লিখিত হয়েছে তার মূলকথা হচ্ছে এই যে, হে আল্লাহ্ ! প্রথমত তুমি আমাকে পাপাচার থেকে এই পরিমাণ দূরে রাখ যতদূর ব্যবধান রয়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিমের এবং পশ্চিম থেকে পূর্বের। মানবিক দুর্বলতা বশতঃ যদি আমা হতে কোন প্রকার ত্রুটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তবে তুমি তা ক্ষমা করে দিয়ে তার দাগ এ ভাবে দূর করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা দূর করে ধবধবে সাদা করা হয়। আর নিজ রহমতের শীতল পানি দ্বারা আমার অভ্যন্তর ভাগ ধুয়ে দাও যাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে সৃষ্ট তোমার ক্রোধের আগুন শীতল হয়ে যায় এবং তার স্থলে আমার অন্তরে তোমার সন্তুষ্টির শীতলতা ও প্রশান্তি নসীব হয়।

এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাক্বীরে তাহ্রীমা ও কিরা'আত পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে কখনো কখনো এই দু'আ পাঠ করতেন।

١٠٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ - رواه الترمذى وأبوداؤد

১০৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন বলতেন-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ্! তুমি মহাপবিত্র, তোমার জন্যই প্রশংসা, তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।" (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাফিয মাজদুদ্দীন ইব্ন তাইমিয়া (র) 'মুন্তাকা' গ্রন্থে সুনানে সাঈদ ইব্ন মানসূরের বরাতে হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে, সহীহ্ মুসলিমের বরাতে হযরত উমর (রা) সম্পর্কে এবং দারু কুতনীর বরাতে হযরত উসমান ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা সকলেই তাক্বীরে তাহ্রীমার পর سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ পাঠ করতেন। তাঁদের এ আমল থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাক্বীরে তাহ্রীমার পর সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ পাঠ করতেন। তাই হাদীসে উদ্ধৃত অপরাপর দু'আ পাঠ করার

তুলনায় এ দু'আ পাঠ করাই উত্তম। যদিও আপরাপর বিশুদ্ধ দু'আ পাঠ করাও সঠিক। যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত اَللّٰهُمَّ " بَاعِدْ بَيْنِى " দু'আ এবং হযরত আলী (রা) কর্তৃক পাঠকৃত দু'আ যা সামনের হাদীসে আসবে।

١١٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيَ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَطَرَالسَّمٰوَاتِ وَالارْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لاَحْسَنِ الاَخْلاَقِ لاَ يَهْدِىْ لاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ ، لَبَيَّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَابِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ ، وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ، فَاِذَا رَفَعَ رَاسَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأَالسَّمٰوَاتِ وَالارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَاِذَا سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، ثُمَّ يَكُوْنَ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ - رواه مسلم-

১১০. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাক্বীরে তাহ্রীমা বলতেন। তারঃপর তিনি " وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰاتِ والارض حنيفا وما انا من المشركين

বলতেন ঃ "আমি এক নিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ করছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এ জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণ কারীদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ্! তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তুমি আমার প্রতিপালক আর আমি তোমার দাস, আমি আমার নিজের উপর যুলম করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অপর কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না, তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের উপর পরিচালিত কর। কেননা তুমি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি পাপ কাজ থেকে আমাকে দূরে রাখ। তমি ব্যতীত কেউ আমাকে তা থেকে দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত আছি এবং তোমার নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত আছি। সার্বিক কল্যাণ তোমারই হাতে নিবদ্ধ এবং কোন অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি বরকাতময়, তুমি সুউচ্চ মহান, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার অভিমুখী হচ্ছি।

যখন তিনি রুকূ' করতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রুকূ করছি এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করছি। তোমার নিকট অবনমিত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার হাড় মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা উপশিরা। এরপর যখন মাথা উঠাতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক! তোমার এমন প্রশংসা যা দিয়ে আসমান ও যমীনসমূহ এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেই পরিপূর্ণ। যখন সিজ্‌দা করতেন তখন বলতেন ঃ " হে আল্লাহ্ আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করছি এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করছি। আমার চেহারা তাঁকেই সিজ্‌দা করল যিনি তার স্রষ্টা, দান করেছেন উত্তম আকৃতি এবং কান ও চোখ। বরকতময় আল্লাহ্-শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা"। এর পর সর্বশেষে তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝে যা পাঠ করতেন তা এই যে, "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করব এবং যা আমি গোপনে করেছি আর যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি সীমাতিক্রম করেছি আর যা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ; তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।"(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাত সম্পর্কীয় সমস্ত হাদীস পাঠ করে জানা যায় যে হযরত আলী (রা) এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাতের যে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন এবং রুকূ, সিজ্‌দা, কিয়াম ইত্যাদি অবস্থায় পঠিতব্য দু'আর যে বিবরণ দিয়েছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রাত্যহিক ফরয সালাতের পঠিত ধারাবাহিক দু'আ ছিল না। বরং তিনি কখনো কখনো এরূপ দু'আ করে থাকবেন। আর এটাও সম্ভব যে , তিনি তাহাজ্জুদ সালাতে এরূপ পাঠ করতেন । ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তাহাজ্জুদ সালাতের ধারাবাহিকতায়ই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যে সব দু'আ বর্ণিত হয়েছে তা থেকে কিছুটা হলেও অনুমান করা যায় যে, সলাতরত অবস্থায় তাঁর অন্তরের অবস্থা কিরূপ হতো এবং কত একাগ্রতা সহকারে তিনি সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসবের কিঞ্চিৎ হলেও নসীব করুন। সালাতে বিশেষত তাহাজ্জুদ সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আরো বহু দু'আ পাঠের বিষয় প্রমাণিত। ইনশা'আল্লাহ্ সে বিষয় যথা স্থানে বর্ণনা করা হবে। এসব দু'আয় এক ধরনের প্রাণ রয়েছে। যদি এ বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ফরয সালাতে এসব দু'আ পাঠ করলে মুক্তাদীরা বিরক্তভাব দেখাবে না তাহলে ইমামের এসব দু'আ পাঠ করতে পারেন। নফল সালাতে এসব অবশ্যই এসব দু'আ পাঠ করা উচিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

" وَ فِىْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ "

"এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" (৮৩, সূরা মুতাফ্‌ফিফীনঃ ২৬)

সালাতে কিরা'আত পাঠ

কিয়াম, রুকূ ও সিজ্‌দার ন্যায় কিরা'আত পাঠও সলাতের অপরিহার্য মৌলিক বিষয়। আর তা কিয়াম অবস্থায় পাঠ করা হয়। একথা সর্বজন বিদিত যে, কিরা'আতের বিন্যাস হচ্ছে এরূপ ঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলার পর হামদ্-সানা, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা এবং নিজ দাসত্ব প্রকাশের কোন বিশেষ পূর্বোল্লিখিত তিন মাসূরা দু'আর কোন একাটি দু'আ করে আল্লাহ্ সমীপে নিজকে পেশ করতে হবে। এর পর কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করতে হবে যাতে আল্লাহ্‌র গুণ কীর্তন বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর গুণবাচক নাম এবং বিশেষ অর্থবোধক বাক্যমালা স্থান পেয়েছে। এতে সর্ববিধ শিরক অস্বীকার করে তাওহীদের স্বীকৃতি রয়েছে। সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল প্রতিষ্ঠিত পথ প্রাপ্তির

লক্ষ্যে বিনয় ও নম্রভাব প্রকাশ করে আবেদন করা হয়েছে। মোটকথা, সালাতে সর্বদাএ সূরা (আল-ফাতিহা) পাঠ করা হয়। এ সূরায় আল্লাহ্‌র বিশেষ মাহাত্ম্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পাওয়ায় এ সূরার পাঠ আবশ্যিক করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, এ সূরা ব্যতীত সালাত (পূর্ণাঙ্গ) হয় না। এ সূরা পাঠের পর মুসল্লীকে এমর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ,সে যেন এ সূরার সাথে অন্য কোন সূরা কিংবা কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে নেয়। কেননা তাতে তার হিদায়াতের কোন না কোন দিক নির্দেশনা অবশ্যই থাকবে। হয়ত বা তাতে আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা স্থান পাবে অথবা আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, সৎকাজ ও অসৎকাজের পুরস্কার ও শাস্তির বিষয় স্থান পাব অথবা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কোন্ বিষয়ের আলোচনা থাকবে অথবা কোন শিক্ষণীয় বিষয় স্থান পাবে। মোদ্দাকথা, পাঠকের জন্য কোন না কোন নির্দেশনা অবশ্যই থাকবে। এ যেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিদায়ত প্রাপ্তির দু'আর اهْدِنَا। الصراط المستقيم। তাৎক্ষণিক জবাব যা তার মুখ থেকে বেরুচ্ছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর কোন না কোন সূরা অথবা আয়াত পাঠ করা হবে। সালাত যদি তিন অথবা চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। কিন্তু এর সাথে অন্য কোন সূরা মিলানোর কোন প্রয়োজন নেই এ কেবল ফরয সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । সুন্নাত বা নফল সালাতের সকল রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা কিংবা আয়াত পাঠ করা জরুরী।

এ ভূমিকা পাঠের পর নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যাক, যার মধ্যে কতিপয় হাদীসে সালাতে কিরা'আত সম্পর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে চাইতে বড় কথা হল, সালাতে কিরা'আত পাঠের বিষয়ে তাঁর আমলের বর্ণনা স্থান পেয়েছে, কোন্ সালাতে তিনি কী পরিমাণ কিরা'আত পাঠ করতেন এবং কোন্ কোন্ সূরা তিনি বেশি বেশি পাঠ করতেন তাও স্থান পেয়েছে।

١١١- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةٍ ، قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ فَمَا اَعْلَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَنَّاهُ وَمَا اَخْفَاهُ اَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ – رواه مسلم

১১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিরা'আত ছাড়া সালাত আদায় হয় না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সালাতে জোরে কিরা'আত পাঠ করেছেন, তোমাদের জন্য আমরা তা জোরে আদায় করি এবং যে সালাতে চুপিচুপি কিরা'আত পাঠ করেছেন আমরাও তোমাদের জন্য তা চুপিচুপি আদায় করি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে সালাতে কোন নির্দিষ্ট সূরা পাঠের বিষয় উল্লিখিত হয়নি বরং সাধারণভাবে কিরা'আত পাঠকে সালাতের রুক্ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব সালাতে এবং যে সব রাক'আতে জোরে কিরা'আত পাঠ করতেন, আমরাও সে সব সালাতে ও রাক'আতে জোরে কিরা'আত পাঠ করি এবং যেসব সালাতে ও রাক'আতে তিনি চুপিচুপি কিরা'আত পাঠ করতেন, আমরাও সেসব সালাতে ও রাক'আতে চুপিচুপি কিরা'আত পাঠ করি।

١١٢– عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ – رواه البخارى ومسلم (وفى رواية لمسلم لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا)

১১২. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত আদায় হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

তবে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে কিছু পাঠ করে না তার সালাত আদায় হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ আবশ্যিক অঙ্গ। এরপর কুরআন মাজীদের অন্য কোন সূরা কিংবা আয়াত পাঠ করাও জরুরী। তবে এতে ব্যাপক স্বাধীনতা রয়েছে, কারণ যেখান থেকে ইচ্ছা তা পাঠ করা যেতে পারে।

সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত

বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে ইমাম শাফিঈ এবং আরো কতিপয় ইমাম এই হাদীস এবং অনুরূপ হাদীসের আলোকে মনে করেন যে, মুসল্লী একা হোক, কি ইমাম হোক কিংবা মুক্তাদী হোক, জোরে কিরা'আত সম্পন্ন সালাত হোক কি চুপিচুপি আদায়যোগ্য সালাত হোক সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

ইমাম মালিক ও ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) এবং আরো কতিপয় আলিম আলোচ্য হাদীস এবং এ বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীস বিবেচনা করে মত

প্রকাশ করেন যে, মুসল্লী যদি মুক্তাদী হয় এবং সালাতের কিরা'আত যদি জোরে পাঠযোগ্য হয়, তবে ইমামের কিরা'আত মুক্তাদীর পক্ষে যথেষ্ট হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় মুক্তাদীর কিরা'আত পাঠের প্রয়োজন নেই। অপরাপর অবস্থাসমূহে মুসল্লীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরুরী।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও এ অভিমতের প্রবক্তা। তবে তিনি আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেন, নিঃশব্দ কিরা'আত সম্বলিত সালাতেও ইমামের কিরা'আত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। উল্লিখিত ইমামগণ যে সকল দলীলের ভিত্তিতে উপরিবর্ণিত অভিমত পোষণ করেন, তন্মধ্যে একটি হাদীস ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

١١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا - رواه أبوداؤد والنسائى وابن ماجة

১১৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয় অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং ইমাম তাক্‌বীর বললে তোমরাও তাক্‌বীর বলবে। তবে ইমাম যখন কিরা'আত পাঠ করে তখন তোমরা নীরব থাকবে। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ ইমামের কিরা'আত পাঠের সময় মুক্তাদীর নীরবে কিরা'আত শুনার বিষয়টি সম্পর্কে যে নির্দেশন এসেছে হুবহু সে শব্দমালাসহ অন্যান্য কতিপয় সাহাবীও তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন, সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর কোন এক ছাত্রের প্রশ্নের জবাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই নির্দেশনার মূলে রয়েছে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَاِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়ে তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে এবং নিশ্চুপ হয় থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়"। (৭, সূরা আরাফঃ ২০৪) ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) শব্দহীন কিরা'আত সম্বলিত সালাতেও ইমামের কিরা'আত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট বলে অভিমত পোষণ করেন। তার সপক্ষে বিশেষভাবে তিনি হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেন।

এই হাদীস ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম তাহাভী, দারু কুতনী প্রমুখ ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকে সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ এর এক রিওয়ায়াতে নিম্নোক্ত শব্দ যোগে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الاِمَامِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ

"জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে, ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত।"

জ্ঞাতব্য ঃ ইমামের পেছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরূরী কিনা এ বিষয়টি ঐ সব বিতর্কিত বিষয়ের অন্যতম। যাকে কেন্দ্র করে বর্তমান শতাব্দীতে উভয়পক্ষে শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে কিন্তু সংখ্যক কতিপয় বিশেষজ্ঞ এর সুক্ষ্মাতিসূক্ষ বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ। কিন্তু মা'আরিফুল হাদীস যে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে প্রণীত, তাতে এহেন মতভেদজনিত বিষয় কেবল অপ্রয়োজনীয় নয় বরং কোন কোন দিক থেকে ক্ষতিকরও বটে। এধরনের মতভেদজনিত মাসআলার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক প্রবীন ইমামের প্রতি সুধারণা পোষণ করা চাই, অন্তর থেকে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা চাই এবং তাঁদের এভাবে মূল্যায়ন করা উচিত যে প্রত্যেকেই কুরআনও সুন্নাহ্ এবং সাহাবা কিরামের কর্মধারার উপর গভীর গবেষণা করার পর তাঁদের কাছে যা অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য মনে হয়েছে তাঁরা তা ভাল উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের কেউই মিথ্যাশ্রয়ী নন। তবে উম্মাতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষাকল্পে মূর্খতা , প্রবৃত্তির দাসত্ব ও ফিতনার সয়লাবের এই যুগে কোন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমল করা বাঞ্ছনীয়। মোটকথা মা'আরিফুল হাদীস গ্রন্থে তর্ক-সমালোচনা থেকে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র শোকর, পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও আস্থার সাথে অধম (গ্রন্থকার) এই অভিমত পেশ করছে যে, গোটা ভারত উপমহাদেশের গর্বের ধন ও মহান শিক্ষক হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্(র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে মতভেদ জনিত মাসআলার যে ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দিয়েছেন। বর্তমানে যুগে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে তাই আবার ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

ফজরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিরা'আত

١١٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَنَحْوِهَا وَكَانَتْ صَلٰوتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا - رواه مسلم

১১৪. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতে সূরা কাফ কিংবা অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। পরে তাঁর সালাত সংক্ষিপ্ত হতো। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাখ্যাকারগণ হাদীসের শেষ অংশের দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১. ফজরের সালাত ব্যতীত তাঁর অপরাপর সালাত যথাক্রমে যুহর, আসর মাগরিব ও এশা সংক্ষিপ্ত ও হাল্‌কা হতো এবং ফজর ব্যতীত এসব সালাতে কম কিরা'আত পাঠ করতেন। ২. প্রাক ইসলামী যুগে যখন সাহাবীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে বিশেষত প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ জামা'আতে শরীক হতেন, তাই স্বভাবত তিনি সালাত দীর্ঘ করতেন। তারপর যখন মুসল্লী সংখ্যা বেড়ে গেল এবং তাদের মধ্যে দ্বিতীয় -তৃতীয় মর্যাদার মু'মিনগণ শরীক হতে লাগল তখন তিনি তুলনামূলকভাবে সালাত সংক্ষিপ্ত ও হাল্‌কা করতে লাগলেন। জামা'আতে মুসল্লী সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাওয়ার ফলে এই আশংকা দেখা দেয় যে, তাদের মধ্যে কতিপয় রোগী , দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ হতে পারে , যাদের জন্য দীর্ঘ কিরা'আত খুব কষ্টকর। যদিও উভয় ব্যাখ্যাই বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিক। তথাপি অধমের ধারণায় দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী।

١١٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ - رواه مسلم

১১৫. আম্‌র ইব্‌ন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) কে ফজরের সালাতে সূরা " وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ " আত্ তাকব্বীর পাঠ করতে শুনেছেন। (মুসলিম)

١١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى النَّارُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ عِيْسٰى اَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ - رواه مسلم

১১৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন এবং (তাতে) সূরা। আল-মু'মিনূন পাঠ করেন। যখন মূসা ও হারূন (আ) অথবা ঈসা (আ) এর উল্লেখ সম্পর্কিত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাশিএলো , ফলে তিনি রুকূতে চলে যান। (মুসলিম)

١١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدْ - رواه مسلم

১১৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (একবার) ফজরের সালাতের দুই রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আল কাফিরূন ও সূরা ইখ্লাস তিলাওয়াত করেন। (মুসলিম)

١١٨- عَنْ مَعَاذِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىِّ قَالَ اِنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِىْ الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَةُ فِى الرَّكَعَتَيْنِ كِلْتَهِمَا فَلاَ اَدْرِىْ اَنَسِىَ اَمْ قَرَأَ ذَالِكَ عَمَدًا - رواه أبو داؤد

১১৮. হযরত মু'আয ইব্ন আবদুল্লাহ্ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জুহাইনা গোত্রের জনৈক লোক তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ফজরের উভয় রাক'আতে সূরা যিলযাল পাঠ করতে শুনেছেন। তবে (তিনি আরো বলেন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে এরূপ করেছিলেন না স্বেচ্ছায় এরূপ করেছিলেন তা আমি বলতে পারি না। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী দুই রাক'আতে পৃথক পৃথক দু'টি সূরা পাঠ করতেন। তাই যখন তিনি একবার উভয় রাক'আতে সূরা যিলযাল পাঠ করেন তখন সাহাবীর সন্দেহ হয় যে, তিনি ভুলে এরূপ করেছেন, না এরূপ করাও জায়িয আছে, একথা লোকদের অবহিত করার জন্য স্বেচ্ছায় এরূপ করেছেন।

١١٩- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَااُنْزِلَ اِلَيْنَا وَالَّتِىْ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ « قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ »- رواه مسلم

১১৯. ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ফজরের দুই রাক'আতে সূরা বাকারা قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَااُنْزِلَ اِلَيْنَا الخ এবং সূরা আলে ইমরানে قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الخ পাঠ করতেন। (মুসলিম)

١٢٠- عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ لِرَسُوْلِ للّٰهِ ﷺ نَاقَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لِى يَاعُقْبَةُ اَلا اُعَلِّمُكَ خَيْرًا سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِى قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - قَالَ فَلَمْ يَرَنِى سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحُ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ الْتَفَتَ اِلَىَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ - رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى

১২০. উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটের লাগাম ধরে চলছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উক্‌বা! আমি কি তোমাকে দু'টি উত্তম সূরা শিক্ষা দিব না, যা পাঠ করা হয়? তারপর তিনি আমাকে সূরা 'ফালাক' এবং সূরা 'নাস' শেখালেন। কিন্তু এতে আমি তেমন সন্তুষ্ট হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। এরপর যখন তিনি ফজরের সালাত আদায়ের জন্য আসেন তখন এই দু'টি সূরা দ্বারা আমাদের সালাতের ইমামতি করেন। সালাত শেষে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেনঃ হে উক্‌বা! কী দেখলে, কেমন মনে হলো? (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)

١٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالم تَنْزِيْل فِى الرَّكْعَةِ الاُوْلَى وَفِى الثَّانِيَةِ هَلْ اَتَى عَلَى الاِنْسَانِ - رواه البخارى ومسلم

১২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের সালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা আস-সাজ্‌দা এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা আদ-দাহ্‌র পাঠ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতে যে সব কিরা'আত পাঠ করতেন সে ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে সব বর্ণনা এসেছে এবং এছাড়াও হাদীস গ্রন্থসমূহে যে সকল রিওয়ায়াত পাওয়া যায় সে সবকে সামনে রাখলে মনে হয় যে, তিনি অন্যান্য সালাতের তুলনায় ফজরের সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি ফজরের সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখ্‌লাস, আবার কখনো সূরা ফালাক ও নাস এর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরাও পাঠ করতেন। এভাবে আলোচ্য হাদীসসমূহ থেকে এও জানা যায় যে, তিনি সাধারণত প্রত্যেক রাক'আতে পৃথক পৃথক সূরা পাঠ করতেন। কিন্তু কখ্‌নো কখনো এরূপ

হতো যে, কোন সূরা থেকে কয়েকটি আয়াত পাঠ করে নিতেন। এমনিভাবে কখনো এরূপও হতো যে, তিনি দুই রাক'আতে একই সূরা পাঠ করতেন।

জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে সূরা আস-সাজ্‌দা ও আদ-দাহর পাঠ করার হিক্‌মত বর্ণনা করে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) বলেছেন ঃ এ দুই সূরায় চমৎকারভাবে কিয়ামত, পুরস্কার ও শাস্তির বিবরণ বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, হাদীসের দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, কিয়ামত জুমু'আর দিন অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভবতঃ এজন্যই তিনি জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে এ দুই সূরা পাঠ করা পসন্দ করতেন।

যুহর ও আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরা'আত

١٢٢- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِىْ الأُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مَالاَ يُطِيْلُ فِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِى الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِى الصُّبْحِ - رواه البخارى ومسلم

১২২. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও তার সাথে দু'টি সূরা এবং শেষ দুই রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। কখনো কখনো আমরা আয়াত শুনতে পেতাম। যুহরের প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতের কিরা'আত (প্রথম রাক'আতের ন্যায়) দীর্ঘ হতো না। অনুরূপ তিনি আসর ও ফজরের সালাতেও করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো যুহরের শব্দহীন কির'আত সম্বলিত সালাতে এক আধ আয়াত এমনভাবে পাঠ করতেন যা পেছনের লোকেরা শুনতে পেত। কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেনঃ কখনো কখনো আল্লাহ্‌র প্রেমে ডুবে থাকার কারণে তাঁর এ অবস্থা হতো, আবার কখনো শিক্ষাদানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় এরূপ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য থাকত, তিনি অমুক সূরা পাঠ করছেন তা অবহিত করা অথবা নিজ কাজের মাধ্যমে এ মাসআলা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, শব্দহীন কিরা'আত সম্বলিত সালাতে এক আধ আয়াত এমন শব্দে পাঠ করা যায় পেছনের মুক্তাদী শুনতে পায় এবং এতে সালাতের কোন ক্ষতি হয় না।

١٢٣- عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَفِى رِوَايَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى وَفِى الْعَصْرِ نَحْوَ ذَالِكَ وَفِى الصُّبْحِ اَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ - رواه مسلم

১২৩. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাতে সূরা আল-লায়ল পাঠ করতেন। অন্য বর্ণনা মতে সূরা আলা পাঠ করতেন। আসরের সালাতে অনুরূপ সূরা এবং ফজরের সালাতে তার চেয়েও দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। (মুসলিম)

মাগরিবের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিরা'আত

١٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِحم الدُّخَانَ - رواه النسائى

১২৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সালাতে সূরা আদ্-দুখান পাঠ করতেন। (নাসায়ী)

١٢٥- عَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ - رواه البخارى ومسلم

১২৫. হযরত জুবাইর ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাগরিবের সালাতে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦- عَنْ اُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسِلاَتِ عُرْفًا - رواه البخارى مسلم

১২৬. হযরত উম্মুল ফাযল বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাগরিবের সালাতে সূরা মুরসালাত পাঠ করতে শুনেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ الاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِىْ رَكْعَتَيْنِ - رواه النسائى

১২৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সালাতের দুই রাক'আতে পুরো সূরা আ'রাফ ভাগ করে পাঠ করেন। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোল্লিখিত চারটি হাদীসে মাগরিবের সালাতে যে সকল সূরার কিরা'আতের কথা বিধৃত হয়েছে, তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম (قصار) কোন সূরা স্থান পায়নি। বরং তাতে দীর্ঘ (طوال) সূরাসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীসে সূরা আ'রাফের বর্ণনা এসেছে যা প্রায় সোয়া পারা স্থান জুড়ে আছে। মোটকথা এ চারটি হাদীস দ্বারা পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সালাতে দীর্ঘ দীর্ঘ সূরা পাঠ করেছেন। কিন্তু পরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যাবে যে, তিনি বেশির ভাগ সময় মাগরিবের সালাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরা পাঠ করতেন। তাই অধিকাংশ আলিমের মতে, উল্লিখিত চারটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মাগরিবের সালাতে যে দীর্ঘ সূরা পাঠের বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে তা ছিল মূলতঃ ঘটনাচক্রের ব্যাপার। তাঁর সাধারণ আমল অনুযায়ী তিনি মাগরিবের সালাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরা পাঠ করতেন। যেমন হযরত উমার (রা) কর্তৃক হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়। ইনশাআল্লাহ একটু পরেই হযরত ফারূক-ই-আযম (রা) এর এ চিঠির বর্ণনা আসবে।

এশার সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরা'আত

١٢٨– عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ، وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ رواه البخارى ومسلم

১২৮. হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এশার সালাতে সূরা আত্-তীন পাঠ করতে শুনেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুমধুর কণ্ঠে কিরা'আত পাঠ করতে শুনি নি (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিমের কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত বারা ইব্ন আযির (রা) সূত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা মূলতঃ সফরকালীন সময়ের। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাতের কোন এক রাক'আতে সূরা আত্-তীন পাঠ করেছিলেন।

١٢٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مَعَاذَ بْنِ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِى فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَاَمَّ هُمْ فَافْتَتَحْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ اَنَا فَقْتَ يَا فَلاَنُ ؟ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ وَلاَتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاُخْبِرَنَّهُ فَاتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مَعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مَعَاذٍ فَقَالَ يَامَعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ ؟ اِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ، وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى ، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاعْلَى -رواه البخارى ومسلم

১২৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করতেন এবং নিজ গোত্রের লোকদের সালাতের ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এশার সালাত আদায় করেন। তারপর নিজ গোত্রের লোকদের কাছে আসেন এবং তাদের সালাতের ইমামতি করেন। এতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করা শুরু করেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি সরে গিয়ে সালাম ফিরায় এবং একাকী সালাত আদায় করে চলে যায় (বিষয়টি অস্বাভাবিক ছিল, কেননা মুনাফিক ছাড়া কেউ জামা'আত ছাড়া সালাত আদায় করত না)। লোকেরা তাকে বলল, তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছ? সে বলল, না আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মুনাফিক নই। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট যাব এবং তাঁকে বিষয় জানাব। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গেল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা দিনে উটের সাহায্যে পানি সেচের কাজ করি ও সারাদিন পরিশ্রম করি। (রাতে) মু'আয (রা) আপনার সাথে ইশার সালাত আদায় করে আসেন এবং (সালাতে ইমামতি করতে গিয়ে) সূরা বাকারা পাঠ করা শুরু করেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আযের দিকে তাকান এবং বলেন, হে মু'আয! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলতে চাও? তুমি (এশার সালাতে) সূরা শাম্‌স, আদ্-দুহা, আল-লায়ল ও সূরা আ'লা পাঠ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত মু'আয (রা) একবার মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে মুক্তাদী হিসেবে এবং অন্যবার নিজ গোত্রের লোকদের ইমামতি করার মধ্য দিয়ে দুইবার এশার সালাত আদায় করতেন। কিন্তু অধিকাংশ আলিমদের মতে, তিনি একবার নফল হিসেবে সালাত আদায় করতেন। ইমাম শাফিঈ (রা) এর মতে, হযরত মু'আয (রা) মসজিদে নব্বীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে মুক্তাদী হিসেবে যে সালাত আদায় করতেন তা ছিল মূলতঃ তার ফরয সালাত। আর নিজ গোত্রের লোকদের তিনি নফলের নিয়্যাতে সালাতে ইমামতি করতেন। এর ভিত্তিতে তিনি বলেন, নফল আদায়কারী ইমামের পেছনে ফরয সালাত আদায়ে কোন দোষ নেই। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে, নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর সালাত কোনভাবেই আদায় হবে না। হযরত মু'আয (রা) এর ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে তাঁরা বলেন, তিনি ফরযের নিয়্যাতেই নিজ গ্রোত্রের লোকদের সালাতের ইমামতি করতেন আর মসজিদে নব্বীতে জামা'আতের সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত থাকায় তাঁর বিশেষ বরকত লাভের এবং শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে নফলের নিয়্যাতে তাঁর পেছনে সালাত আদায় করতেন। এ মাস'আলার উভয় পক্ষ থেকে চমৎকার আলোচনা পর্যালোচনা বিধৃত রয়েছে। ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী এবং ফাতহুল মুলহিমে এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ দেখে নিতে পারেন।

এ হাদীস থেকে আলোচ্য বিষয়বস্তু ও শিরোনাম সম্পর্কিত যে, নির্দেশনা লাভ করা যায় তা হচ্ছে এই যে, মুক্তাদীর সালাতে কষ্ট হয় এমন দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ না করাই ইমামের কর্তব্য। বিশেষতঃ দুর্বল, অসুস্থ ও পেশাজীবী লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরী।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন সালাতে পঠিত কিরা'আত

(١٣٠) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ - رواه النسائ

১৩০. হযরত সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (সে সময়কার এক ইমাম সম্পর্কে) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাতের (এই ইমামের মত) আর কাউকে অনুরূপ সালাত আদায় করতে দেখিনি। সুলায়মান বলেন, আমিও তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি যুহরের প্রথম দুই রাক'আত দীর্ঘ এবং শেষ দুই রাক'আত সংক্ষেপ করতেন। আর তিনি আসরের সালাতকে সংক্ষেপ করতেন এবং মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাস্‌সাল, এশায় আওসাতে মুফাস্‌সাল এবং ফজরে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল পাঠ করতেন। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ "মুফাস্‌সাল"-কুরআন মাজীদের শেষ মনযিল তথা 'সূরা হুজুরাত' থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাসমূহকে মুফাস্‌সাল বলা হয়। এতে আবার তিনটি ভাগ রয়েছে। যথা– সূরা 'হুজুরাত' থেকে 'বুরূজ' পর্যন্ত সূরাসমূহকে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল, সূরা 'বুরূজ' থেকে সূরা 'বায়্যিনাই' পর্যন্ত সূরাসমূহকে আওসাতে মুফাস্‌সাল এবং সূরা 'বায়্যিনাহ' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত সূরাসমূহকে কিসারে মুফাস্‌সাল বলা হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে যে ব্যক্তির সালাতকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার নাম অজ্ঞাত। বর্ণনাটি এরূপ-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের সাথে তাঁর সালাতের রয়েছে অপূর্ব মিল এবং তাঁর সালাতের সাথে তুলনীয় হতে পারে এমন কোন ব্যক্তির পেছনে আমি আর কখনো সালাত আদায় করিনি।

হযরত আবূ হুরায়রা ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার কেউই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ভাষ্যকারগণ অনুমান করে উক্ত ব্যক্তির নাম চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তারা গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য উপহার দিতে পারেন নি। হাদীসের বিষয়বস্তু যেহেতু পরিষ্কার তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত থাকায় আসল উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হবে না। তেমনি এই মাস'আলার উপর কোন প্রভাবও পড়বে না।

হযরত সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সালাতের যে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন সে মতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আমলের যে বিবরণ পেশ করেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন সালাতের কিরা'আত ঠিক ঐরূপই ছিল। অর্থাৎ যুহরে দীর্ঘ ও আসরে হাল্‌কা কিরা'আত, মাগরিবে কিসারে মুফাস্‌সাল, এশায় আওসাতে মুফাসস্‌াল এবং ফজরে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল পাঠ করতেন।

হযরত উমার (রা)-এ পর্যায়ে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উদ্দেশ্য যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতেও বিভিন্ন সময়ের সালাতের কিরা'আত সম্পর্কে একই নির্দেশনা প্রকাশ পেয়েছে। মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত শব্দযোগে হযরত উমর (রা)-এর পত্রের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে ঃ

كَتَبَ عُمَرُ اِلَى اَبِىْ مُوْسٰى اَنِ اقْرَأْ فِى الْمَغْرِبِ ...... بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ

হযরত উমর (রা), হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উদ্দেশ্য একপত্রে লেখেন, "তুমি মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাস্সাল, এশায় আওসাতে মুফাস্সাল এবং ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল পাঠ করবে।"

ইমাম তিরমিযী (র) এই পত্রের বরাত দিয়ে যুহরে আওসাতে মুফাস্সাল পাঠ করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। (তিরমিযীর যুহর ও আসরের কিরা'আত অনুচ্ছেদ)

হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী এবং আমল অনুধাবন করেই আবূ মূসা আশ'আরীর কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। এই পত্রের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ইমাম বিভিন্ন সময়ের সালাতে হযরত উমর (রা)-এর পত্রকে দিক নির্দেশনারূপে স্বীকৃতি দিয়ে তা কার্যে পরিণত করাকে সর্বোৎকৃষ্ট আমল বলে অভিহিত করেছেন।

জুমু'আ ও দুই ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কিরা'আত

١٣١- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَاهُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ اِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ الْاُوْلَى وَفِى الاَخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - رواه مسلم

১৩১. হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা) কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় চলে যান। সে মতে আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিয়ে জুমু'আর সালাত আদায় করেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা মুনাফিকূন পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জুমু'আর দিন এ সূরা দু'টি পাঠ করতে শুনেছি। (মুসলিম)

١٣٢- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمْعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ، قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِى الصَّلَوتَيْنِ - رواه مسلم

১৩২. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় ঈদের ও জুমু'আর সালাতে সূরা গাশিয়া ও সূরা আ'লা পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে একত্র হলে উক্ত সূরা দু'টি তিনি উভয় সালাতে পাঠ করতেন। (মুসলিম)

١٣٣- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ - رواه مسلم

১৩৩. হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকিদ লায়সীকে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কোন সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, তিনি উভয় ঈদের সালাতে সূরা কাফ ও সূরা কামার পাঠ করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দুই রাক'আত সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন অথবা সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন। উভয় ঈদের সালাতে তিনি সূরা আলা ও সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন অথবা কখনো কখনো সূরা কাফ ও সূরা কামার পাঠ করতেন।

১. কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেন, হযরত উমর (রা)-এর এই জিজ্ঞাসা তাঁর অজানার কারণে বা ভুলে যাওয়ার কারণে ছিল না, কেননা তাঁর সম্পর্কে একথা চিন্তা করা যায় না। তার প্রশ্নের কারণ হয়ত হযরত আবূ ওয়াকিদ লায়সীর ইল্ম ও স্মরণ শক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া অথবা তাঁর মুখ থেকে অপরকে শুনানো অথবা নিজ জানা বিষয় সত্যায়িত করা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমু'আ ও দুই ঈদের সালাতের কিরা'আত সম্পর্কীয় এ পর্যন্ত যেসব হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার আলোকে পাঠক নিশ্চয়ই নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় অনুধাবন করেছেন।

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাধারণ আমল ছিল এরূপ যে, তিনি ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল কিরা'আত পাঠ করতেন, যুহরে কিছু নাতিদীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করতেন, আসরে সংক্ষিপ্ত হাল্কা কিরা'আত পাঠ করতেন, মাগরিবেও অনুরূপ হাল্কা কিরা'আত পাঠ করতেন এবং এশার সালাতে আওসাতে মুফাস্সাল কিরা'আত পাঠ পসন্দ করতেন। তবে কখনো কখনো ব্যতিক্রমও হতো।

২. কোন সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোন সূরা পাঠের নির্দেশ দেননি এবং নিজে কার্যত এরূপ করেনও নি। তবে হ্যাঁ, কোন কোন সালাতে বিশেষ বিশেষ সূরা পাঠের বিষয়টি তাঁর থেকে প্রমাণিত।

হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ্ (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সালাতে বিশেষ গুরুত্ব ও উপকারিতা লক্ষ্য করে বিশেষ সূরা পাঠ করা পসন্দ করতেন। কিন্তু না তিনি অকাট্যভাবে নির্দিষ্ট করে গেছেন আর না অন্যকে তা করার তাগিদ দিয়েছেন। সুতরাং সালাতে যদি কেউ তাঁর অনুসরণ করে, তবে তা উত্তম, আর কেউ যদি তা না করে তবে তাতে কোন দোষ নেই।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ দ্বিতীয় পর্ব)

সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলা

সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রত্যেকে সালাতের প্রত্যেক রাক্'আতের ক্ষেত্রেই জরুরী। কেননা তার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ্র পশংসা ও গুণকীর্তন, চতুর্থ আয়াতে তাওহীদের স্বীকারোক্তি ও দু'আ এবং তার পরবর্তী তিন আয়াতে আল্লাহ্র কাছে সৎপথে প্রাপ্তির আবেদন করে সূরা সমাপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরা পাঠ সমাপনান্তে 'আমীন' পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি যখন কেউ ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে এবং ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলেন তখন মুক্তাদীকেও তার সাথে 'আমীন' বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসল্লীদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে ফিরিশ্তারাও 'আমীন' বলে থাকেন।

١٣٤ – عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ – رواه البخارى ومسلم

১৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলবে তোমরাও তখন 'আমীন' বলবে।

কেননা যে ব্যক্তি ফিরিশতাদের 'আমীন' বলার সাথে একই সময় 'আমীন' বলবে, তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কারো 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাদের আমীনের অনুরূপ হওয়ার ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে আমীন ফিরিশ্তাদের সাথেই বলতে হবে, আগেও নয় পরেও নয়। আর ফিরিশতাদের আমীন বলার সময় হচ্ছে তখনই যখন ইমাম আমীন বলেন। উপরিউক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণীর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলেন, তখন মুক্তাদীদেরও তাঁর সাথে 'আমীন' বলা উচিত। কেননা আল্লাহর ফিরিশতাগণও ঐ সময় 'আমীন' বলে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, মুক্তাদী যখন ফিরিশতাদের সাথে 'আমীন' বলে, তখন আল্লাহ্ তাদের পূর্ববর্তীকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।

١٣٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمُّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ - يُحِبْكُمُ اللّٰهِ - رواه مسلم

১৩৫. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন (প্রথমেই) কাতার সোজা করে নিবে। এরপর তোমাদের কেউ যেন সালাতের ইমামতি করে। যখন সে তাক্বীর বলে তখন তোমরাও তাক্বীর বলবে এবং যখন সে 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলে তখন তোমরা আমীন (কবুল করুন) বলবে। আল্লাহ্ তোমাদের দু'আ কবূল করে নিবেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ 'আমীন' মূলতঃ দু'আ কবূলের আবেদনপত্র এবং বান্দার পক্ষ থেকে এই স্বীকারোক্তি একথা বলার অধিকার আমার নেই যে, আল্লাহ্ আমার দু'আ কবূল করবেনই, তাই যাঞ্চনাকারীর ন্যায় আবেদন করতে হবে– হে আল্লাহ্! তুমি তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমার চাহিদা মেটাও এবং আমার দু'আ কবূল কর। তাই 'আমীন' শব্দটি সংক্ষিপ্ত হলেও আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্তির একটি স্বতন্ত্র দু'আও বটে। সুনানে আবূ দাউদে আবূ যুহায়র নুমায়রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একবার রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বের হলাম এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌছলাম যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট কাতর প্রার্থনা করছিল। এ

সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি সে মোহর লাগায়, তবে সে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিল। লোকদের মধ্যকার এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কিসের দ্বারা সে মোহর লাগবে? তিনি বললেন ঃ 'আমীন' দ্বারা।"

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, দু'আ শেষে আমীন বললে দু'আ কবূলের আশা করা যেতে পারে।

'আমীন' কি সশব্দে না নিঃশব্দে পাঠ করতে হবে

সালাতে 'আমীন' সশব্দে পাঠ করা হবে না নিঃশব্দে এ বিষয়টি অযাচিতভাবে বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। অথচ সালাতে সশব্দে ও নিঃশব্দে 'আমীন' বলার বিষয়টি যে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোন আলিম ব্যক্তির পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। একইভাবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সশব্দে ও নিঃশব্দে 'আমীন' পাঠকারীর মধ্যে সাহাবী ও তাবিঈ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটাই স্পষ্ট প্রমাণ যে এ দু'টি ধারাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত এবং তাঁর জীবদ্দশায় উভয় পদ্ধতি কার্যকর ছিল। একথা অসম্ভব যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় 'আমীন' সশব্দে পাঠ করেন নি অথচ তাঁর ইন্‌তিকালের পর সাহাবা কিরাম সশব্দে 'আমীন' বলা শুরু করে দেন। একইভাবে এটাও অসম্ভব যে, তাঁর জীবদ্দশায় কখনো তাঁর সম্মুখে কেউ কার্যত নিঃশব্দে 'আমীন' বলেনি অথচ তাঁর ইন্‌তিকালের পর সাহাবা কিরাম নিঃশব্দে 'আমীন' পাঠ শুরু করে দেন। মোদ্দাকথা, সাহাবী ও তাবিঈগনের মধ্যে উভয়বিধ আমল কার্যকর থাকাই প্রমাণ করে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে উভয়বিধ আমল কার্যকর ছিল।

পরবর্তী যুগের কিছু সংখ্যক প্রাজ্ঞ আলিম নিজ গবেষণার আলোকে মনে করেছেন যে, আমীন মূলতঃ সশব্দে পাঠ করতে হবে এবং নবী যুগে এর উপরই বেশির ভাগ আমল করা হতো। যদিও কখনো কখনো ব্যতিক্রম ও পরিলক্ষিত হতো। তাই তারা সশব্দে আমীন পাঠ করা উত্তম এবং নিঃশব্দে পাঠ করা জায়িয বলেছেন। এর বিপরীত অন্য একদল মুজতাহিদ ইমাম নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী মনে করেছেন যে, 'আমীন' যেহেতু কুরআনের শব্দ নয়, তাই তা নিঃশব্দে পাঠ করাই বাঞ্ছনীয় এবং নবী যুগেও সাধারণভাবে নিঃশব্দেই পাঠ করা হতো, যদিও কখনো কখনো সশব্দ পাঠ করা হতো। মোদ্দাকথা, এই ইমামগণের গবেষণা ও বিশ্লেষণের দাবি হল নিঃশব্দে পাঠ করা উত্তম এবং সশব্দ পাঠ করা জায়িয। বলাবাহুল্য ইমামদের মতবিরোধ মূলতঃ উত্তম হওয়ার বিষয় নিয়ে আবর্তিত। উভয় প্রকার পাঠ জায়িয হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এ বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ গবেষণা ও বিশ্লেষণের আলোকে যা বিশুদ্ধ মনে

করেছেন, তাই গ্রহণ করেছেন আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আমাদের সবাইকে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বনের তাওফীক দিন।

রাফি ইয়াদাঈন (সালাতে হাত উত্তোলন)

'রাফি ইয়াদাইন' (সালাতে তাক্বীরে উলার সময় হাত উত্তোলন ছাড়াও হাত উত্তোলন) বিষয়ক মাসআলা ও পূর্বোক্ত মাসআলার অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাক্বীরে তাহ্রীমা ব্যতীত রুকূতে যাবার সময়, রুকূ থেকে উঠার সময় বরং সিজ্দা থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় যে রাফি ইয়াদাইন করতেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন, এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, ওয়ায়িল ইব্ন হুজ্র এবং আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনরূপভাবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তাক্বীরে তাহ্রীমার সময় হাত উত্তোলন করতেন, পুরো সালাতে আর কখনো হাত উত্তোলন করতেন না। যেমন, এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, রাবা ইব্ন আযিব (রা) প্রমুখ সাহাবা সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে সাহাবা কিরাম একটি বিরাট জনগোষ্ঠির মধ্যে উভয়বিধ আমল পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মুজতাহিদ আলিমগণের মধ্যে কেবল উত্তম ও অগ্রাধিকার নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে উভয়বিধ পদ্ধতি জায়িয ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

١٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا فَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى السُّجُوْدِ - رواه البخارى ومسلم

১৩৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন দুই হাত উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর যখন রুকূর জন্য তাক্বীর বলতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও একইভাবে দুই হাত উঠাতেন এবং বলতেন। 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা' তবে সিজ্দায় যাবার সময় এরূপ করতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ- হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে তাক্বীরে তাহ্রীমা ছাড়াও রুকূতে যাবার সময় ও উঠার সময় রাফি ইয়াদাইনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং একই সাথে সিজ্দায় রাফি ইয়াদাইন না করার বিষয় স্পষ্ট

উল্লেখ রয়েছে। তাঁরই অপর এক বর্ণনায় তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার সময় রাফি ইয়াদাঈনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং এ রিওয়ায়াত সহীহ্ বুখারীতে স্থান পেয়েছে।

মালিক ইব্ন হুয়াইরিস এবং ওয়ায়িল ইব্ন হুজ্র (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহেও (যা ইমাম নাসায়ী ও আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করেছেন) সিজ্দার সময় রাফি' ইয়াদাঈনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে যা হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে।

ঘটনা হচ্ছে এরূপ উপরে যেসব বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা মূলতঃ সবই বিশুদ্ধ। মালিক ইব্ন হুয়াইরিস এবং ওয়ায়িল ইব্ন হুজ্র (রা) এর বর্ণনার আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্দায় যাবার সময় এবং সিজ্দা থেকে উঠার সময় রাফি ইয়াদাঈন করতেন। কিন্তু হযরত ইব্ন উমর (রা) এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি সিজ্দায় রাফি ইয়াদাইন করতেন না। উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, কখনো কখনো তিনি যে আমল করেছেন তা মালিক ইব্ন হুয়াইরিস ও ওয়ায়িল ইব্ন হুজ্র (রা) প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু ইব্ন উমর (রা) এই ঘটনা দেখেন নি। তাই তিনি নিজ জ্ঞান মতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্দায় রাফি ইয়াদাঈন করতেন না। তবে এ যদি তার সব সময়ের অথবা বেশির ভাগ সময়ের আমল হতো, তবে তা ইব্ন উমর (রা) এর মত সাহাবী তা জানবেন না, তা অসম্ভব ব্যাপার।

١٣٧- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ - رواه الترمذى وأبوادؤد والنسائى

১৩৭. হযরত আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মাসঊদ (রা) আমাদের বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ন্যায় সালাত আদায় করে দেখাব না? সে মতে তিনি সালাত আদায় করলেন, কিন্তু প্রথমবার (তাক্বীরে তাহ্রীমার সময়) ছাড়া আর কোথাও রাফি ইয়াদাইন করেন নি। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবীণ ও সম্মানিত সাহাবীদের অন্যতম, যিনি তাঁর নির্দেশন অনুযায়ী প্রথম কাতারে তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের শেখানোর লক্ষ্যে

অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ন্যায় সালাত আদায় করে দেখান। উল্লেখ্য, তার এ সালাতে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত কোন পর্যায়ে রাফি ইয়াদাইন ছিল না।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে যে রুকূতে যাবার সময় ও উঠার সময় রাফি ইয়াদাইনের উল্লেখ রয়েছে তাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সব সময়ের অথবা বেশির ভাগ সময়ের আমল ছিলনা। যদি ব্যাপারটি এরূই হতো, তবে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যিনি প্রথম সারিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, তিনি নিশ্চয়ই তা জানতেন এবং শিক্ষাদান কালে রাফি ইয়াদাইন আদৌ বর্জন করতেন না। উল্লিখিত হাদীসমূহ সামনে রেখে প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালাতে কখনো রাফি ইয়াদাইন করতেন আবার কখনো করতেন না। অর্থাৎ ব্যাপারটি এরূপ হতো যে, কখনো তিনি তাঁর পুরো সালাতে কেবল তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত অন্য কোন সময় হাত উঠাতেন না। আবার কখনো তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ছাড়াও রুকূতে যাবার সময় এবং উঠার সময় রাফি ইয়াদাইন করতেন আবার কদাচিৎ সিজ্‌দায় যাবার সময় আবার কখনো সিজ্‌দা থেকে উঠার পর রাফি ইয়াদাইন করতেন। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) দীর্ঘদিন তা প্রত্যক্ষ করে মনে করেছিলেন যে মূলতঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত সালাতে রাফি ইয়াদাইন নেই। পক্ষান্তরে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী মনে করেছিলেন যে, সালাতের মূলে রাফি ইয়াদাইন রয়েছে। বলাবাহুল্য চিন্তা-গবেষণার পথ পরিক্রমায় তাবিঈদের মধ্যেই এ দ্বিমত থেকে যায়।

ইমাম তিরমিযী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীস সনদসহ বর্ণনা করার পর ঐ সকল সাহাবী আমল উল্লেখ করেছেন যাঁদের সূত্রে রাফি ইয়াদাইন সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক সাহাবী যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, জাবির, আবূ হুরায়রা, আনাস (রা) প্রমুখ রাফি ইয়াদাইনের বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। একইভাবে তাবিঈ এবং তাঁদের পরবর্তী একদল ইমাম এ অভিমত পোষণ করেন।

রাফি ইয়াদাইন বর্জনের পক্ষে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করার পর এ বিষয়ের উপর বারা ইব্‌ন আযিবের বরাতে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযী (র) লিখেছেন ঃ

"বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী রাফি ইয়াদাইন বর্জনের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। একইভাবে তাবিঈ ও তাঁদের পরবর্তী ইমামগণও এ মত পোষণ করেন"।

মোদ্দাকথা, 'আমীন' সশব্দে ও নিঃশব্দে পাঠ করার ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ থেকে রাফি ইয়াদাইন করার এবং না করার উভয়বিধ বিবরণ রয়েছে। সাহাবা কিরামের মধ্যে প্রাধান্য দানের এবং গ্রহণের ব্যাপারে এ জন্য দ্বিমতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের কিছু সংখ্যক নিজ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আমল পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত সালাতে মূলতঃ রাফি ইয়াদাইন নেই; তবে তা কখনও ঘটনাচক্রে করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) পরবর্তীদের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী (র) প্রমুখ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ও হযরত জাবির (রা) সহ অপরাপর সাহাবাগণ সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত পোষণ করেন। পরবর্তীদের মতে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ (র) সহ অপরাপর মনীষীবৃন্দ এই অভিমতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। উভয়বিধ অভিমতের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে কেবল ফযীলতের ব্যাপারে। রাফি ইয়াদাইন অবলম্বন এবং বর্জন জায়িয হওয়ার বিষয়ে উভয়পক্ষ ঐকমত্য পোষণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বাড়াবাড়ি ও বে-ইনসাফি থেকে হিফাযত করুন এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়ার তাওফীক দিন।

রুকূ ও সিজ্‌দা

সালাত কি? এর জবাবে বলা যায় যে, আন্তরিকতার সাথে কথা ও কাজের এক বিশেষ পদ্ধতিতে নিজ দাসত্ব ও বিনয় প্রকাশ করে অসীম ক্ষমতা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী আল্লাহ্‌র সামনে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। এটাই হচ্ছে সালাতে দাঁড়ানো বৈঠক রুকূ ও সিজ্‌দা এবং তাতে যা কিছু পাঠ করা হয়, সবকিছুর মূল বিষয়। তবে দাসত্ব ও বিনয়ের সর্বাধিক প্রকাশ ঘটে সালাতের রুকূ-সিজ্‌দায় মাথা উঁচু করে রাখা, অহঙ্কার বা নিজের বড়ত্ব প্রদর্শনের লক্ষণ। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মাথা অবনমিত করাও ঝুঁকিয়ে দেওয়া, বিনয়-নম্রতা প্রকাশের লক্ষণ । রুকূর ন্যায় মাথা অবনমিত করা এবং গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা কেবল মহান স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতার আধার আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। আর সিজ্‌দা হচ্ছে বিনয় প্রকাশের সর্বশেষ সোপান। সিজ্‌দার মাধ্যমে বান্দাহ্ তার দেহের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ মাটিতে রাখে। এদিক থেকে রুকূ ও সিজ্‌দা সালাতের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ রুকূন। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সিজ্‌দা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে

বিশুদ্ধ পন্থায় আদায় করার ব্যাপারে সবিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। এবং এগুলোতে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর পবিত্রতা ও গুণগান ঘোষণার ব্যাপারে বাণী প্রদান করেছেন এবং কার্যত তা করেও দেখিয়েছেন। এ ভূমিকার পর এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক হাদীস করা যেতে পারে।

ভালভাবে রুকূ ও সিজ্‌দা আদায় করার গুরুত্ব

(١٣٨) عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُجْزِءُ صَلٰوةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ - رواه أبوداؤد والترمزى والنسائى وابن ماجة والدارمى

১৩৮. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসল্লীর সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি আদায় হয় না যতক্ষণে পর্যন্ত রুকূ ও সিজ্‌দার পিঠ সোজা না রাখে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ্ ও দারেমী)

١٣٩- عَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِىِّ الْحَنَفِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى صَلٰوةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا- رواه أحمد

১৩৯. হযরত তাল্‌ক ইবন আলী হানিফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের রুকূ ও সিজ্‌দায় পিঠ সোজা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলা তার সালাতের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না। (আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ- মুসল্লীর সালাতের প্রতি আল্লাহ্‌র দৃষ্টি না দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ ধরনের সালাত তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নতুবা আসমান-যমীনে এখন কোন বস্তু নেই যা তার দৃষ্টি সীমার অগোচরে রয়েছে। উপরিউক্ত হাদীস দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যথা নিয়মে রুকূ ও সিজ্‌দা আদায় করে না তার সালাত গ্রহণ করা হবে না– এটাই হচ্ছে উভয় হাদীসের মূল দিক নির্দেশনা।

١٤٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكُلْبِ - رواه البخارى ومسلم

১৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সিজ্‌দার সময় অংগ প্রত্যঙ্গসমূহ সঠিক রাখবে কুকুরের ন্যায়ে দুই হাত বিছিয়ে দিবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সঠিকভাবে সিজ্‌দা করার অর্থ হচ্ছে, ধীরস্থিরভাবে প্রশান্ত মনে সিজ্‌দা করা এবং মাথা যমীনে রেখে তাৎক্ষণিকভাবে যেন তা উঠিয়ে নেয়া না হয়। কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার সঠিকভাবে সিজ্‌দা করার মর্ম এই বুঝেছেন যে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে রাখা চাই যেভাবে তা রাখা উচিত। এই হাদীসের দ্বিতীয় দিক নির্দেশনা হচ্ছে সিজ্‌দার সময় কনুই দু'টি খাড়া করে রাখা। এ পর্যায়ে তিনি এ জন্য কুকুরের উপমা দিয়েছেন যাতে এরূপ বৈঠকের কদর্য রূপ শ্রোতাগণ সহজে বুঝে নিতে পারে।

١٤١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ وَارْفَعْ كَفَّيْكَ مِرْفَقَيْكَ -رواه مسلم

১৪১. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন সিজ্‌দা করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু যমীনে রাখবে এবং দুই কনুই যমীন থেকে উঠিয়ে রাখবে। (মুসলিম)

١٤٢- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُو بَيَاضُ اِبْطَيْهِ - رواه البخارى ومسلم

১৪২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজ্‌দা আদায় করতেন, তখন তাঁর উভয় হাত পাঁজর থেকে এতখানি পৃথক রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ - رواه أبوداؤد

১৪৩. হযরত ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি– তিনি যখন সিজ্‌দা করতেন তখন হাতের তালু যমীনে রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন এবং যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ)

١٤٤- عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ - رواه البخارى ومسلم

১৪৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গ দিয়ে সিজ্‌দা করতে আদিষ্ট হয়েছি। আর তা হচ্ছে কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের অগ্রভাগ, আর কাপড় ও চুল যেন না সামলাই । (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে যে সাতটি অঙ্গের উল্লেখ রয়েছে তা সিজ্‌দার অঙ্গ বলে খ্যাত। সিজ্‌দায় এসব অঙ্গ যমীনে লাগানো চাই। কিছু সংখ্যক লোক সিজ্‌দায় যেয়ে নিজ কাপড় ও চুল যাতে ধূলি মলিন না হয় সেজন্য চেষ্টা করে। একাজ সিজ্‌দার উদ্দেশ্য ও প্রাণ বিরোধী। তাই হাদীসে এ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।

রুকূ ও সিজ্‌দায় কী পাঠ করবে?

١٤٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ - رواه أبو داؤد وابن ماجة وَالدارمى

১৪৫. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'ফা সাব্বিহ্ বিস্‌মি রাব্বিকাল আযীম' আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ একে তোমরা রুকূর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর। তারপর 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা একে তোমাদের সিজ্‌দায় স্থান দাও। (আবূ দাঊদ, ইবন মাজাহ ও দারেমী)

١٤٦- عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى - رواه النسائى

১৪৬. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল

আযীম' এবং সিজ্‌দায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করতেন। (নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারিমী)

١٤٧- عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْتَمَّ رُكُوْعُهُ وَذَالِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدَهُ وَذَالِكَ اَدْنَاهُ - رواه الترمذى وأبوداؤد وابن ماجة

১৪৭. আওন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে তখন রুকূতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (তোমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলার আর তাহলেই তার রুকূ পূর্ণাঙ্গ হবে, তবে এটা হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। যখন সে সিজ্‌দা করবে তখন সিজ্‌দায় তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলবে। আর তাহলেই তার সিজ্‌দা পূর্ণাঙ্গ হবে, তবে এটা হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মর্ম হচ্ছে এই যে, রুকূ সিজ্‌দায় যদি তিনবারের কম তাসবীহ্ পাঠ করা হয় তাতেও রুকূ-সিজ্‌দা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যায়, পূর্ণরূপে আদায়ের জন্য কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ্ পাঠ করা জরুরী এবং এর চেয়ে বাড়িয়ে বলা আরো ভালো। তবে রুকূ-সিজ্‌দা এমন দীর্ঘ ইমামের জন্য সমীচীন নয় যা মুক্তাদীদের কষ্টের কারণ হয়। বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সম্পর্কে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের সাথে এই যুবকের সালাতের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন, আমরা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের রুকূ- সিজ্‌দার তাসবীহ্‌র পরিমাণ আন্দায করলাম যে তিনি প্রায় দশবার তসবীহ্ পড়েন। এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও রুকূ সিজ্‌দায় প্রায় দশবার তাসবীহ্ পাঠ করতেন। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি সালাতে ইমামতি করে সে যেন কমপক্ষে তিনবার এবং বেশির পক্ষে দশবার তাসবীহ্ পাঠ করে।

উল্লিখিত তিনটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং সিজ্দায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করার ব্যাপারে উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের আমল এ এরূপই ছিল। অন্যান্য হাদীসে রুকূ-সিজ্দারত অবস্থায় তাসবীহ্'র এ শব্দগুচ্ছের স্থলে অন্যান্য দু'আ ও তাসবীহ্ পাঠ করার বিষয় ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণ রয়েছে, যেমন হাদীস থেকে জানা যাবে।

١٤٨– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ – رواه مسلم

১৪৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ ও সিজ্দায় 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ্' (আল্লাহ্ অতি পবিত্র, প্রশংসাই, তিনি ফিরিশতাকুল ও রূহের (জিব্রাঈল (আ.) এর প্রতিপালক) পাঠ করতেন। (মুসলিম)

(١٤٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ، يَتَاَوَّلَ الْقُرْاٰنَ – رواه البخاري ومسلم

১৪৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ ও সিজ্দায় প্রায়ই- سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তোমার প্রশাংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষ বাক্য يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنُ এর মর্ম হচ্ছে এই যে, সূরা নাসরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে 'ফা সাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু' (তুমি প্রশংসা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিও।) আয়াত দ্বারা যে তাঁর সপ্রশংস গুণকীর্তন করার এবং মাগফিরাত কামনার নির্দেশ দিয়েছেন তা কার্যে পরিণত করার লক্ষ্যেই মূলত। তিনি রুকূও সিজ্দায় আল্লাহ্র সপ্রশংসা গুনাগুণ ও ক্ষমা চেয়ে নিতেন। হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে এও বর্ণিত আছে যে, সূরা নাস্র অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল রুকূ ও সিজ্দায়-ই নয় বরং আল্লাহ্ সপ্রশংস গুণকীর্তন ও ক্ষমা চাওয়া সম্বলিত বাণী বেশি বেশি পাঠ করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর অনুসরণের তাওফীক দিন।

١٥٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلَى بَطْنِ قَدَيْمَهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - رواه مسلم

১৫০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর রাতে আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিছানায় পেলাম না। তারপর তাঁর খোঁজে বের হলাম। এক পর্যায়ে আমার হাত তাঁর পায়ের তালু স্পর্শ করল আর তখন তিনি মসজিদে সালাতরত ছিলেন এবং উভয় পা খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি সিজ্‌দারত অবস্থায় পাঠ করছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ...... عَلَى نَفْسِكَ

"হে আল্লাহ্! আমি ক্ষমা চাই, তোমার সন্তোষের তোমার ক্রোধ হতে, তোমার ক্ষমা তোমার শাস্তি হতে এবং তোমার পাকড়াও থেকে তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করেছ, আমি তোমার সেরূপ প্রশংসা করার সামর্থ্য রাখি না। (শুধু এটুকু বলতে পারি) তুমিও তেমনি, যেমনটি তুমি নিজের প্রশংসায় নিজে ঘোষণা করেছ। (মুসলিম)

١٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ - رواه مسلم

১৫১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দার বলতেন "হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছোট-বড় প্রথম শেষ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা কর।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর তাহাজ্জুদ ও অপরাপর নফল সালাতের রুকূ সিজ্‌দার এই দু'আসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু কোন কোন সময় ফরয সালাতেও যে তিনি এসব দু'আ পাঠ করতেন তারও প্রমাণ রয়েছে।

কাজেই আল্লাহ্ যদি তাওফীক দেন এবং লোকেরা যদি এই বরকতপূর্ণ দু'আর মর্ম বুঝে, তবে রুকূও সিজ্‌দায় কখনো কখনো তা পাঠ করা চাই। বিশেষ করে নফল সালাতে যেহেতু সালাতকে দীর্ঘায়িত করার স্বাধীনতা রয়েছে তাই রুকূ

ও সিজ্‌দায় তা পাঠ করা যেতে পারে। তবে ফরয সালাতে মুক্তাদীর যাতে কষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে ইমামের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

রুকূ ও সিজ্‌দায় কুরআন পাঠ করবে না

١٥٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْسَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِىْ الدُّعَاءِ فَقَمِنَ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ - رواه مسلم

১৫২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় আমাকে কিরা'আত পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকূতে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে এবং সিজ্‌দায় গভীর মনোযোগসহ দু'আ করবে। আশা করা যায়, তোমাদের দু'আ কবূল হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন পাঠ করা সালাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন, তবে কুরআন পঠিত হবে কিয়াম অবস্থায়। আল্লাহ্‌র কালাম দাঁড়ানো অবস্থায়-ই পাঠ করার উপযোগী। কারণ শাহী ফরমান দাঁড়ানো অবস্থায়ই পাঠ করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রুকূ ও সিজ্‌দায় আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা, নিজ দাসত্ব প্রকাশ এবং তাঁর মহান দরবারে দু'আ ক্ষমা চাওয়ার উপযুক্ত স্থান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এ আমলই করে গেছেন এবং নিজ বাণীও প্রদান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করতেন এবং এ বিষয়ে যে উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং নিজেও আমল করে দেখিয়েছেন তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই হাদীসে তিনি সিজ্‌দায় দু'আ করার বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে এ দু'টি বিষয়ের কোন বৈপরীত্য নেই। দু'আ ও প্রার্থনা করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, বান্দা নিজ প্রভুর কাছে পরিষ্কার করে তার প্রয়োজনের কথা জানাবে। তবে এর একটি পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যাঁর কাছে কিছু চাওয়া হবে তাঁর কাছে পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় ভাব প্রদর্শন করে তাঁর গুণকীর্তন করতে হবে। দুনিয়াতেও আমরা এহেন বহু যাঞ্চাকারীকে এরূপ প্রার্থনা করতে দেখি। মোটকথা এও হচ্ছে দু'আ করার অন্যতম পদ্ধতি । এর ভিত্তিতেই হাদীসে আল্-হামদুল্লিল্লাহ কে সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ বলা হয়েছে। (তিরমিযী) এই সূত্র বলা যায় যে, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লাও' একপ্রকার দু'আ। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সিজ্‌দায় বারংবার এই তাসবীহ্ পাঠ করে, তবে তাও দু'আ রূপে গণ্য হবে। তবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিজ্‌দার যেসব দু'আ হয়েছে, সেগুলোর মর্যাদাই আলাদা।

সিজ্‌দার ফযীলাত

١٥٣- عَنْ مَعْدَانِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِىَ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَ مَا قَالَ ثَوْبَانُ - رواه مسلم

১৫৩. হযরত মা'দান ইব্‌ন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাদকৃত দাস সাওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম ঃ আপনি আমাকে এমন কাজের কথা বলুন যা করলে আল্লাহ্ তার বিনিময়ে আমাকে জান্নাতবাসী করবেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন, তারপর আমি তাঁকে পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম, এবারও তিনি নীরব রইলেন। তৃতীয় বারের মত আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, জবাবে তিনি বললেনঃ আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেনঃ তুমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বেশি বেশি সিজ্‌দা করবে। কারণ তুমি আল্লাহ্‌কে যত বেশি সিজ্‌দা করবে, তিনি তোমার মর্যাদা তত সমুন্নত করবেন এবং তোমার পাপমোচন করে দিবেন। মা'দান বলেন, এর পর আমি আবূ দারদা (রা) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও আমাকে সাওবানের ন্যায় জবাব দিলেন। (মুসলিম)

١٥٤- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ ، قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَالِكَ ؟ قُلْتُ هُوَ ذَالِكَ ، قَالَ فَاَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ - رواه مسلم

১৫৪. হযরত রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খাস খাদিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে রাত যাপন করতাম। একবার আমি (তাহাজ্জুদের জন্য) তাঁর উযূ ও ইস্‌তিন্‌জার পানি উপস্থিত করলাম। এসময় তিনি আমাকে বললেন ঃ আমার কাছে তোমার বিশেষ

কোন কিছু চাইবার থাকলে চাইতে পার, আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাথী হতে চাই। তিনি বললেন ঃ এছাড়া আরো কিছু? আমি বললাম ঃ আমি ত এই-ই চাই। তিনি বললেন ঃ বেশি বেশি সিজ্‌দা করে তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য কর। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের অবস্থা কখনো কখনো এরূপ হয় যে, তাঁরা তাঁর রহমত লাভের অনুকূল অবস্থা বুঝতে পারেন এবং তাঁরা এও বুঝতে পারেন যে, এ অবস্থায় কিছু আশা করলে আল্লাহ্‌ চাহেত তাঁরা তা লাভ করবেন। বলাবাহুল্য, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাবী'আ ইব্‌ন মালিকের খিদ্‌মতে সন্তুষ্ট হয়ে একে কিছু চাইতে বললেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাকে প্রার্থিত বস্তু দেওয়া হবে। সম্ভবত তখন দু'আ কবূলের সময় ছিল। কিন্তু জবাবে তিনি জান্নাতে তাঁর সাহচর্য লাভের কথা জানালেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য কিছু পাওয়ার ইচ্ছা আছে কি-না জানতে চাইলে তিনি পুনরায় সাহচর্যের কামনা করে বলেন তাঁর অন্য কোন চাহিদা নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তুমি বেশি বেশি সিজ্‌দা করে আমাকে সাহায্য কর। একথা বলে তিনি যেন বুঝাতে চেয়েছেন যে, তুমি যে জান্নাতে আমার সাহচর্য চাও তা বিরাট মর্যাদার ব্যাপার। আমি এ বিষয়ে তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করব। এ দুর্লভ মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে নিজকে উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কার্যকরভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। এ দুর্লভ মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বেশি বেশি সিজ্‌দা করা। সুতরাং তুমি বেশি বেশি সিজ্‌দা করে তোমাকে সহযোগিতা কর এবং নিজের আমল দ্বারা দু'আ করে আমার দু'আর শক্তি বৃদ্ধি কর।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত রাবী'আ (রা) বর্ণিত হাদীস এবং সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত অধিক সিজদা দ্বারা বেশি বেশি সালাত আদায় বুঝানো হয়েছে। কিন্তু জান্নাত লাভ এবং তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য লাভের ক্ষেত্রে সালাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিজ্‌দা বিশাল স্থান দখল করে আছে। তাই অধিক সালাত আদায়ের স্থলে অধিক সিজ্‌দা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সালাতের কিয়াম ও বৈঠক

রুকূ ও সিজ্‌দার মধ্যে যেমন কিয়ামের নির্দেশ রয়েছে তেমনি এক রাক'আতের দুই সিজ্‌দার মধ্যে বৈঠক করার বিষয়টিও শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিক নির্দেশনা ও আমল নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করার মধ্য দিয়ে জানা যেতে পারে।

١٥٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُوْلُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - رواه البخارى ومسلم

১৫৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা (মুক্তাদীগণ) 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্দ' (হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য সর্ববিধ প্রশংসা) বলবে। তবে যার কথা ফিরিশ্তাগণের কথার অনুরূপ হবে তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম যখন রুকূ থেকে উঠার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন ফিরিশতাকুল 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলেন। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পেছনের মুক্তাদীদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারাও যেন এই বাক্যটি বলে। তিনি আরো বলেন যার এই বাক্যটি ফিরিশতাগণের ন্যায় হবে তার পূববর্তী গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তাদের অনুরূপ হওয়ার মর্ম হলো, আগে পরে না করে তাঁদের সাথে সাথে বলা।

মা'আরিফুল হাদীসের বিভিন্ন স্থানে আমি (গ্রন্থকার) একথা বার বার লিখেছি যে সব হাদীসে বিশেষ কোন কাজের বরকতে গুনাহ ক্ষমা করার সুসংবাদ শুনান হয়েছে তাতে মূলত ঃ সাগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। কাবীরা গুনাহের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্ সূত্রে জানা যায় যে, এ গুনাহ থেকে ক্ষমা পাবার পথ হলো তাওবা। তবে এক্ষেত্রেও রয়েছে আল্লাহ্র পূর্ণ ইখ্তিয়ার। তিনি নিজ দয়ায় যাকে ইচ্ছা তার বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

١٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبُوْهُ اَوْ فِى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلأَ الاَرْضِ وَمِلأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَئٍ بَعْدُ - رواه مسلم

১৫৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ থেকে পিঠ সোজা করতেন তখন বলতেন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্দ মিল'আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল'আল আরদি ওয়ামিল আ'মাশি'তা মিন শায়্যিন বা'দু'। তাঁর

প্রশংসা করে তিনি তার প্রশংসা করে তিনি তাঁর প্রশংসা শুনেন। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার প্রশংসায় আসমান পরিপূর্ণ, যমীন পরিপূর্ণ, এর পর তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ তোমারই প্রশংসায় (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সহীহ্ মুসলিম হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে কিয়াম অবস্থায় এই দু'আই কিছু অতিরিক্ত শব্দসহ বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা পরিষ্কার জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' বলার পর কখনো কেবল 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতেন। আবার কখনো কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলতেন যেমন-আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওফা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। আবার কখনো তার চেয়েও বেশি শব্দযোগে পাঠ করতেন যেমনটি হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। এভাবে তাঁর কিয়াম কখনো কখনো এত দীর্ঘ হতো যে, লোকেরা সন্দেহ করতেন যে সাহু (ভুল) হয়েছে। যেমনটি পরবর্তী হযরত আনাসের রিওয়ায়াত থেকে জানা যাবে।

١٥٧- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا يُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمَ انِفًا قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلَثِيْنَ مَلَكًا يَبْعَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلاً - رواه البخارى

১৫৭. হযরত রিফা'আ ইব্‌ন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠালেন তখন বললেন ঃ 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এ সময় তাঁর পেছনে এক ব্যক্তি বলল ঃ "রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ, হামদান কাসীরান, তায়্যিবান মুবারকান ফিহি। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য প্রশংসা, অসংখ্য প্রশংসা, পবিত্রও বরকতময় প্রশংসা।" এরপর যখন তিনি সালাত শেষ করলেন তখন বললেন ঃ এই মাত্র কে এরূপ বলল? তখন সে জবাব দিল ঃ আমি। তিনি বললেন ঃ আমি ত্রিশজনের চেয়েও অধিক ফিরিশ্‌তাকে তাড়াহুড়া করে লিখতে দেখেছি যে, কে কার আগে লিখতে পারে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ হামদান কাসীরান' বাক্যটি উচ্চারণ করার পর তা লেখার জন্য যে ত্রিশজনেরও অধিক ফিরিশ্‌তার প্রতিযোগিতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তার বিশেষ কারণ সম্ভবত এই ঐ ব্যক্তি

যখন তা বলেছিলেন তখন হয়ত তাঁর অন্তরে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে তিনি আল্লাহ্র গুণকীর্তন ও বরকতপূর্ণ বাক্য বলে ফেলেছিলেন।

١٥٨- عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ - رواه النسائى والدارمى

১৫৮. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজ্দার মাঝখানে বলতেন ঃ رَبِّ اغْفِرْلِىْ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর।" (নাসায়ী ও দারিমী)

١٥٩- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ - رواه أبو داؤد والترمذى

১৫৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজ্দার মাঝখানে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মামাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্নী।" হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে রিযক দাও।" (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٦٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ اَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ-رواه مسلم

১৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন সোজা হয়ে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম, হয়ত তাঁর সাহু (ভুল) হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তিনি সিজ্দা করতেন এবং দুই সিজ্দার মাঝখানে এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম, তিনি হয়ত ভুলে গেছেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আনাস (রা) বর্ণিত আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এত দীর্ঘ কিয়াম ও বৈঠক করতেন যাতে সাহাবা কিরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভুল হয়ে গেছে বলে সন্দেহ করতেন।

আরো জানা যায় যে, এরূপ হতো খুবই কদাচিৎ, তাঁর সাধারণ অভ্যাস এরূপ ছিলনা। কেননা প্রত্যহ যদি এরূপ হতো তাহলে ভুলের সন্দেহ হতো না।

রুকূও সিজ্‌দার ন্যায় কিয়াম ও বৈঠকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সব দু'আ বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বরকতময় ও মকবূল দু'আ। তবে সালাত আদায়কারী যদি ইমাম হয়, তবে সে যেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐ বাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখে যে, ইমামের এমন কোন কাজ করা সমীচীন নয় যাতে মুক্তাদী কষ্ট হয়।

বৈঠক, তাশাহ্‌হুদ ও সালাম

বৈঠক ও সালামের মধ্য দিয়ে সালাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এগুলো সালাতের সর্বশেষ অঙ্গ । তবে সালাত যদি তিন অথবা চার রাক'আত বিশিষ্ট হয়, তবে দুই রাক'আত আদায়ের পর একবার বৈঠক জরুরী। আর এ বৈঠকে 'প্রথম বৈঠক' বলা হয়। কিন্তু এতে কেবল তাশাহ্‌হুদ পাঠ শেষে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাক'আত আদায়ের পর দ্বিতীয় বৈঠকে বসতে হবে এবং এতে তাশাহ্‌হুদের পর দরূদ শরীফ পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত হাদীসমূহ থেকে জানা যাবে যে, বৈঠকের বিশুদ্ধ পদ্ধতি কী, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে বৈঠক করতেন, তাতে কী পাঠের শিক্ষা দিতেন এবং সালাম ফিরিয়ে কী ভাবে সালাত শেষ করতেন।

বৈঠকের সঠিকও সুন্নাত নিয়ম

١٦١- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِىْ تَلِى الاِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهُ عَلَيْهَا - رواه مسلم

১৬১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের মধ্যে বসতেন, তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাগুলোর পাশে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দু'আ করতেন। তখন তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর বিছানো থাকত (তা দিয়ে ইশারা করতেন না, (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ বৈঠকে কালেমা শাহাদাত পাঠের পর তর্জনী উঠানো এবং ইশারা করার বিষয়টি শুধু হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে নয় বরং অপরাপর

সাহাবী সূত্রেও বর্ণিত আছে। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন বলে প্রমাণিত। এর দ্বারা বাহ্যিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসল্লী যখন 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই) পাঠ করে, আল্লাহ্র অদ্বিতীয় একক সত্তার সাক্ষ্য দেয় তখন তার অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে তখন তার একটি বিশেষ আঙ্গুল উচিয়ে শরীর দিয়েও সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত এ হাদীসের অন্যান্য সূত্রে এটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে তর্জনী উঠানোর সাথে সাথে চোখ দ্বারা ও ইশারা করতেন (واتبعها بصره) উক্ত ইশারার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করেন–

" لهى أشد على الشَّيْطَان من الحديد "

"আঙ্গুল দ্বারা ইশারা লোহা দ্বারা (ধারাল ছুরি বা তলোয়ারের আঘাত) অপেক্ষাও শয়তানের কাছে অধিক ভয়াবহ ।" (মুসনাদে আহমাদের বরাতে মিশ্কাত)

١٦٢– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا وَيَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِىَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلاَىَ لاَتَحْمِلاَنِّىْ – رواه البخارى

১৬২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কে সালাতে আসন পিড়ি করে বসতে দেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমিও সেরূপ করলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আমাকে নিষেধ করে বললেন ঃ সালাতে বসার সুন্নাত তরীকা হল ডান পা খাড়া করে রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে রাখা। তখন আমি বললাম, আপনি যে এরূপ করেন? তিনি বললেন ঃ আমার দুই পা আমার ভার বহন করতে পারে না। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর এক পুত্রের নাম ছিল আবদুল্লাহ্। উপরে তার ঘটনাই বিবৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কে আল্লাহ্ দীর্ঘজীবী করেছিলেন। তিনি চুরাশি অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ছিয়াশী

বছর বয়স পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ায় সালাতে সুন্নাত তরীকায় বসতে পারতেন না। এ কারণে তিনি উযরবশতঃ চারজানু হয়ে বসতেন। (বলা হয় সে, তার পায়ে বিশেষ কোন কষ্ট হচ্ছিল, তাই তিনি সুন্নাত তরীকায় বসতে অপরাগ ছিলেন।) বলাবাহুল্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার অনুকরণে চারজানু হয়ে বসেন অথচ তখনও তিনি বৃদ্ধ হননি বরং এক নবীন যুবক ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, সালাতে বসার সুন্নাত তরীকা হলো ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা। নিজের সম্পর্কে বলেন, তিনি উযরবশত চারজানু হয়ে বসেন এবং আরো বলেন, আমার দুই পা আমার শরীরের ভার বহন করতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এর সর্বশেষ কথা ছিল এই যে, "আমার দুই পা আমার শরীরের ভার বহন করতে পারে না"। একথা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তার মতে বেঠকের সুন্নাত তরীকা ছিল এরূপ যাতে মানুষ তার শরীরের ভার দুই পায়ের উপর রাখতে পারে। একেই বলা হয় ইফ্তিরাশ। আমরা এর উপরই আমল করে থাকি।

সালাত আদায়ের নিয়ম সম্বলিত যে হাদীস হযরত আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তার শেষাংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ বৈঠকে একাধিক পদ্ধতিতে বসার বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা 'তাওয়াররুক' নামে অভিহিত। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম বৈঠক হবে সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত

١٦٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتّٰى يَقُوْمَ - رواه الترمذى والنسائى

১৬৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাক'আতের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠে যেতেন যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপরে বসেছেন। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই অভ্যাস থেকে বুঝা যায় যে, প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ শেষ করে তাৎক্ষণিক উঠে যেতে হবে।

তাশাহ্হুদ

١٦٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِىْ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - رواه البخارى

১৬৪. হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে রেখে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেমনিভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (তিনি আমার উদ্দেশ্য বললেন ঃ পড়)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادَ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"যাবতীয় মৌখিক প্রার্থনা ও সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য সকল সালাত ও ইবাদত তাঁরই জন্য সব দান খায়রাতও পবিত্রতা ও তাঁরই জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত আপনার উপর অবতীর্ণ হোক। আমাদের এবং আল্লাহ্‌র সকল নেকবান্দাদের উপরও সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামকে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিতেন। অনুরূপভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তিনি তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর হাত তাঁর দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরার বিষয়টিও ছিল এমনিতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহাভী শরীফে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক এক শব্দ করে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) কে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন যেমনিভাবে কোন শিশুকে বা অশিক্ষিত ব্যক্তিকে কোন বস্তু স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) কে এই তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন এবং তাকে এই মর্মে নির্দেশ দেন, যে, তিনি

যেন তা অপরকে শিক্ষা দেন। তাশাহ্হুদ সম্পর্কিত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ছাড়াও হযরত উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আয়েশা (রা) সহ আরো কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। এ বর্ণনাসমূহে কেবল দু' একটি শব্দের পার্থক্য রয়েছে মাত্র। কিন্তু সনদ ও রিওয়ায়াত উভয় দিক থেকে হাদীস বিশারদগণের মতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত তাশাহ্হুদের রিওয়ায়াতটি প্রাধান্য পাবার দাবি রাখে যদিও অপরাপর বর্ণনা বিশুদ্ধ এবং সে সকল রিওয়ায়াতের তাশাহ্হুদ ও সালাতে পাঠ করা যেতে পারে।

কতিপয় ভাষ্যকারের মতে, এই তাশাহ্হুদ মূলত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি'রাজকালীন আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন উল্লেখ্য, যখন তিনি মহান আল্লাহ্র পবিত্র হুযূরে উপস্থিত হন তখন এ বলে বন্দেগীর নযরানা পেশ করেন اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ "

আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাবে বলা হল ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

এরপর তিনি ঈমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বললেন ঃ

"اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "

ভাষ্যকারগণ লিখেন, সালাতে এই কথোপকথন মূলতঃ মি'রাজের রাতের ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সম্বোধনের সর্বনাম অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সহীহ্ বুখারী ও অপরাপর গ্রন্থে স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাশাহ্হুদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনকালে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ বলার সময় আমরা অনুভব করতাম যে তিনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন। এরপর যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন থেকে আমরা اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِىِّ বলা শুরু করি।

কিন্তু জামহূর উম্মাতের আমল থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতকে যে শব্দমালা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ তাঁর ইন্তিকালের পরও স্মৃতি হিসেবে তা বহাল রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে

রাসূল-প্রেমিকদের এক বিশেষ অনুভূতি নিহিত। তবে এ শব্দগুচ্ছের আলোকে যে সব লোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাযির নাযির (সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত ও প্রত্যক্ষদর্শী) এর আকীদা পোষণ করতে চায় তাদের সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে; তারা শিরক প্রীতি ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

দুরূদ শরীফ

দুরূদ পাঠের হিকমত

বিশ্ব মানবতা বিশেষত যারা কোন নবী-রাসূল প্রদর্শিত পথ লাভ করে ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। আল্লাহ্র পর তাদের উপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ নবী-রাসূলগণের। উম্মাতে মুহাম্মাদী ঈমান নামক অমূল্য সম্পদ লাভ করেছে, আল্লাহ্র সর্বশেষে নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যম। এজন্যই এই উম্মাত আল্লাহ্র পর সবচেয়ে বেশি ঋণী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু বিশ্বের মালিক ও পালনকর্তা, তাই তিনি গোটা সৃষ্টি লোকের ইবাদত ও তাসবীহ্-তাহ্লীল পাওয়ার অধিকারী। একইভাবে নবী-রাসূলগণও তাঁদের উম্মাতের পক্ষ থেকে দুরূদ ও সালাম পাওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর জন্য আল্লাহ্র দরবারে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করার দু'আ করা উচিত। দুরূদ ও সালাম প্রেরণের এটাই মূলকথা। প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা আল্লাহ্র মহান দরবারে এসব মহান অনুগ্রহণকারীর প্রতি মহব্বতের হাদিয়া, শুক্রিয়া আদায় ও নযরানা নামের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নতুবা আমাদের দু'আর তাঁদের কী প্রয়োজন? বাদশাহের জন্য ফকীরের হাদীয়া-তোহফার কী দরকার?

তথাপিও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ আমাদের হাদীয়া তাঁর কাছে পৌঁছে দেন এবং আমাদের দু'আও প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা আরো সমুন্নত করেন। আমাদের সবচেয়ে বড় উপকার হল, এর ফলে তাঁর সাথে আমাদের ঈমানী বন্ধন সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়। এতদ্ব্যতীত একবার দুরূদ পাঠ করা হলে কমপক্ষে আল্লাহ্র দশটি রহমত লাভ করা যায়। এ-ই হ'ল মূলতঃ দুরূদ ও সালামের অন্তর্নিহিত রহস্য ও এর উপকারিতা।

দুরূদ ও সালামের ফলে শিরক সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়

দুরূদ ও সালামের একটি বিশেষ হিক্মত এও রয়েছে যে, এর দ্বারা শিরক সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার পর সবচেয়ে মর্যাদাবান ও সম্মানিত হচ্ছেন আম্বিয়া কিরাম (আ)। তাঁদের উপরই যখন দুরূদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ রয়েছে তাই এথেকে জানা যায় যে, তিনিও নিরাপত্তা ও রহমত প্রাপ্তির মহান মর্যাদার অধিকারী যে, তাঁদের জন্য শান্তি-নিরাপত্তা ও রহমতের দু'আ করা হয়। রহমত ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি যেহেতু তাঁদের হাতের মুঠোয় নিবদ্ধ নয়, তাই একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তা অন্য কোন সৃষ্টির হাতে থাকতে পারে না। কেননা বিশ্বে তাঁদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশি ভাল-মন্দ ব্যতীত অন্য কারো মুঠোয় নিবদ্ধ বলে মনে করাই হল শিরকের ভিত্তি। এই হুকুমের মাধ্যম আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণকারী করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি নবী-রাসূলগণের জন্য দু'আ করে, সে কেমন করে সৃষ্টি লোকের মধ্যে কারো ইবাদত করতে পারে?

আল-কুরআনে দুরূদ ও সালামের নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, হে মুসলিমগণ! তোমারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (৩৩, সূরা আহ্যাব ঃ ৫৬)

এ আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি যে দুরূদ ও সালামের নির্দেশ এসেছে। তাতে কিন্তু সালাত কিংবা সালাতবিহীন অবস্থার উল্লেখ নেই, যেমনিভাবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র সপ্রশংস গুণগানের বিষয় নির্দেশ এসেছে। এতে সালাতরত অবস্থায় কিংবা সালাতবিহীন অবস্থা কোনটারই উল্লেখ নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়্যাতের জ্যোতি দ্বারা যেমন আল্লাহ্র উদ্দেশ্য তাসবীহ্-তাহ্লীলের স্থান সালাত বুঝেছেন (যেমন পূর্বে উল্লিখিত এক হাদীসের একস্থানে বলা হয়েছে- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمُ ও سَبِّحِ اسْمَ

رَبِّكَ الاَعْلَى আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হল, তখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ এবং সিজ্‌দায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلَى পাঠের নির্দেশ দেন)

অধমের মতে, যখন সূরা আহযাবের صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا আয়াত অবতীর্ণ হল তখন সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে সালাতের শেষ বৈঠকে দুরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোন রিওয়ায়াত অধমের চোখে পড়েনি। যার ভিত্তিতে আমার এ ধারণা, পরবর্তী হাদীস প্রসঙ্গে তা আলোচনা করব। এবার হাদীস পাঠ করা যাক।

١٦٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - رواه البخارى مسلم

১৬৫. হযরত কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করব? আপনার প্রতি কিভাবে সালাম দেব তা আপনি ইতোপূর্বে (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আত্তাহিয়্যাতু শিক্ষা দিয়েছেন) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ....

"হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেছি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (হে আল্লাহ্) তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে উল্লিখিত সূরা আহ্যাবে যেমন সালাত এবং সালাকের বাইরে কোন অবস্থার উল্লেখ না করেই দুরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে, তেমনি হযরত কা'ব ইব্ন উজরা (রা.) বর্ণিত হাদীসেও সময়ের কোন উল্লেখ নেই। তবে একাধিক সাহাবী, বিশেষত হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তার কোন কোন বর্ণনায় হাদীসের প্রশ্নাকারে রয়েছে ঃ

" كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِىْ صَلَوَاتِنَا

"আমরা যখন সালাতরত থাকি তখন আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করব?[১]

এ বর্ণনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কিভাবে সালাতে দুরূদ পাঠ করা যায় সে সম্পর্কেই সাহাবীর প্রশ্ন ছিল। সম্ভবত একথা তার ভালভাবেই জানা ছিল যে, দুরূদের স্থান সালাতেই।

এছাড়া ইমাম হাকিম (র.) মুস্তাদরাকে শক্তিশালী সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ ثُمَّ يَدْعُوْا لِنَفْسِه। মুসল্লী যেন শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করে, এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করে, এরপর নিজের জন্য দু'আ করে।"[২]

স্পষ্টতই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) এ বাণী নবী করীম (সা.) থেকে শুনেই প্রদান করেছেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে কে কিভাবে বলতে পারেন যে, তাশাহহুদের পর সালাতে দুরূদ পাঠ করা হবে?

মোটকথা এ বর্ণনাসমূহ সামনে রাখলে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সূরা আহযাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যে দুরূদ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সাহাবা কিরাম জানতেন যে, তা পাঠ করার স্থান সালাত এবং তা পঠিত

---

১. আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِىْ صَلَوَاتِنَا শব্দগুচ্ছ নেই। এই শব্দগুচ্ছের সাথে আরো বাড়িয়ে এই হাদীসটি ইব্ন খুযায়মা, ইব্ন হিববান, হাকিম ও অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববীকৃত শারহে মুসলিম, পৃ. ১৭৫; ফাতহুল বারী, তাফসীর অধ্যায়-সূরা আহযাব, পৃ ৩০৫, ১৯শ পারা।

২. ফাতহুল বারী, দাওয়াত অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ বাবুস্ সালাত আলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃ. ৫৫, ২৬- পারা।

হবে সালাতের শেষ বৈঠকে। এ পরই তারা তাঁর প্রতি কিভাবে ও কোন্ শব্দ দুরূদ পাঠ করবেন তা জানতে চান। এর জবাবে তিনি তাদের দুরূদে ইব্রাহিমী শিক্ষা দেন যা আমরা সালাতে পাঠ করে থাকি।

দুরূদ শরীফের 'আ-ল' (ال) শব্দের তাৎপর্য

দুরূদ শরীফে চারবার 'আল' (ال) শব্দ এসেছে। আমরা এর অর্থ করে থাকি পরিবার-পরিজন। আরবী ভাষার বিশেষত কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে 'আল' (ال) বলা হয় তাদের যারা তার সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত, এ সম্পর্ক বংশগত হোক, কি অন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক (যেমন স্ত্রী ও সন্তানাদি) বন্ধুত্ব, সাহচর্য আনুগত্য[১] ইত্যাদি কারণে হোক। তাই আভিধানিক অর্থ হিসেবে 'আল' (ال) এর উভয় অর্থই হতে পারে। কিন্তু পরে আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা.) বর্ণিত যে, হাদীসের উল্লেখ করা হচ্ছে তা থেকে জানা যাবে যে, এখানে 'আল' (ال) দ্বারা নবী করীম (সা.) এর পরিবার পরিজন অর্থাৎ তাঁর পূতঃ পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর ঔরষজাত সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

١٦٦- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

رواه البخارى ومسلم

১৬৬. হযরত আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবা কিরাম (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ তোমরা বল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى .... حَمِيدٌ مَجِيْدٌ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সহধর্মিনীগণ ও বংশধরগণের প্রতি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইব্রাহীম (আ) এর পরিবার-পরিজনের প্রতি । তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর

১. ইমাম রাগিব ইসফাহানী (র.) মুফরাদাতুল কুরআনে লিখেছেন, وَيَسْتَعمل فيمن يختص بالانسان اختصاصا ذاتيا اما بقرابة قريبة او بموالاة قال عز وجل (وال ابْرَاهِمَ وَاَل عِمْرَانَ) وَقَالَ (اَدْخِلُوْا ال فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ)

সহধর্মিনীগণ ও বংশধরগণের প্রতি যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইব্রাহীম (আ) এর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে দুরূদ শরীফের শব্দগুচ্ছ উপরে বর্ণিত হাদীসের শব্দমালা থেকে কিছুটা ভিন্ন মনে হয়। কিন্তু অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন যে এ দু'টির যে কোন একটি সালাতে পাঠ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুরূদের উপরই বেশিরভাগ আমল চলে আসছে।

আলোচ্য হাদীসে 'আ-ল' (ال) এর বিপরীতে " ازواجه وذريته " তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততি এসেছে। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, প্রথমোক্ত হাদীসে যে 'আল' (ال) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পূতঃ পবিত্র সহধর্মিনীগণও সন্তান-সন্ততিগণকেই বুঝানো হয়েছে। দুরূদ ও সালামে তাদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বিপুল সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে তাঁদের দুর্লভ সৌভাগ্য! তবে এর দ্বারা একথা বুঝা সমীচীন নয় যে, তাঁরা সকল উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। একথা এভাবে বুঝে নেয়া যায় যে, কোন কোন অনুরাগী ভক্ত যখন তাঁর সম্মানিত বুযুর্গের প্রতি কোন বিশেষ উপহার পাঠায় তখন তার লক্ষ্য উক্ত বুযুর্গ ও পরিবারের সদস্যরাই হয়ে থাকে। উক্ত উপহার সামগ্রী সে বুযুর্গ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করুন এটাই সে কামনা করে। যদিও পরিবারের বাইরে অনেকেই তাঁদের চাইতে উত্তম লোকও থেকে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি অগাধ ভালবাসার নযরানা স্বরূপ পেশ করা হয়। এটাকে প্রকৃতিগত ভালবাসার নিয়মের দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। এর উপর ভিত্তি করে উত্তম-অধমের কোন বিচার করা রুচিসম্মত নয়।

সালাতে দুরূদ শরীফের স্থান ও তার হিক্মত

একথা সর্বজনবিদিত যে, দুরূদ শরীফ সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর পাঠ করা হয়। আর এটাই এর জন্য উপযুক্ত স্থান আল্লাহ্র বান্দাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত শিক্ষা লাভের মাধ্যমেই ঈমান আনার সুযোগ লাভ করেছে। আল্লাহ্কে জানা এবং সালাতে তাঁর মহান দরবারে উপস্থিতি, তাসবীহ্-তাহ্লীল পাঠ এবং মুনাজাত করার মধ্য দিয়ে এক ধরনের মি'রাজ নসীব হয় আর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। কাজেই আল্লাহ্র গুণগান থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে, নিজের জন্য কিছু প্রার্থনার

আগে মুসল্লী নবী করীম (সা.)-এর অনুগ্রহ অনুভব করে, তাঁর প্রদর্শিত পথের কথা স্মরণ করে তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র মহান দরবারে দু'আ করে। তার ও তাঁর পূতঃপবিত্র স্ত্রীগণের ও সন্তান-সন্ততির জন্য নিজের সর্বোত্তম সম্বল দুরূদের মাধ্যমে দু'আ করে। এর চাইতে উত্তমরূপে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণের কোন উপযুক্ত প্রক্রিয়া হতে পারে না। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবা কিরামকে দুরূদ শরীফের এহেন শব্দগুচ্ছ শিক্ষা দিয়েছেন।

এখানে দুরূদ শরীফের বর্ণনা যেহেতু সালাত সম্পর্কীয় আলোচনার এক পর্যায়ে এসেছে তাই দু'টি হাদীস বর্ণনাই আমি যথেষ্ট মনে করছি। এ ছাড়া এ ধারাবাহিকতায় যে সব হাদীস দুরূদ শরীফের ফযীলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে ইনশাআল্লাহ তা কিতাবুদ্ দাওয়াতে সবিস্তার আলোচনা করব। পূর্বোল্লিখিত দুরূদে ইব্‌রাহিমী ব্যতীত নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত 'সালাতও সালাম' সম্পর্কীয় হাদীস ইনশাআল্লাহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ বরাতে যথাস্থানে আলোচনা করব।

দুরূদের পর এবং সালাতের পূর্বে পঠিতব্য দু'আ

ইতোপূর্বে মুস্তাদরাকে হাকিমের রবাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এর বাণী বিধৃত হয়েছে। তা হল, মুসল্লী তাশাহ্‌হুদ ও দুরূদ শরীফ পাঠ করার পর যেন দু'আ করে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদের পর সালামের পূর্বে দু'আ করার হুকুম সম্ভবতঃ ঐ সময়ে ও কার্যকর ছিল যখন তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ জারী হয়নি।

সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম এ অপরাপর হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর এক বর্ণনায় তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দান সম্বলিত হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, ثُمَّ ... فَيَدْعُوْا بِه "মুসল্লী যখন তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে তখন তার কাছে যে দু'আ উত্তম বলে মনে হয় তা যেন যে নির্বাচন করে নেয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে।" একই কথা সম্বলিত হাদীস হয়রত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও জানা যায়। মোটকথা সালামের পূর্বে দু'আ করার বিষয় সম্বলিত হাদীস নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে প্রামাণ্যরূপে বর্ণিত আছে স্থানে তিনি অন্যান্য বিশেষ দু'আও শিক্ষা দিতেছেন । এ পর্যায় কেবল তিনটি হাদীস বর্ণিত হচ্ছে ।

١٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ

الْقَبْرِوَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحُ الدَّجَّالِ - رواه مسلم

১৬৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেখন শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করে, তখন সে যেন আল্লাহ্‌র নিকট চারটি বস্ত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তা হল, জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। (মুসলিম)

١٦٨- عَنْ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاء كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاةِ- رواه مسلم

১৬৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনি এ দু'আও শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমরা বল - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ... وَالْمَمَاتِ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানাই চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং আমি তোমার নিকট পানাহ চাই মরণের ফিতনা থেকে " (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দু'আটি দুনিয়াও আখিরাতের যাবতীয় বিপদাপদ এবং সর্ববিধ অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক দু'আ। এতে প্রথমে জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের দু'আ বিধৃত হয়েছে, যার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যা মানুষের জন্য সবচেয়ে আধিক হতভাগ্য হওয়ার প্রমাণ। তার পর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফিতনাবাজ দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে, যার প্রভাব থেকে ঈমান নিরাপদ রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপারে। এর পর জীবন মরণের সর্ববিধ ফিত্‌না পরীক্ষা, ছোট বড় বালা মুসীবাত এবং ভ্রষ্টতা থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে।

হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসে উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় দু'আ পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ দু'আ

পাঠের উপযুক্ত সময় হল শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের পর এবং সালামের পূর্বে। এ দু'আ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সালাতে এ দু'আ পাঠ করতেন। বরং নিম্নোক্ত শব্দগুচ্ছ বাড়িয়ে বলতেনঃ

"اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ مِنَ الْمَغْرَمِ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, পাপাচার ও ঋণ থেকে।" সালামের পূর্বে এই দু'আ সালাতে বাড়িয়ে পাঠ করা উত্তম।

١٦٩– عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ...... ﷺ .... عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْبِهِ فِىْ صَلَوتِىْ فَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ – رواه البخارى ومسلم

১৬৯. হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা আমি সালাতের মধ্যে পাঠ করতে পারি । তিনি বললেন ঃ তুমি বল

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

" হে আল্লাহ্ ! আমি নিজের উপর অনেক যুল্ম করেছি আর তুমি ব্যতীত পাপ মোচনের কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমার পাপ মোচন এবং আমার প্রতি দয়া কর। কেননা তুমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে সালাতে দু'আ সূরা পাঠের নির্দেশ দেন। কিন্তু হাদীসে একথা উল্লেখ নেই যে, সালামের পূর্বে তা পাঠ করতে হবে। এ পর্যায়ে হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেনঃ সালামের পূর্বেই মূলত দু'আর উপযুক্ত সময় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছে " তাশাহ্হুদের পর সালামের পূর্বে বান্দার কোন চমৎকার দু'আ নির্বাচিত করে নেয়া উচিত এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা উচিত।" যেমন ইতিপূর্বে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস বিধৃত হয়েছে। তাই এই বিশেষ সময়ের দু'আর জন্য হযরত আবূ বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে

আবেদন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উক্ত সময় এই দু'আ করার নির্দেশ দেন। এজন্য সম্ভবত ইমাম বুখারী (র) بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ (অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পূর্বে দ'আ) শিরোনামে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।

এতদ্সত্ত্বেও তিনি দু'আর আবেদন জানিয়েছিলেন যে, সালাতে (সালামের থাকে পাঠ করা যায় আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাওয়ার জবাবে এই দু'আটি শিক্ষা দেন। যেন তিনি থাকে বলতে চেয়েছেন, হে আবূ বকর! নামায আদায় শেষে মনে যেন এ ধারণা না জন্মে যে, আল্লাহ্র ইবাদতের হক আদায় হয়েছে এবং কিছু একটা করে ফেলা হয়েছে। বরং নামায শেষে একান্ত মনে রাখতে হবে যে ভুল ক্রটি ও গুনাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থা স্বীকার করে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্র দরবরে ধর্ণা দিতে হবে এই কথা বলে হে আমার প্রভূ! আমার কোন কে আমল নেই, আমার কাছে এমন কিছু নেই যার দ্বারা আমি মাফ পাবার আশা করতে পারি। কাজেই আপনি আপনার ক্ষমাশীল ও দয়াবান গুণবাচক নামের বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিন। তাশাহ্হুদ ও দরূদ পাঠের পর সালামের পর্বে আবশ্যিকভাবে এই দু'আ পাঠ করে দু'আ করা উচিত। এই দু'আ মুখস্থ করা দু'আর মর্ম অন্তরে বসিয়ে দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। একটু খেয়াল করলেই অল্প সময়ে এ কাজ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেখানো এই মূল্যবান দু'আ থেকে বঞ্চিত হওয়া দুর্ভগ্যের কারণ। আল্লাহ্র শপথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শেখানো এক একটি দু'আ মূল দুনিয়া ও এর মধ্যকার বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

সালাতের সমাপনী সালাম

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শুরু করার পূর্বে যেমন উত্তম শব্দগুচ্ছ 'আল্লাহু আক্বার' বলতে শিখিয়েছেন তেমনি সালাত শেষ করার জন্য 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্' শিক্ষা দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সালাতের সমাপনী টানার ক্ষেত্রে এর চেয়ে উত্তম শব্দগুচ্ছ আর হতে পারেনা। একথা সর্বজনবিদিত যে, একজন যখন অপর জন থেকে পৃথক থাকার পড়ার পর আবার যখন একত্র হয় তখনই সালাম বিনিময় হয়। সুতরাং সালাম সমাপনী মাধ্যমে টেনে দিক নির্দেশনা দেওয়া হল, যে যখন আল্লাহ্ একবার বলে সালাত শুরু করে এবং আল্লাহ্র মহান দরবারে হাযিরা পেশ করে, কখন মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে, এমনকি ডান বাম থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং তখন তার মানসাটে আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই বিদ্যমান থাকেনা। পুরো সালাত এভাবেই

অতিবাহিত হয়। এর পর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দুরূদ এবং সবশেষে আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করে নিজ সালাত পুরো করে নেয়। এমতাবস্থায় সে যেন দ্বিতীয় কোন পৃথিবী থেকে এই দুনিয়ার পারিপার্শ্বিকতায় ফিরে এসেছে এবং তার ডান বামের মানুষ অথবা ফিরিশতার সঙ্গে নূতন করে সাক্ষ্যাৎ করেছে; তাই সে তার দিকে মুখ করে তাকে 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলালাহ্ বলে সালাম দিচ্ছে। অধমের নিকট সমাপনী সালামের হিক্মত এটাই। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। এবার সালাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় হাদীস পাঠ করে নেয়া যাক।

١٧٠- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ - رواه أبوداؤد والترمذى والدارمى وابن ماجة

১৭০. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাহারাত (উযূ হল সালাতের চাবি, তাক্বীর হল এর যাবতীয় হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম হল এর বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ হালালাকারী। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারিমী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে সালাত সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে প্রথমটি হল - সালাতর মাধ্যমে যেহেতু আল্লাহ্র দরবারে হাযিরা দেওয়া হয়, কাজেই তা পবিত্র অবস্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তা সালাতের চাবিও বটে। অর্থাৎ সালাত বিশুদ্ধভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে উযূ পূর্বশত। এতদ্ব্যতীত কারো জন্য আল্লাহ্র দরবারের মহান দরজা খোলা হয় না।

দ্বিতীয়টি হল, সালাত শুরু করতে হয় 'আল্লাহু আকবার' শব্দগুচ্ছ দ্বারা। এর মর্ম হল, সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এককভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পানাহার, কথাবার্তা ও অপরাপর শরী'আত অনুমোদিত কর্মকাণ্ড ও সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুসল্লীর জন্য হারাম। তাই একে 'তাক্বীরে তাহ্রীমা' বলা হয়। তৃতীয়টি হল সালাত সমাপনী শব্দগুচ্ছ যা বলার সাথে সাথে সালাত শেষ হয়ে যায় এবং যে সকল জায়িয বস্তুরাজি 'তাকেবীরে তাহ্রীমা' বলার কারণে হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হালাল হয়ে হয়ে যায়, সেই শব্দগুচ্ছ হল, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।

١٧١- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ كُنْتُ اَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى اَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ - رواه مسلم

১৭১. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ডানদিকে এবং বামদিকে সালাম ফিরাতে দেখেছি। এমনকি আমি তাঁর গণ্ডদেশের সাদা অংশও দেখেছি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি সামান্য শব্দের ব্যবধানে সুনানে আরবা'আয় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে এবং সুনানে ইব্‌ন মাজায় আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সালামের পর যিক্‌র ও দু'আ

সালাতের সমাপণী পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব দু'আ পাঠ করতেন অথবা এ সময়ে যে সব দু'আ পাঠ করার জন্য তিনি উৎসাহ দান করেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। সালামের পর যিক্‌র ও দু'আ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস পাঠ করা যাক যে সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং স্বয়ং কাজে পারিণত করে দেখিয়েছেন।

١٧٢– عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الاٰخِرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ– رواه الترمذى

১৭২. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন প্রকার দু'আ অধিক শুনা (কবূল করা) হয় ? তিনি বললেন ঃ শেষ রাতে (তাহাজ্জুদ সালাতের পর যে দু'আ করা হয়) এবং ফরয সালাত সমূহের পরের দু'আ। (তিরমিযী)

١٧٣– عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اِنِّىْ لاُحِبُّكَ يَامَعَاذُ فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَدَعْ اَنْ تَقُوْلَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ " رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ – رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى

১৭৩. হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উভয় হাত ধরে বললেন ঃ হে মু'আয। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি (মু'আয) বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি! তিনি বললেন ঃ তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এই দু'আ পড়া ছেড়ে দিবে না " رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " "হে আমার

প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও তোমার ইবাদাত উত্তমরূপে সম্পাদন করতে সাহায্য কর" (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)

١٧٤– عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَوَاتِه اسْتَغْفَرَ ثَلٰثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ – رواه مسلم

১৭৪. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শেষ করতেন তখন তিনবার ইসতিগ্‌ফার পাঠ করতেন (ক্ষমা চাইতেন) এবং বলতেন اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ "হে আল্লাহ্! তুমি শান্তির আধার এবং তুমিই শান্তির উৎস। হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত! তুমিই বরকতময়।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সচরাচর সালাম ফিরানোর পর তিনবার ইস্‌তিগফার করতেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে তিনবার 'আস্‌তাগফিরুল্লাহ্' (আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) পাঠ করতেন। এ হল, প্রকৃত অর্থে পূর্ণ দাসত্বের নযরানা পেশ করা। মুসল্লীর সালাত শেষে তার ভুল ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত।

হযরত সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীসে ইস্‌তিগফার পাঠের পর যে একটি ক্ষুদ্র দু'আ বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এতটুকুই পাওয়া যায় اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ সাধারণত مِنْكَ السَّلاَمُ এর পর আরো বাড়িয়ে যে বলা হয় وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلاَمِ হাদীস বিশারদগণ পরিষ্কার বলেছে, এ বর্ধিত অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

١٧٥– عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرِ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ – رواه البخارى ومسلم

১৭৫. হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয সালাত আদায় শেষে বলতেন

" لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ بِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيْ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দিতে চাও, তা কেউই রোধ করতে পারে না। কোন চেষ্টা - সাধনাকারীই তার চেষ্টার মাধ্যমে তোমার কাছ থেকে কল্যাণ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦- عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلٰى هٰذِهِ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ فِيْ دُبُرِ الصَّلٰوتِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحُسْنُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ - رواه مسلم

১৭৬. হযরত আবু যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কে এই মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবন। আল্লাহ্ ছাড়া কারো শক্তি সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আমরা তাঁর দাসত্ব ব্যতীত কারো দাসত্ব করি না। তাঁরই সমস্ত নিয়ামত সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে, যাদিও তা কাফিররা অপসন্দ করে।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বর্ণিত হাদীসের মধ্যে মূলত ঃ কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত কথা হল এই যে, কখানো সালাতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ শুনা যেত আবার কখনো পূর্বোক্ত রূপও শোনা যেত। এসকল দু'আ পাঠের ব্যাপারে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। বরং সময় সুযোগ অনুযায়ী যার যা ইচ্ছে, পাঠ করা যায়।

١٧٧- عَنْ سَعْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلٰوةِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبَرِ-

১৭৭. হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজ সন্তান-সন্ততিদের তা'আউয (আল্লাহ্‌র পানাহ চাওয়া সম্পর্কীয়) দু'আ শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের পর এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبَرِ -

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাচিছ ভীরুতা থেকে, পানাহ চাচ্ছি কৃপণতা থেকে, পানাহ চাচ্ছি অতি বৃদ্ধাবস্থা থেকে এবং পানাহ চাচ্ছি দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে।" (বুখারী)

١٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَوةٍ ثَلْثًا وَّثَلْثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِالْبَحْرِ - رواه مسلم

১৭৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আল-হামদুলিল্লাহ্ ও তেত্রিশবার আল্লাহু আকবর এই নিরানববই আর

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

একবার পাঠ করে একশ' পূর্ণ করবে, তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশি তুল্য হয় (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সৎকাজের বরকতে যে পাপরাশি ক্ষমা করা হয় এবং এ পর্যায়ে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে হাদীস ব্যাখ্যার একাধিক স্থানে সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে 'সুবাহানাল্লাহ্' 'ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশবার করে পাঠ করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং একশ পূরণার্থে একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু' শেষ পর্যন্ত পাঠ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু হযরত কা'ব ইব্‌ন উজ্‌রা (রা) ও অপরাপর সাহাবীদের বর্ণনার 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আল্ হামদুলিল্লাহ' তেত্রিশবার করে পাঠ করার পর একশ' পূরণার্থে চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করার শিক্ষাও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এভাবে পাঠ করার নির্দেশ দেন, আবার কখনো দ্বিতীয় রূপ পাঠের নির্দেশ দেন। তবে এ উভয় পদ্ধতিই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য। মানুষ তার রুচিমত যে কোন একটি পাঠ করতে পারে। এ তিনটি ক্ষুদ্র বাক্য তেত্রিশবার করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা যাবার সময় পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ্যে এক 'তাসবীহ্ ফাতিমা' বলা হয়। ইন্‌শাআল্লাহ এ বিষয়ে "কিতাবুদ্ দাওয়াত' শিরোনামে সবিস্তার বিবরণ আসবে।

١٧٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اِذَا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ

-رواه مسلم

১৭৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে সালাম ফিরিয়ে এই দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ

পাঠ করতে যে টুকু সময় লাগত তার চাইতে বেশি সময় বসতেন না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পার কেবল اَللّٰهُمَّ اَنْتَ............ الخ। এই সংক্ষিপ্ত দু'আ পাঠ করার সময় পর্যন্ত বসতেন। তার পর তাড়াতাড়ি উঠে যেতেন। কিন্তু

উপরে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সালাম ফিরানোর পর উক্ত সংক্ষিপ্ত দু'আ পাঠ করার পরে আরো বিভিন্ন শব্দগুচ্ছ সম্বলিত দু'আ পাঠ করতেন এবং অন্যান্যদেরকে উৎসাহিত করতেন।

কোন কোন মনীষী এই প্রশ্নের সমাধান এভাবে দিয়েছেন যে, পূর্বোক্ত হাদীস সমূহে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ........ الخ। ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা গুণকীর্তন তাওহীদ ও বড়ত্ব সম্বলিত যেসব দু'আর কথা উল্লিখিত হয়েছে সে সম্পর্কে তারা বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর সাথে সাথে এগুলো পাঠ করতেন না। বরং সুন্নাত ও অপরাপর সালাত আদায়ের পর সব দু'আ পাঠ করতেন এবং অন্যান্যদেরকে এসময়ে পাঠ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

তবে প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, উপরে যে সব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ দাড়ায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর সাথে সাথে এই দু'আ ও যিক্‌র করতেন এবং অন্যান্যদেরকেও এরূপ করার শিক্ষা দিয়েছেন। এপর্যায়ে এই অধমের নিকট সঠিক দিক নির্দেশনা হল তা-ই যা হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রা) 'হুজুতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তিনি সালামের পর উপরে বর্ণিত যাবতীয় দু'আর বরাত দান শেষে হাদীসের কিতাব সমূহের সূত্র ধরে বলেছেন ঃ এ সকল দু'আ ও যিকর - আযকার সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে সুন্নাত সালাতের পূর্বেই পাঠ করা উচিত। কেননা এ বিষয় হাদীসসমূহে প্রকাশ্য বর্ণনা রয়েছে এবং কোন কোন শব্দগুচ্ছের দাবীও এটাই।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ. الخ। পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল ততটুকু সময় বসতেন। একথার কয়েকটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাতীসের তাৎপর্য হল, সালাম ফিরানোর পর তিনি সালাতরত অবস্থায় বসে থাকা পর্যন্ত কেবল উক্ত দু'আ পাঠ করার সময় পর্যন্ত বসতেন। তার তিনি ডান কিংবা বাম দিক কিংবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। এও বলা যেতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা তাঁর সব সময়ের আমল ছিলনা বরং কখনো এরূপ হতো যে, তিনি সালাম ফিরানোর পর

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পাঠ করে উঠে যেতেন। তিনি সম্ভবত এরূপ এজন্য করতেন যেন লোকেরা তাঁর আমল সম্পর্কে জানতে পারে যে, সালামের পর এসব বাক্য পাঠ করা ফরয ওয়াজিব কিছু নয়। বরং তা মুস্তাহাব কিংবা নফল পর্যায়ের ইবাদত।

জ্ঞাতব্য ঃ সালামের পর যিকর্ ও দু'আ সম্পর্কিত যে সব হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে সালামের পর যিকরও দু'আর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও আমল করতেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। এটা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। তবে সালামের পর মুক্তাদীগণ ও যে ইমামের অনুসরণে বাধ্য থাকার যে প্রথা চালু হয়েছে, যার ফলে কোন প্রয়োজনে ও ইমামের পূর্বে কারো উঠে চলে যাওয়াকে খারাপ মনে করা হয়, এটা একটা ভিত্তিহীন প্রথা এবং এটা সংশোধনযোগ্য বিষয়। সালাম ফেরানোর সাথে সাথে ইমামের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, তাই সালামের পরের দু'আতে ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যকীয় নয়। ইচ্ছা করলে কেউ সংক্ষিপ্ত দু'আ করে ইমামের পূর্বেই উঠে চলে যেতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে নিজের আবগ অনুভূতি অনুযায়ী দীর্ঘক্ষণ দু'আ করতে পারে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২)

সুন্নাত ও নফল সালাতসমূহ

দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে এবং বলা চলে তা ইসলামের অন্যতম রুকন এবং ঈমানের অন্যতম দাবি। এই ফরয সালাতের আগে কিংবা পরে অথবা অন্য কোন সময়ে কিছু সালাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উৎসাহিত করেছেন। এসবের মধ্যে যেগুলোর জন্য তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন অথবা অন্যকে তাগিদ দানের সাথে সাথে নিজে আমল করে দেখিয়েছেন সাধারণ পরিভাষার এগুলো সুন্নাত নামে অভিহিত এবং এ ছাড়া অপরাপর সালাতসমূহ নফল রূপে পরিচিত। যে সব সুন্নাত কিংবা নফল সালাত ফরয সালাতর পূর্বে আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তার বিশেষ হিক্মত হল এই যে, ফরয সালাতের মাধ্যমে বান্দা যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বিশেষ হাযিরী পেশ করে, তাই একাজ শুরু করার পূর্বে একাকী দুই-চার রাক'আত সালাত আদায় করে তাঁর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ সহ নিজকে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া জরুরী। পক্ষান্তরে যে সব সুন্নাত কিংবা নফল সালাত ফরয সালাতের পর আদায়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে তার হিক্মত হল এই যে, ফরয সালাতে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে গেছে তা প্রতিবিধান কল্পে কয়েক রাক'আত সুন্নাত কিংবা নফল সালাত আদায় করা হয়। তবে যে সকল সালাতের আগে কিংবা পরে কোন সুন্নাত কিংবা

নফল সালাত নেই অথবা সরাসরি রূপ সালাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে তাতেও কিছু হিক্মত আছে বৈকি! ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে এবিষয় বর্ণনা করা হবে।

ফরয সালাতের আগে পরে ব্যতীত যে সকল স্বতন্ত্র নফল সালাত রয়েছে যেমন চাশ্ত এবং রাতে তাহাজ্জুদের সালাত, তা মূলত কেবল আল্লাহ্র সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদেরই নসীব হয়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর সুন্নাত ও নফল সালাত সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীস পাঠ করা যেতে পারে।

দিন রাতের সুন্নাতে মু'আক্কাদ সালাতসমূহ

١٨٠- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ- رواه الترمذى

১৮০. হযরত উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাক'আত, (ফরয ছাড়াও সুন্নাত) সালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। তাহল যুহরের সালাতের পূর্বে চার রাক'আত পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের সালাতের পরে দুই রাক'আত, এশার সালাতের পরে দুই রাক'আত, এবং ফজরের সালাতের পূর্বে দুই রাক'আত। (তিরমিযী)

(উম্মু হাবীবা (রা) এই রিওয়ায়াতটি সহীহ্ মুসলিমেও রয়েছে কিন্তু সেখানে রাক'আত সমূহের বিস্তারিত পৃথক পৃথক বিবরণ নেই।)

ব্যাখা ঃ এই হাদীসে যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। আলোচ্য হাদীসের মর্মের অনুরূপ একটি হাদীস সুনানে নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল বিধৃত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায়ের পূর্বে ঘরে চার রাক'আত সুন্নাত সালাত আদায় করে নিতেন, এরপরে মসজিদে গিয়ে যুহরের সালাতের ইমামতি করতেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে নিতেন। অনুরূপ মাগরিবের সালাতের ইমামতি করার পর ঘরে ফিরতেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। হাদীসের শেষ পর্যায়ে তিনি (আয়েশা) বলেন, সুবহে সাদিক হলে প্রথমে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসে

যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক্‘আতের স্থলে দুই রাক্‘আতের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন পরবর্তী হাদীস থেকে তা জানা যাবে।

١٨١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِىْ بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ حِيْنَ يَطْلُعَ الْفَجْرُ- رواه البخارى ومسلم

১৮১. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুহরের পূর্বে দুই রাক‘আত ও পরে দুই রাক‘আত, মাগরিবের পরে দুই রাক‘আত, এশার পরে দুই রাক‘আত সালাত আদায় করেছি। তিনি বলেন, হাফ্‌সা (রা) আমার নিকট (এই মর্মে) হাদীস বর্ণনা করেন যে, ফজরের সময় হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে দুই রাক‘আত সালাত আদায় করে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যুহরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাক‘আত সালাতের কথা উল্লেখ আছে। এ পর্যায়ের সমস্ত হাদীস সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বে চার রাক‘আত সালাত আদায় করতেন। বলাবাহুল্য, উভয় প্রকার আমাল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। কাজেই যা আমল করা হবে, তাতে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। এই অধম (গ্রন্থকার) কোন কোন আলিমকে দেখেছে যে, তাঁরা বেশীর ভাগ সময়ে যহরের পূর্বে চার রাক‘আত সালাত আদায় করতেন। কিন্তু যখন তারা জামা‘আতের সময় নিকট মনে করতেন তখন দুই রাক‘আত সালাত আদায় করে নেওয়া যথেষ্ট মনে করতেন।

উপরোক্ত হাদীসসমূহে যে বার অথবা দশ রাক‘আত সুন্নাতের কথা উল্লিখিত আছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার্যত তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তিনি ঐ গুলোর কোন কোন সালাতের প্রতি বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন। এ জন্য এই সালাত সমূহকে সুন্নাতে মু’আক্‌কাদা বলে গন্য করা হয়। এই সালাত সমূহের মধ্যে তিনি ফজরের সুন্নাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ফজরের সুন্নাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং এর ফযীলাত

١٨٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - رواه مسلم

১৮২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) সালাত পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতেও উত্তম। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, পারকালে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাতের যে সাওয়াব পাওয়া যাবে তা "পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে" যেসব বস্তুর চাইতে অধিক মূল্যবান বিবেচিত হবে। কেননা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের সাওয়াব স্থায়ী ও অন্তহীন হবে। এ বাস্তব অবস্থা আখিরাতে আমাদের সামনে উম্মুক্ত হয়ে যাবে।

١٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْعُوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ - رواه أبو داؤد

১৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়া তোমাদেরকে তাড়ালেও তোমরা ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাত ছেড়ে দেবে না। (অর্থাৎ তুমি যদি সফরে থাক এবং গোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুত পথ অতিক্রম কর তবু ও ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাত ত্যাগ করবে না। সুনানে আবূ দাঊদ)।

١٨٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ - رواه البخارى ومسلم

১৮৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাতকে যতবেশী গুরুত্ব দিতেন অন্য কোন সুন্নাত কিংবা নফল সালাতের প্রতি এতটা গুরুত্ব দিতেন না। (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ - رواه الترمذى

১৮৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে পারে নি সে যেন সূর্য উঠার পর তা আদায় করে নেয়া (তিরমিযী)

ফজর ব্যতীত অপরাপর ওয়াক্তের সুন্নাত ও নফল নালাত সমূহের ফযীলত

١٨٥– عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلَعُ الشَّمْسُ – رواه الترمذى

১৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফযরের (পূর্বের) দু'রাকা'আত পড়ল না, তাকে অবশ্যই সূর্য উদয়ের পর দু'রাক'আত পড়তে হবে। (তিরমিযী)

١٨٦– عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ، قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ – رواه أبوداؤد وابن ماجه

১৮৬. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুহরের ফরয সালাতের পূর্বে এক সালামে যে ব্যক্তি চার রাক'আত সালাত আদায় করবে এর বদলৌতে তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উম্মুক্ত করে দেওয়া হবে। (সুনানে আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজাহ্)

١٨٧– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّ هُنَّ بَعْدَهَا – (رواه الترمذى)

১৮৭. হযতর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি(কোন কারণে) যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতে না পারতেন তবে যুহরের সালাতের পর তা আদায় করতেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ ইব্‌ন মাজাহ শরীফে এই রিওয়ায়াতটি আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে এরূপ অবস্থায় যে, তিনি যুহরের ফরযের পরে দুই রাক'আত এবং যুহরের পূর্বের চার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

١٨٨– عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ – (رواه أحمد والترمذى أبوداؤد والنسائى وابن ماجة)

১৮৮. হযরত উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সালাতের হিফাযত করবে আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেন যে, যুহরের ফরযের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই রাক'আত সালাত আদায়ের পক্ষে অধিক প্রমাণ মিলে। যেমন উপরের বর্ণিত হাদীস থেকে তা জানা যায় যে যুহরের ফরযের পর কেবল দুই রাক'আত সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত। তবে চার রাক'আত এভাবে আদায় করা যায় যে, দুই রাক'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদা আদায় করে অতিরিক্ত দুই রাক'আত নফল আদায় করা।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের দেশে যুহরের ফরযের দুই রাক'আত সুন্নাত শেষে দুই রাক'আত নফল আদায়ের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। তাই আধিকাংশ মানুষ সাধারণভাবে সকল ওয়াক্তের নফল বসে আদায় করে এবং তারা মনে করে নফল বসে আদায় করা চাই। অথচ তা নিতান্ত ভুল ধারণা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীসে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, বসে নফল আদায়ের সাওয়াব দাঁড়িয়ে আদায়ের তুলনায় অর্ধেক।

١٨٩- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا- (رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد)

১৮৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন যে আসরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করে। (আহ্মাদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ আসরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাক'আত নফল আদায়ের প্রতি এই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুপ্রেরণামূলক ঘোষণা এবং এ ব্যাপারে তাঁর আমলেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আসরের পূর্বে দুই রাক'আত নফল সালাত আদায়ের ব্যাপারেও তাঁর থেকে প্রমাণিত।

١٩٠- عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَبْنَ يَاسِرٍ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ وَقَالَ رَاَيْتُ حَبِيْبِىْ ﷺ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ- (رواه الطبرانى)

১৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন আম্মার ইবন ইয়াসির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)কে মাগরিবের পর ছয় রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলতেন, আমি আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাগরিবের পর ছয় রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি

বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত (নফল) সালাত আদায় করবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমান হয়। (তাবারানী)

ব্যাখ্যা ঃ মাগরিবের ফরযের পর হযরত উম্মু হাবীবা, আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) সূত্রে যে দুই রাক'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদা সালাতের কথা উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়। তা ব্যতীত যদি চার রাক'আত নফল আদায় করা হয় তবে নফল সংখ্যা ছয় রাক'আত দাড়ায়। কোন বান্দা যদি তা আদায় করে তবে এ হাদীসের গুনাহ মাফের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তা পাওয়ার যোগ্য হবে।

١٩١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ الاَّ صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ - (رواه أبوداؤد)

১৯১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার সালাত আদায়ের পর আমার হুজরায় প্রবেশ করে সব সময় চার রাক'আত অথবা ছয় রাক'আত নফল সালাত আদায় করতেন। (সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এশার ফরযের পর দুই রাক'আত সালাতের বিবরণ উম্মু হাবীবা, আয়েশা, ইব্ন উমার (রা) প্রমুখের বর্ণনা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীসে দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার সালাত আদায় করে ঘুমাবার পূর্বে সুন্নাতে মু'আক্কাদা দুই রাক'আত সালাত ব্যতীত কখনও দুই রাক'আত আবার কখন ও চার রাক'আত অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

বিতরের সালাত

١٩٢- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ - (رواه الترمذى وأبوداؤد)

১৯২. হযরত খারিজা ইব্ন হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (হুজ্রা থেকে) বের হয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একটি সালাত দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম আর তা হল সালাতুল বিত্র। আল্লাহ্

তোমাদের জন্য তা এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়ের জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

١٩٣- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا - (رواه أبو داؤد)

১৯৩. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ সালাতুল বিত্‌র হক (সত্য), যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সালাতুল বিত্‌র হক, যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সালাতুল বিত্‌র হক, যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ সালাতুল বিত্‌র সম্পর্কে এই হচ্ছে সর্বাধিক কঠোর নির্দেশনামা ও ধমক। এ ধরনের হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, সালাতুল বিত্‌র কেবলমাত্র সুন্নাত সালাত নয় বরং বিত্‌র নামায ওয়াজিব। অর্থাৎ এর মর্যাদা ফরযের নিচে এবং সুন্নাতে মুআ'ক্কাদার উপরে।

١٩٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ اَوِاسْتَيْقَظَ - (رواه الترمذى وأبوداؤد وابن ماجة)

১৯৪. হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলবশত সালাতুল বিত্‌র আদায় করে নি সে যেন স্মরণ হওয়ার অথবা ঘুম থেকে জাগার সাথে সাথে তা আদায় করে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজাহ্)

١٩٥- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرِ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا -(رواه مسلم)

১৯৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ তোমরা বিত্‌রকে তোমাদের রাতের শেষ সালাত বানাও। (শেষ সালাত যেন বিতরের সালাত হয়।) (মুসলিম)

١٩٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَلاَّ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرِ اَخِرِ اللَّيْلِ فَاِنْ صَلٰوةَ اَخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَالِكَ اَفْضَلُ (رواه مسلم)

১৯৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ শেষ রাতে উঠতে পারবে না বলে যার আশংকা রয়েছে, সে যেন প্রথম রাতেই এশার সাথে সাথে সালাতুল বিত্র আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারবে বলে আশা রাখে সে যেন রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদের পর সালাতুল বিত্র আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাতে রহমতের ফিরিশ্তারা উপস্থিত হয় এবং এটা বড়ই ফযীলতের সময় (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীস দু'টো দ্বারা সালাতুল বিত্র সম্পর্কে এই সাধারণ বিধান জানা যায় যে, সালাতুল বিত্র রাতের সকল সালাতের পরে আদায় করা উচিত এমন কি নফলেরও পরে। যার শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে নিজের প্রতি আস্থা রয়েছে সে যেন প্রথম রাথে সালাতুল বিত্র আদায় না করে বরং শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সাথে আদায় করে নেয়। আর যার নিজের উপর এই আস্থা নেই সে যেন প্রথম রাতেই তা আদায় করে নেয়। কিন্তু কোন কোন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে প্রথম রাতে সালাতুল বিত্র আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ঐ সকল অবকাশ প্রাপ্তদের অন্যতম। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে কতিপয় বিষয়ের উপদেশ দেন তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, "আমি যেন প্রথম রাতেই সালাতুল বিত্র আদায় করে নেই"।

١٩٧- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قُبَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ؟ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَثَلٰثٍ وَسِتٍّ وَّ ثَلٰثٍ وَّ ثَمَانٍ وَّ ثَلٰثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلٰثَةِ عَشَرَةَ – رواه أبو داؤد

১৯৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কুবায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কত রাক'আত সালাতুল বিত্র আদায় করতেন? তিনি বলেন, চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তের রাক'আতের বেশী তিনি সালাতুল বিত্র আদায় করতেন না। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন সাহাবী তাহাজ্জুদ ও সালাতুল বিত্রকে একত্রে বিত্র বলতেন। হযরত আয়েশা (রা) এ পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। তিনি এ হাদীসের আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কুবায়সের জিজ্ঞাসার জবাব উক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি

করে উপস্থাপন করেন। তাঁর বাণীর মর্ম হচ্ছে এই যে , রাসূসুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিত্‌রের প্রথমে কখনো চার রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, আমার কখনও ছয় রাক'আত, আবার কখনও আট রাক'আত, আবার কখনও দশ রাক'আত আদায় করতেন। কিন্তু সাধারণত চার রাক'আতের কম এবং দশ রাক'আতের বেশী তিনি তাহাজ্জুদ আদায় করতেন না এবং তাহাজ্জুদ সালাত শেষে তিনি তিন রাক'আত সালাতুল বিত্‌র আদায় করতেন।

সালাতুল বিত্‌রের কিরা'আত

١٩٨- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِاَىِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ - رواه الترمذى وأبو داؤد

১৯৮. হযরত আবদুল আযীয ইবন জুরায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিত্‌রে কোন কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি প্রথম রাক'আতে "সাব্বি হিস্‌মা রবিবকাল আলা" দ্বিতীয় রাক'আতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং তৃতীয় রাক'আতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযূ বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযূ বিরাব্বিন নাস" সূরা পাঠ করতেন। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিতরের প্রথম রাক'আতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা', দ্বিতীয় রাক'আতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং তৃতীয় রাক'আতে যে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন তা উবাই ইব্‌ন কা'ব এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বস (রা) এর রিওয়ায়াত থেকেও জানা যায়। কিন্তু এই দুই মহান সাহাবী তৃতীয় রাক'আতে "মু'আবিবযাতাইন" (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠের কথা উল্লেখ করেন নি। তৃতীয় রাক'আতে কখনও কখনও কেবল শুধু সূরা ইখ্‌লাস পাঠ করতেন। আবার কখনও সূরা ইখ্‌লাসের সাথে মু'আবিবযাতাইনও পাঠ করতেন।

সালাতুল বিতরে দু'আ কুনূত পাঠ করা

١٩٩- عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِىٍّ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِىْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ

عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَانَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ - (رواه الترمذ وأبوداؤد والنسائى وابن ماجه والدارمى)

১৯৯. হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিত্‌র পড়ার জন্য আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন। এ গুলো আমি সালাতুল বিতরে পাঠ করে থাকি। তা হল ঃ হে আল্লাহ্! যাদেরকে তুমি সৎপথ প্রদর্শন করেছ, আমাকেও তাদের সাথে সৎপথ প্রদর্শন কর, যাদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছ, তুমি তাদের সাথে আমার প্রতিও উদারতা দেখাও। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, তাদের সাথে আমারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তার মধ্যে বরকত দাও। তোমার নির্ধারিত অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই সিদ্ধান্ত দিতে পার, তোমার উপর কারও সিদ্ধান্ত চলে না। তুমি তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, সে কখনও অপমানিত হয় না, তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ কুনূত সম্পর্কীয় কোন কোন বর্ণনায় " لا يذل من واليت " (তুমি যার অভিভবকত্ব গ্রহণ করেছ সে কখনও অপমানিত হয় না (বাক্যের পর ولا " يعز من عاديت (যার সাথে তোমার বৈরিতা রয়েছে সে কখনো সন্মানিত হতে পারে না) এসেছে। আবার কোন কোন বর্ণনায় تباركت ربنا وتعاليت (তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ) বাক্যের পর " واستغفرك وأتوب اليك " আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি) এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় তাওবা ও ইসতিগ্‌ফারের বাক্যসমূহের পর এই দুরূদ " وصلى الله على النبى "- (আল্লাহ্ তা আমার তাঁর নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন) অতিরিক্ত এসেছে।

অধিকাংশ আলিম সালাতুল বিত্‌রে এই কুনূতই পাঠ করে থাকেন। হানাফী মাযহাবে যে কুনূত প্রচলিত তা হচ্ছে " اللّٰهُم انا نستعينكَ ونستغفرك الخ। এটি ইমাম ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইমাম তাহাভী (র) সহ অপরাপর আলিম হযরত উমার ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শামী (র) পূর্ব কালের কোন কোন হানাফী আলিমের এই মত উদ্ধৃত করেছেন যে

اللّٰهُم انا نستعينك ونستغفرك الخ পড়ার পর হাসান ইব্ন আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত দু'আ কুনূত اللهم اهدنى فيمن هديت পাঠ করা উত্তম।

٢٠٠- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ آخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنَ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ -(رواه أبوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجاة)

২০০. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিত্‌রের শেষ রাক'আতে এরূপ দু'আ পাঠ করতেন ঃ اللهم انى اعوذبك .... على نفسك "হে আল্লাহ্! আমি তোমার ক্রোধ থেকে সন্তুষ্টির এবং তোমার শাস্তি থেকে ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার যথাযথ প্রশংসা করতে সক্ষম নেই (আমি শুধু এটুকু বলতে পারি) তুমি তো এ রূপ যেমন তুমি নিজের প্রশংসা বর্ণনা করেছ। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ সুবহানাল্লাহ্ ! এই দু'আটি কতই না সূক্ষ্মমর্ম সম্বলিত! দু'আর মূল কথা হচ্ছে এই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি, আল্লাহ্‌র পাকড়াও আল্লাহ্‌র শাস্তি এবং তাঁর মাহিমাময় সত্তার থেকে তিনি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। কাজেই তাঁর অনুগ্রহ সাহায্য এবং দয়ার্দ্র সত্তাই কেবল আশ্রয় দিতে পারে। হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে শুধু এতটুকু কথা উল্লেখিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালাতুল বিতরের শেষ রাক'আতে এই দু'আ পাঠ করতেন। এর মর্ম এত হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় রাক'আতে কুনূত হিসেবে এই দু'আ পাঠ করতেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিম এই অর্থ বুঝেছেন। আবার হাদীসের মর্ম এও হতে পারে যে, বিত্‌র সালাতের শেষ বৈঠকের সালামের পূর্বে অথবা সালামের পরে এই দু'আ পাঠ করতেন। হাদীসের মর্ম এও হতে পারে যে, বিতরের শেষ সিজ্‌দায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করতেন। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাতের সালাতে এই দু'আ পাঠ করতে শোনেন। মোটকথা এ সব ব্যাখ্যাই সঠিক হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কে আমলের তাওফীক দিন।

٢٠١- عَنْ اُبَيِّ كَعَبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ - رواه أبوداؤد والنسائى وزاد ثلث مرات يطيلُ)

২০১. হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বার্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিতরের সালাম ফিরিয়ে বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস" (আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং তিনি ثلث مرات يطيل শব্দমালা অতিরিক্ত বর্ণনা করে পাঠ করতেন এবং তা দীর্ঘ করে পাঠ করতেন। আবার অন্য বর্ণনায় আছে যে, يرفع صوته بالثالثة তিনি তৃতীয়বারে এই কাব্যটি উচ্চস্বরে পাঠ করতেন।

বিত্‌রের পর দুই রাক'আত নফল সালাত

٢٠٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كَانَ نُصَلِّيْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ- رواه التِرْمِذِيْ وزاد ابن ماجه خفيفتين وَهُوَ جَالِسٌ

২০২. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের পর আরো দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (তিরমিযী)। ইব্‌ন মাজাহর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে তিনি বসে হাল্‌কাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ বিত্‌রের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দুই রাক'আত নফল সালাত বসে আদায় করার বর্ণনা হযরত উম্মু সালামা (রা) ছাড়াও হযরত আয়েশা ও হযরত আবূ উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত হাদীস সমূহের উপর ভিত্তি করে কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন ঃ বিতরের পর দুই রাক'আত সালাত বসে আদায় করাই উত্তম। কিন্তু অপরাপর আলিমগণ বলেছেনঃ এ বিষয়ে সাধারণ উম্মাতকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তুলনা করার অবকাশ নেই। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বসে সালাত আদায় করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বরাতে এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, বসে সালাত আদায়ে রয়েছে দাঁড়ান অবস্থায় সালাত আদায়ের চেয়ে অর্ধেক সাওয়াব, অথচ আপনি বসে সালাত আদায় করছেন ? তিনি বললেন ঃ মাস'আলাও ঠিক আছে (বসে আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্ধেক সাওয়াব) কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তোমাদের মত নই। আমার সাথে আল্লাহ্‌র রয়েছে তোমাদের তুলনায় ভিন্নধর্মী সম্পর্ক, অর্থাৎ আমার বসে সালাত আদায়েও রয়েছে পূর্ণ সাওয়াব। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ আলিম বলেছেন ঃ বিত্‌রের পর দুই রাক'আত নফলের ব্যাপারে পৃথক কোন নিয়ম নেই। বরং সাধারণ বিধান বসে সালাত

আদায়ে রয়েছে দাঁড়ান অবস্থায় সালাত আদায়ের চেয়ে অর্ধেক সাওয়াব কার্যকর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

বিত্‌র সম্পর্কে এই হাদীস উপরে আলোচিত হয়েছে যে, "বিত্‌র রাতের সর্বশেষ সালাত হওয়া চাই।" তবে বিতরের পর দুই রাক'আত সালাত আদায় এই হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা এই দুই রাক'আত ও বিতরের অনুগামী এর পৃথক কোন অবস্থান নেই।

কিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ সালাতের ফযীলত ও গুরুত্ব

এশা ও ফজর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন ফরয সালাত নেই । কাজেই এশার সালাত যদি প্রথম ওয়াক্তে কিংবা অল্প দেরীতে আদায় করা হয়, তবে ফজর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়। গভীর রাতের নীরবতায় পরিবেশ যেরূপ প্রশান্তিময় হয় অন্য সময় তা হয় না। যদি কেউ এশার পরে কিছু সময়ের জন্য নিদ্রা যায় এবং অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর (যা তাহাজ্জুদের প্রকৃত সময় উঠে যায় তবে যে একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে সালাত আদায় নসীব হয় তা অন্য সময়) তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, এ সময় শয্যা ত্যাগ করে সালাত আদায় করা প্রবৃত্তির শাসন ও প্রশিক্ষণের ও একটি মাধ্যম। কুরআন মাজীদে আছে اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً "অবশ্য রাতের উত্থান প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফুরণে সঠিক"। (৭৩, সূরা মুযযাম্মিল ঃ ৬) অন্যত্র বলা হয়েছে تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا "তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়"। (৩২, সূরা সাজ্‌দা ঃ ১৬) পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'এসব আমলকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাতে সম্মানজনক পুরস্কার যাতে রয়েছে তাদের জন্য নয়নাভিয়াম বস্তু সামগ্রী। আর এবিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জ্ঞাত নয়।'

কুরআন মাজীদের একস্থানে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাহাজ্জুদের নির্দেশ দানের সাথে সাথে 'মাকামে মাহমূদ' দানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا "এবং "রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করবে, এ হল তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (১৭, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

'মাকামে মাহমূদ' আখিরাতে এবং জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অবস্থান হবে। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, 'মাকামে মাহমূদ' এবং তাহাজ্জাদ সালাতের

মধ্যে কোন বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কোন মুসল্লী যদি গভীরভাবে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হয়, তবে আল্লাহ্ চাহেতে 'মাকামে মাহমূদে' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন যা কোন পর্যায়ের সাহচর্য তাঁর নসীব হতে পাবে।

সহীহ্ হাদীস সমূহ থেকে জানা যায় যে, রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি এক বিশেষ দয়া ও রহমত নিয়ে একান্তভাবে মানোনিবেশ করেন। কাজেই আল্লাহ্র যে সকল বান্দার মনে এ অনুভুতি জাগ্রত থাকে তারা ঐ বরকত পূর্ণ সময় তা বিশেষভাবে অনুভব করে থাকে। এই ভূমিকার পর কিয়ামুল লায়ল তাহাজ্জুদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠ করা যাক।

٢٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيْهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاغْفِرْ لَهُ - (رواه البخارى ومسلم)

২০৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন - কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তোর প্রার্থিত বস্তু তাকে দান করব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আল্লাহ্র অবতরণ সম্পর্কে যে বক্তব্য গুণাবলী ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ, যার হাকীকত সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। যেমনিভাবে আমরা ইয়াদুল্লাহ, ওয়াজহুল্লাহ্, ইস্তাওয়া আলাল আরশ্ ইত্যাদি গুর্ণাবলীও কর্মের হাকীকত সম্পর্কে অবহিত নই। আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডের হাকীকত ও অবস্থার জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার স্বীকৃতিই জ্ঞানের পরিচায়ক। পূর্ববর্তী আলিমগণের অভিমত এই যে, তাঁর সম্পর্কে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশই যথার্থ কাজ এবং এ গুলোর হাকীকতের বিষয় অপরাপর দুর্বোধ্য বিষয়ের ন্যায় আল্লাহ্র দিকে সোপর্দ করা চাই। একথা মেনে নেয়া ও কর্তব্য যে এগুলোর হাকীকত যা রয়েছে তা-ই সত্য। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের এই ভাষ্য পরিষ্কার যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকার সময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের

প্রতি নিজ দয়ায় বিশেষ অবস্থাসহ মনোনিবেশ করেন এবং তিনি তিনি স্বয়ং তাদেরকে দু'আ প্রার্থনা ও ক্ষমা চেয়ে নেয়ার জন্য আহবান জানাতে থাকেন। যে ব্যক্তি এই হাকীকতে দৃঢ় বিশ্বাসী তার জন্য ঐ সময় বিছানায় নিদ্রা বিভোর থাকা মূলত কষ্টকর যেমনিভাবে এ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির শয্যাত্যাগ করে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া কষ্টকর। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ দয়ায় এই হাকীকতের এমন বিশ্বাস আমাদের নসীব করুন যাতে আমরা ঐ সময়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর মহান দরবারে হাযিরী, দু'আ, প্রার্থনা ও ক্ষমা চেয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতে পারি।

٢٠٤- عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ - (رواه الترمذى)

২০৪. হযরত আম্‌র ইব্‌ন আবাসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাতের শেষ প্রহরে বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন। কাজেই ঐ মুবারক সময়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে সম্ভব হলে তখন তুমি ও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর যিক্‌র করার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যিক্‌র যদিও সাধারণ বিষয় কিন্তু সাধরণত যিক্‌রের সর্বোচ্চ পূর্ণাঙ্গরূপ। কেননা সালাতে অন্তর জিহবা ও অপরাপর সকল অঙ্গের যিকরের মিলন ঘটে।

٢٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ الصَّلٰوةُ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ - رواه مسلم

২০৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফরয সালতের পর সর্বোৎকৃষ্ট সালাত হল মধ্যরাতের (তাহাজ্জুদের) সালাত (মুসলিম)

٢٠٦- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الاِثْمِ - رواه الترمذى

২০৬. হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা উচিত। কেননা তা তোমাদের পূর্বেকার সজ্জনদের প্রতীক এবং তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। এ সালাত গুনাহসমূহ বিমোচনকারী। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে তাহাজ্জুদ সালাতের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। ১. তাহাজ্জুদ সালাত পূর্ববর্তী নেক্‌কারদের তরীকা ও প্রতীক, ২. আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের এক বিশেষ মাধ্যম এবং (৩) ও (৪) গুনাহ বিমোচন করে এবং গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে। প্রকৃতপক্ষে তাহাজ্জুদের সালাত এবং বিরাট সম্পদ। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (র.) সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাঁর ইন্‌তিকালের পর কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল আপনার প্রতিপালক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। জবাবে তিনি বললেনঃ হাকীকত ও মা'আরিফাতের উচুঁউচুঁ দরজার যে সবকাজ আমি দুনিয়াতে করেছিলাম তা আমার কোন উপকারে আসেনি, বরং মধ্যরাতে যে সালাত আদায় করেছিলাম তা-ই কাজে লেগেছে।

٢٠٧- عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَامَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا- رواه البخارى ومسلم

২০৭. হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এত দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন অথচ আপনার পূর্বাপর ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে (এবং কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে) তিনি বললেন ঃ তাই বলে কি আমি (এ মহা অনুগ্রহের জন্য অধিক ইবাদত করে শোক্‌র আদায়কারী বান্দা হব না ? (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ যদিও আমাদের মত গুনাহগারদের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অত ইবাদাত ও রিয়াযত করার প্রয়োজন নেই, এবং যদি ও তাঁর চলাফেরা এমনকি বিশ্রাম ও সাওয়াবের কাজ, তথাপিও রাতে তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পাদযুগল ফুলে উঠত। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের মত আরাম প্রিয় ও নায়েবে নবী হওয়ার দাবীদারদের জন্য শিক্ষণীয় সবক।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর গুনাহ ও ক্ষমা প্রসঙ্গে

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুনাহ (ذنب) ক্ষমা করার বিষয়টি স্থান পেয়েছে। আর সাধারণভাবে ذنب অর্থ গুনাহ। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে যে, নবী রাসূলগণ নিষ্পাপ এটা যেহেতু সত্যপন্থী মুসলিম উম্মাহ্র প্রতিষ্ঠিত আকীদা। তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গুনাহ্ ক্ষমা করার অর্থ কি দাঁড়ায় ? অধমের নিকট এ প্রশ্নের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হৃদয়স্পর্শী জবাব হল এই যে, তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ হল ঃ যে সব কাজ উম্মাতের ক্ষেত্রে পাপরূপে চিহ্নিত তিনি সে সব পাপ ও শরী'আত পরিপন্থী কাজ থেকে সম্পূর্ণ পূতঃ পবিত্র। তবে যে সব কাজ গুনাহ নয় মর্যাদার পরিপন্থী তা নবী-রাসূল থেকে ও সংঘটিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিজের উপর মধু হারাম করা, অথবা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মু মাকতূমের প্রতি অমনোযোগী হওয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ঘটনা দু'টিকে কেন্দ্র করে সূরা তাহ্রীম ও সূরা আবাসা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে তাঁর প্রতি গভীর প্রতি প্রকাশ পায় এমনভাবে সতর্ক করা হয়। মোটকথা এমনিতর সাধারণ পদস্খলন নবী-রাসূল থেকে প্রকাশ পেয়েছে যদিও এসব কাজ অবাধ্যতা কিংবা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু قريبا نرا بيش بود حيرانى "অধিক নৈকট্য, অধিক পেরেশানী" মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নবী-রাসূলগণ এত বেশি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়তেন যে, আমরা বিরাট বিরাট গুনাহ্ করেও তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই না। সুতরাং কুরআন হাদীসের যেখানেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য কোন নবী রাসূলের ক্ষেত্রে গুনাহ ক্ষমার বিষয় আলোচনা আসে তখন মনে করতে হবে যে, এমনিতর পদস্খলন তাঁদের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। ذنب এর আভিধানিক অর্থ এমন ব্যাপক যে, এর দ্বারা ও ত্রুটিও বুঝানো যায়।

٢٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رُجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَاَيْقَظَ اِمْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبِىْ نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِ الْمَاءَ - (رواه أبو داؤد والنسائى)

২০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হন যে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়। তার পর সে (স্ত্রী) সালাত আদায় করে। আর যদি স্ত্রী উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ সেই মহিলার প্রতিও সদয় হোন যে রাতে ঘুম থেকে উঠে, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায়। তারপর সে (স্বামী) সালাত আদায় করে। আর যদি স্বামী উঠতে অস্বীকার করে, তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়া (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীস বুঝার জন্য একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই বাণী যে সব সাহাবীর সামনে পেশ করেন তাঁরা তাঁর মুখে তাহাজ্জুদের কথা শুনে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এ সালাতে বান্দার কী কী উপকারিতা এবং এ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে কত বড় ক্ষতি হয়, এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল ছিলেন। মর্যাদার পার্থক্য সত্ত্বেও পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের এ অবস্থা সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হতো। তাই তাঁরা এ সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে সাধ্যমত আগ্রহী ছিলেন। তবুও কখনো কখানো এরূপ হয়ে যেত যে, কোন রাতে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গত আর স্ত্রী নিদ্রায় বিভোর থাকত অথবা স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গত আর স্বামী নিদ্রায় বিভোর থাকত, তখন জাগ্রত ব্যক্তি ঘুমন্তকে উঠাতে চাইতে কিন্তু ঘুমের তীব্রতা ও অলসতা বশত যদি সে উঠতে না চাইত, তবে প্রীতির বন্ধনের উপর নির্ভর করে চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিত এবং ঘুম ভাঙ্গত। বলাবাহুল্য একাজ বিরক্তি ও বিস্বাদের সৃষ্টি না করে বরং পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে উন্নতি সাধিত হয়। উল্লেখ্য এই হাদীসের সম্পর্ক সেরূপ অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দান কেবল ঐ সব স্বামী স্ত্রীর জন্য যারা এ সন্মান পাবার যোগ্য এবং তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে আগ্রহী।

তাহাজ্জুদ সালাতের কাযা ও তার প্রতি বিধান

٢٠٩- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ - رواه مسلم

২০৯. হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের নির্ধারিত ওয়াযীফা বা এর কোন অংশ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর তা ফজর ও যুহরের মাঝখানে পড়ে, তার জন্য এমন সাওয়াব লেখা হয় যেন সে রাতেই তা আদায় করেছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাতের জন্য কোন প্রকার ওয়াযীফা নিজে নির্ধারিত করে নেয় উদাহরণ স্বরূপ, আমি রাতে এত রাক'আত সালাত আদায় করব এবং তাতে কুরআন মাজীদে এত অংশ পাঠ করব, কিন্তু কোন রাতে সে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেয় সে ব্যক্তি যদি ঐ দিন যুহরের পূর্বে তা পাঠ করে নেয়, তবে রাতে আদায় করার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।

٢١٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلٰوةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجْعٍ اَوْ غَيْرِهِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً - رواه مسلم

২১০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রোগব্যাধি কিংবা অন্য কোন কারণে যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে না পারতেন তবে তিনি দিনের বেলায় বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন?

٢١١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ - رواه مسلم

২১১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতের সালাতের সংখ্যা ছিল তের। এর মধ্যে বিত্‌র এবং ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) ও রয়েছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাহাজ্জুদ সালাত সম্পর্কীয় সাধারণ আমল বর্ণনা করেছেন। নতুবা হযরত আয়েশা (রা.) এর অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাইতে কমও আদায় করতেন।

٢١٢- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعُ وَتِسْعُ وَاحِدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً سِوٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ - رواه البخارى

২১২. হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হযরত আয়েশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তিনি ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) ছাড়াও সাত বা নয় কিংবা এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা.) প্রদত্ত জবাবের মর্ম হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সাত রাক'আত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন (অর্থাৎ চার রাক'আত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাক'আত বিতর), আবার কখনো নয় রাক'আত (অর্থাৎ ছয় রাক'আত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাক'আত বিতর) আবার কখনো এগার রাক'আত (অর্থাৎ আট রাক'আত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাক'আত বিত্র) আদায় করতেন। এবিষয়ে সবিস্তার বিবরণ সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত আয়েশা (রা.)-এর রিওয়ায়াত বিধৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ সালাতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ

٢١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّى افْتَتَحَ صَلٰوتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ- رواه مسلم

২১৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে সালাত আদায়ের জন্য উঠতেন তখন প্রথমে হাল্‌কাভাবে দুই রাক'আত সালাত দিয়ে শুরু করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাল্‌কাভাবে প্রথমতঃ দুই রাক'আত সালাত আদায় করে মনে প্রফুল্লতা আনতেন। তারপর দীর্ঘ কিরা'আত যোগে সালাত আদায় করতেন। সহীহ্ মুসলিমেরই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রাতের সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায় সে যেন হাল্‌কাভাবে দুই রাক'আত দিয়ে সালাত শুরু করে।

٢١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ "اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاٰيَاتٍ لِاُولِى الاَلْبَابِ" فَقَرَأَ هٰؤُلاَءِ الاٰيَاتِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَالِكَ

ثَلثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكْعَاتٍ كُلَّ ذَالِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ - فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًاوَّاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلفِىْ نُوْرًا وَّ مِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا -

رواه مسلم

২১৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুইলেন। তারপর (তাহাজ্জুদের সময় হলে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে মিস্‌ওয়াক ও উযূ করেন। তিনি তখন পাঠ করছিলেন- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ " আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০) এই আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং তাতে কিয়াম, রুকূ ও সিজ্‌দা দীর্ঘায়িত করে তিনি কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েন। এমনকি তাঁর নাক ডাকার শব্দ হতে লাগল। এভাবে তিন বার করেন (অর্থাৎ তিনবার কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে মিস্‌ওয়াক ও উযূ করে দীর্ঘ কিয়াম, রুকূ ও সিজ্‌দাসহ দু'রাক'আত পড়লেন) এমনিভাবে তিনি (প্রথম দু' রাক'আত ব্যতীত) মোট ছয় রাক'আত পড়লেন। এবং প্রত্যেক বার উঠে তিনি মিস্‌ওয়াক করেন ও উযূ করেন এবং সূরা আলে ইমরানের ঐ আয়াতসমূহ পাঠ করেন। এরপর তিন রাক'আত বিতর নামায আদায় করেন। তারপর মু'আয্‌যিন আযান দিলে তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে বের হন। তখন তিনি বলছিলেন " হে আল্লাহ্! দান কর আমার হৃদয়ে নূর, আমার জিহবায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার পেছনে নূর, আমার সম্মুখে নূর, আমার উপরে নূর আমার নিছে নূর। হে আল্লাহ্! আমাকে নূর দান কর।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীস বুখারীও মুসলিম এবং অপরাপর হাদীস গ্রন্থসমূহে ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আরো সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য ও লক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সূরা আলে - ইমরানের শেষের আয়াতসমূহ তিনি ঘুম থেকে উঠার পর উযূ করার পূর্বেই পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে অপরাপর

বিরওয়ায়াত সূত্রে জানা যায় যে, দু'আ নূরী اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا الخ তিনি ফজরের সালাতে পাঠ করতেন। এ ছাড়া ও আরো কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন দুই দুই রাক'আতের মাঝখানে কিছুক্ষণ বিলম্ব করার পর নিদ্রায় যাওয়ার উল্লেখ এই রিওয়ায়াতে রয়েছে। কিন্তু অন্য বর্ণনায় তা নেই। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, দুই দুই রাক'আতের পরে নিদ্রা যাওয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাধারণ আমল ছিল না । বরং ঘটনাচক্রে কোন রাতে এরূপ আমল করেন। এই রিওয়ায়েতে হাল্‌কাভাবে দুই রাক'আত সালাত শুরু করার কথাও উল্লিখিত হয়নি। স্পষ্টত বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে তা বাদ পড়েছে এর প্রমাণ এই যে, এই হাদীসের অপর বর্ণনাকারীর বর্ণনায় পরিষ্কার তের রাক'আতের কথা উল্লিখিত হয়েছে, অথচ এই বর্ণনানুসারে মাত্র এগার রাক'আত হয়। উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় রাবী প্রথম হাল্‌কাভাবে দুই রাক'আত আদায়ের কথা উল্লেখ করে নি এবং সম্ভবত এই দুই রাক'আতকে তিনি তাহাজ্জুদ বহির্ভূত 'তাহিয়্যাতুল উযূ' মনে করেছেন। আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দু'আ নূরীতে নয়টি দু'আর বাক্য সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায় বাক্য সংখ্যা এর চেয়ে বেশিও পরিলক্ষিত হয়। এ অত্যন্ত বরকতময় নূরানী দু'আ। এই দু'আর মূল কথা হল এই যে, হে আল্লাহ্! আমার অন্তর, আত্মা, আমার শরীর, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা উপশিরায় নূর সৃষ্টি কর এবং আমাকে জ্যোতির্ময় করে দাও। আমার চারিপাশ ও উপর নিচ নূর দ্বারা পর্ণ কর। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এই আয়াতকে সামনে রেখে এই দু'আর মূল উদ্দেশ্য দাঁড়ায় এই যে, আমার অস্তিত্ব, আশপাশ তোমার জ্যোতি দ্বারা জ্যোতির্ময় করে দাও। আমার অন্তর-বাহির ও পরিবেশ তোমার রঙ্গে রঙ্গীন করে দাও। কেননা আল্লাহ্‌র বাণী صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً "আমরা আল্লাহ্‌র রঙ গ্রহণ করলাম রঙ্গে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর" ? (১, সূরা বাকারা ঃ ১৩৮)

٢١٥- عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا ذُوالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَاَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًامِّنَ الرُّكُوْعِهِ يَقُوْلُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ

الاَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيْ مَا يَقْعُدُ سِجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُوْدِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةِ اَوِ الاَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ - (رواه أبو داؤد)

২১৫. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে দেখেন।। তিনি সালাত শুরু করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহ্ আক্‌বার, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) তিনি সর্বস্বত্বের অধিকারী, প্রভাবশালী, মহোত্তম ও সম্মানিত। তারপর সালাত শুরু করেন এবং (সূরা ফাতিহার পর) সূরা বাকারা পাঠ করেন। এর পর প্রায় কিয়ামের সমপরিমাণ (দীর্ঘ) সময় রুকূ করেন এবং রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পাঠ করেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা উঠান এবং প্রায় রুকূর সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে 'লি রাব্বিয়াল হামদ' (আমার প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা), সিজ্‌দায় গিয়ে 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' পাঠ করেন (সিজ্‌দা ও দাড়াঁনোর মত দীর্ঘ ছিল)। তারপর সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠান এবং দুই সিজ্‌দার মাঝখানে প্রায় সিজ্‌দা পরিমাণ সময় বসে 'রাব্বিগ ফিরলী রাব্বিগ ফিরলী' (হে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার 'প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর) পাঠ করেন। এভাবে তিনি চার রাক'আত সালাতে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়িদা অথবা সূরা আন'আম পাঠ করেন। বর্ণনাকার তার উস্তাদ আমর ইব্‌ন মুররা শেষ রাক'আতে মায়িদা না আন'আম পাঠ করার কথা বলেছিলেন সে বিষয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ এমনিতর দীর্ঘ কিরা'আত ও দীর্ঘ রুকূ সিজ্‌দার সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাহাজ্জুদ আদায়ের ঘটনা হযরত হুযায়ফা (রা) ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত। আছে। হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক আশজায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন যাতে প্রথম দুই রাক'আতে তিনি সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পাঠ করেন। তারপর দুই রাক'আতে এমনিতর দু'টি দীর্ঘ সূরা সম্ভবতঃ সূরা নিসা ও মায়িদা পাঠ করেন। এসব সূরা তিনি এমনভাবে পাঠ করেন যে, যেখানে রহমতের আয়াত আসত, সেখানে দীর্ঘক্ষণ রহমত কামনা করে দু'আ করতেন; আবার যেখানে আযাবের আয়াত আসত সেখানে দীর্ঘক্ষণ আযাব থেকে নিস্কৃতির দু'আ করতেন।

প্রকাশ থাকে যে, তাহাজ্জুদ সালাতের ন্যায় অন্যান্য নফল সালাতে ও কিরা'-আতের মাঝখানে দু'আ করা জায়িয বলে সকলেই একমত ।

٢١٦- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

رواه النسائى وابن ماجة

২১৬. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ান এবং একটি মাত্র আয়াত পাঠ করতে করতে ভোর হয়ে যায় আয়াতটি হল اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَتَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ "তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা আর যদি তাদের ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পারাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (৫, সূরা মায়িদা ঃ ১১৮) (নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ একবার একরাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ান এবং এক বিশেষ অবস্থায় একটি আয়াত বারবার পাঠ করতে থাকেন এমনকি সকাল হয়ে যায়। আয়াতটি হল এই اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّكَ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র এক গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে হযরত ঈসা (আ)-এর উযর পেশের অংশ বিশেষ। সূরা মায়িদার শেষ রুকূতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঈসায়ী ধর্মাবলম্বীদের উপর দলীল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলবেন, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ্রূপ গ্রহণ কর? হযরত ঈসা (আ) এ ব্যাপারে নিজের সম্পর্কহীনতার বিষয়টি পরিষ্কার করে বলবেন, তোমার কাছে তো কোন কিছু গোপন নেই। তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। তুমি ভালভাবে অবগত আছে যে, আমি তাদের তাওহীদের প্রতি আহবান করেছিলাম। আমাকে উত্তোলিত করে নেয়ার পরই তারা শিরকে জড়িয়ে পড়েছিল। তারপর হযরত ঈসা (আ)-এর জবাবের একটি অংশ হল এই আয়াত اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّكَ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ যদি তাদের এ অপরাধের জন্য শাস্তি দাও তবে তোমার এ অধিকার আছে আর ক্ষমা করে দেওয়াও তোমার ইখ্তিয়ার। তোমার সিদ্ধান্ত তোমার ইচ্ছা ও হিক্মতের ভিত্তিতেই হবে কারো চাপে না। রাত থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত এই আয়াত পাঠের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কতিপয় ভাষ্যকার লিখেছেনঃ এই আয়াত পর্যন্ত পৌছার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত তাঁর উম্মাতের কথা মনে

পড়ে যে পূর্ববর্তী উম্মাতের ন্যায় আকীদা বিশ্বাস ও কাজে তাঁর উম্মাতের মধ্যেও বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর আকুতিপূর্ণ বাণী আল্লাহ্র দরবারে বারবার পাঠ করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٢١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قِرَأَةُ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَّيَخْفِظُ طَوْرًا- رواه أبوداؤد

২১৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রাতের সালাতের কিরা'আত কখনো উচু স্বরে হত আবার কখনো নিচুস্বরে হত। (আবু দাঊদ)

(٢١٨) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِاَبِىْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهٖ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّى رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اَجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ تَخْفَضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اَسْمَعْتُ مِنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِرْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا - رواه أبوداؤد)

২১৮. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘর হতে বের হন এবং আবূ বাকর (রা) কে নিচুস্বরে সালাতে কিরা'আত পাঠ করতে দেখেন। হযরত উমর (রা) এর নিকট দিয়ে যাবার সময় তাঁকে উচুঃস্বরে সালাতে কিরা'আত পাঠ করতে শুনেন। তারপর তাঁরা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদ্মতে এল, তিনি আবূ বাকর (রা) কে আমি তোমার কাছ দিয়ে যাবার সময় তোমাকে নিচুস্বর সালাতে কিরা'আত পাঠ করতে দেখেছি। তিনি (আবূ বাকর) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যার কাছে আরযি পেশ করছিলাম, তিনি (আল্লাহ্) তা শুনেছেন। এরপর উমর (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি উচুঃস্বরে কিরা'আত পাঠ করে অলস নিদ্রিতদের এবং শয়তান তাড়াবার ইচ্ছা কয়েছিলাম। এর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবূ বাকর! তোমার স্বর কিছুটা উচু করবে আর উমরকে বললেন তোমার স্বর খানিকটা নিচু করবে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ তাহাজ্জুদ সালাতে কিরা'আত একেবারে যেমন নিচুস্বরে পাঠ করা উচিত নয় তেমনি উচ্চঃস্বরে পাঠ করাও সমীচীন নয় বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। এ হাদীসের মর্ম এটাই। কিন্তু কোন সময় নিচু স্বরে কিরা'আত পাঠ করা যদি অধিক সমীচীন বোধ হয়, তবে নিচুস্বরে কিরা'আত পাঠ করাই শ্রেয়। পক্ষান্তরে কখনো উচ্চঃস্বরে কিরা'আত পাঠ করা যদি অধিক সমীচীন বোধ হয়, তবে উচ্চঃস্বরে কিরা'আত পাঠ করাই শ্রেয়।

চাশ্‌ত অথবা ইশরাকের সালাত

এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে কোন ফরয সালাত নেই। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময়ের মধ্যে কয়েক রাক'আত তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ দান করেছেন। একইভাবে ফজর থেকে শুরু করে যুহর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে কোন ফরয সালাত নেই। কাজেই এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুই কিংবা তাতোধিক রাক'আত সালাতদ-দুহা বা চাশ্‌তের সালাত আদায় করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যদি সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই এই সালাত আদায় করা হয়, তবে তাকে ইশরাক এবং সূর্যের আলো খানিকটা উপরে উঠার পর আদায় করা হলে তাকে 'চাশ্‌ত' বলা হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রা) এ সালাতের হিক্‌মত বর্ণনা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ "আরবদের নিকট ফজর থেকে দিনের সূচনা হয় এবং তাকে তারা চার প্রহরের প্রথম প্রহর বলে। আল্লাহ্‌র হিক্‌মতের দাবী হচ্ছে, এই প্রহরের কোন প্রহর যেন সালাতবিহীন না কাটে এই জন্যই প্রথম প্রহরের শুরুতে ফজর সালাত ফরয করা হয়েছে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহরে যথাক্রমে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করা হয় এবং দ্বিতীয় প্রহরে মানুষ যেহেতু জীবিকা অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে তাই সে সময়কে ফরয সালাত মুক্ত রাখা হয়েছে। এসময়ের মধ্যে নফল ও মুস্তাহাবরূপে চাশ্‌তের সালাত রাখা হয়েছে। এর ফযীলাত ও বরকত বর্ণনা করে তা আদায়ের ব্যাপারে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার প্রচণ্ড ব্যস্ততার নিগড় থেকে বেরিয়ে এসে ঐ সময়ে কয়েক রাক'আত সালাত আদায় করবে তার জন্য সফলতা অনিবার্য।

চাশ্‌তের সালাত কমপক্ষে দুই রাক'আত আদায় করা চাই। তবে চার কিংবা আট রাক'আত আদায় করা আরো উত্তম। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)

এই ভূমিকার পর চাশ্‌তের সালাত সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

٢١٩- عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى - رواه مسلم

২১৯. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ভোর হওয়া মাত্র তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য (সুস্থভাবে উঠা আল্লাহ্র শুকুর স্বরূপ) একটি করে সাদাকা (সাওয়াবের কাজ করা আবশ্যক। সাওয়াবের তালিকা দীর্ঘ) তোমাদের প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ্' বলাই একটি সাদাকা, প্রত্যেক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলাই একটি সাদাকা, প্রত্যেক 'আল্লাহু আকবার' বলাই একটি সাদাকা, সৎকাজের আদেশ দান একটি সাদাকা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সাদাকা। তবে চাশ্তের সময় দুই রাক'আত সালাত আদায় করা ঐ শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একটি করে দান সাদাকা করা আবশ্যক। তবে চাশ্তের দুই রাক'আত সালাত এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা এই সাধারণ শোকরকে প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে কবূল করে নিবেন। সম্ভবত এর কারণ এই যে, সালাত এমন একটি ইবাদাত যা আদায় করতে মানুষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিসমূহ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে অংশগ্রহণ করে থাকে।

٢٢٠- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِى ذَرٍّ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِنَّهُ قَالَ يَابْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ - (رواه الترمزى)

২২০. হযরত আবূ দারদা ও হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলেছেন যে আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের শুরুতে চার রাক'আত সালাত আদায় কর, আমি দিনের শেষ প্রহর পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্র যে বান্দা তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ইশরাক অথবা চাশ্তের সময় একান্ত নিষ্ঠার সাথে চার রাক'আত সালাত আদায়

করবে, আল্লাহ্ চাহেত সে লক্ষ্য করলে দেখবে কিভাবে রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলা তার সারাদিনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেন।

٢٢١- عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى ؟ قَالَتْ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ لِلّٰهِ - رواه مسلم

২২১. হযরত মু'আযা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশ্‌তের সালাত কত রাক'আত আদায় করেন। তিনি বললেন ঃ চার আক'আত তবে কখনো আল্লাহ্ চাইলে বেশিও আদায় করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীস থেকে জানা যায় যে,রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশির ভাগ সময় চাশতের সালাত চার রাক'আতই আদায় করতেন। তবে কখনো কখনো বেশিও আদায় করতেন। (আয়েশা (রা.) নিজে আট রাক'আত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি এ সালাত আদায় করতে এত ভালবাসতেন যে, তিনি বলেন ঃ "আমার পিতামাতাকে যদি পুনঃ দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয় (সেই আনন্দের মধ্যে থেকেও) আমি এই দুই রাক'আত সালাত বর্জন করব না।"

٢٢٢- عَنْ أُمِّ هَانِىٍّ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكْعَاتٍ فَلَمْ أَرَى صَلٰوةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَقَالَتْ فِىْ رِوَايَةٍ أُخْرَى وَذَالِكَ ضُحٰى- (رواه البخارى ومسلم)

২২২. হযরত উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা.) তাঁর ঘরে যান এবং গোসল করেন। তারপর আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। তিনি (উম্মু হানী) বলেন ঃ আমি তাঁকে কখনো এরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি রুকূ-সিজ্‌দা পুরোপুরি আদায় করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত উম্মু হানী (রা) বলেন ঃ এটি ছিল চাশ্‌তের সময়। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (رواه أحمد والترمذى ابن ماجة)

২২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে চাশ্‌তের দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা রাশির সমান হয়। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ সৎকাজের পাপ মোচনের বিষয়ে ইতোপূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা এ স্থানে ও স্মরণ রাখা চাই।

٢٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّ رَكْعَتَىِ الضُّحَى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَرْقُدَ - رواه مسلم

২২৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ে আমাকে সবিশেষ ওয়াসীয়াত করেছেন। তা হল, প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা, চাশ্‌তের দুই রাক'আত সালাত আদায় করা এবং নিদ্রা যাবার পূর্বে যেন আমি বিতরের সালাত আদায় করি। (মুসলিম)

٢٢٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُصَلِّيْهَا- (رواه الترمذى)

২২৫. হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশ্‌তের সালাত আদায় করতেন যাতে আমরা বলাবলি করতাম যে, তিনি তো আর কখনো ছেড়ে দিবেন না। আবার কখনো তা ছেড়ে দিতেন যাতে আমরা বলাবলি করতাম যে, তিনি তা আর কখনো আদায় করবেন না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) একস্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাশতের সালাত আদায় না করার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তাঁর প্রিয় আমলসমূহ বর্জন করতেন, কারণ তাঁর আশংকা ছিল যে, তাঁর ধারাবাহিকতা দেখে পাছে মুসলমানরাও বাধ্যতামূলকভাবে তা অনুসরণ করে এবং তা ফরয না হয়ে পড়ে।"

মোদ্দাকথা, ইশ্‌রাক ও চাশ্‌তের সালাত কখনো কখনো তিনি বিশেষ কারণে ছেড়ে দিতেন এবং এরূপ উদ্দেশ্য বর্জনকারীকে বর্জনকালীন সময়ের আমলের সাওয়াবও দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, এই বিবেচনার বিষয় ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য অপর কারো জন্য এ অবস্থান নয়।

বিশেষ সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নফল সালাতসমূহ

ফজরের আগে কিংবা পরে নফলসমূহ এবং এমনিভাবে তাহাজ্জুদ, ইশ্‌রাক ও চাশ্‌তের সালাত–এসবের জন্য সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু কিছু নফল সালাত এমন রয়েছে যা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন তাহিয়্যাতুল উযূ অথবা তাহিয়্যাতুল মসজিদ, এমনিভাবে হাজতের সালাত, তাওবার সালাত, ইস্তিখারার সালাত ইত্যাদি। স্পষ্টতই এসব সালাত কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং সময় ও অবস্থার দাবির প্রক্ষিতে এসকল সালাত আদায় করা হয়। এসবের মধ্যে তাহিয়্যাতুল উযূর সম্পর্কীয় হাদীস উযূর বর্ণনায় পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ এর সাথে সম্পৃক্ত হাদীসমূহ ও 'মসজিদের গুরুত্ব ও ফযীলত' শিরোনামের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট নফল সালাতসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

সালাতুল ইসতিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনার সালাত)

٢٢٦– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْبَكْرٍ وَّصَدَقَ اَبُوْبَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَءَ «وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ» رواه الترمذى

২২৬. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে বলেছেন এবং তিনি সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করবে, তারপর পবিত্রতা অর্জন করে কিছু সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এরপর তিনি পাঠ করেন ঃ "وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ" "এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (৩, সূরা আল ইমরান ঃ ১৩৫)

ব্যাখ্যা ঃ গুনাহ ক্ষমা করার বিষয় সম্বলিত যে আয়াত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেছেন তা সূরা আলে ইমরানের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতে আল্লাহ্‌র ঐ সকল বান্দার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যাদের জন্য বিশেষভাবে জান্নাত তৈরি করে রাখা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ * اُوْلٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ –

"এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে তা জেনেশুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না, এরা তো তারাই যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫-১৩৬০)

যে সকল লোক পাপ কাজকে অভ্যাসে বা পেশায় পরিণত করে না আলোচ্য হাদীসে সে সকল গুনাহ্গারদেরকে ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বরং তাদের অবস্থা এই যে, যখন তাদের দ্বারা কবীরা কিংবা সগীরাগুনাহ সংঘটিত হয় তখন ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীসে এও বলেছেন যে, আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল এই, উযূ করে প্রথমে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিজ গুনাহের জন্য আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কাজেই কেউ যদি এরূপ করে আল্লাহ্ তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন।

সালাতুল হাজাত (প্রয়োজন পূরণের সালাত)

٢٢٧– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِّمَّا كُلِّ بِرٍّ وَّ السَّلاَمَةَ مِّنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ– (رواه الترمذى وابن ماجة)

২২৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আল্লাহ্র কাছে অথবা আদম সন্তানের কাছে কোন প্রয়োজন রয়েছে সে যেন প্রথমে উত্তমরূপে উযূ করে, তারপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, এরপর আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করে, তারপর এই দু'আ পাঠ করে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِسْمٍ لاَ تَدَعْ لِىْ اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি পরম সহিষ্ণু ও মহামহিম। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ্ অতি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ জন্য। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার রহমত লাভের উপায়সমূহ, তোমার ক্ষমা লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের ধনভাণ্ডার এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে মহা অনুগ্রহকারী ! আমার প্রতিটি অপরাধ ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতিটি দুশ্চিন্তা দূর করে দাও এবং যে প্রয়োজন ও চাহিদা তোমার সন্তোষ লাভের কারণ হয় তা পরিপূর্ণ করে দাও'। (তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান যে একমাত্র আল্লাহ্ হাতে নিবদ্ধ এ বিষয়ে কোন মু'মিনের সন্দেহের অবকাশ নেই। আপাতদৃষ্টিতে যে কাজ বান্দা নিজ হাতে সম্পাদন করে তাও মূলতঃ আল্লাহ্র হাতে নিবদ্ধ এবং তাঁর নির্দেশেই তা কার্যকর হয়। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল হাজাতের যে পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। যারা ঈমানের হাকীকতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাদের এ বিষয় অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তারা সালাতুল হাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র ধন ভাণ্ডারের চাবি লাভ করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে বান্দার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সালাতুল হাজাত আদায়ের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন। এর এক বিশেষ উপকারিতা এই যে, বান্দা যখন তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সালাতুল হাজাত আদায় করে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে তখন তাদের মনে এ বিশ্বাসই জন্মে যে, সকল কাজের নিয়ন্ত্রয় মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা, বান্দা নয় এবং কোন

বিষয়ের উপর বান্দার কোন ইখ্তিয়ার নেই। বরং সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার হাতে নিবদ্ধ। বান্দা কেবল কর্মক্ষমতা রাখে মাত্র। এর পরও যখন বান্দার হাতে কাজ পূর্ণতা প্রাপ্তির দৃশ্য দেখা যায় তখনও তাওহীদের বিশ্বাসে কোন শিথিলতা দেখা দেয় না।

٢٢٨- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلَّى - رواه أبو داؤد

২২৮. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন কোন বিষয় চিন্তাযুক্ত করত তখন তিনি সালাত আদায় করতেন। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর (২, সূরা বাকারা ঃ ৪৫)। আল্লাহ্র এ বাণীর দাবি পূরণার্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন প্রকার বিপদের আশংকা করতেন তখন সালাতে মনোনিবেশ করতেন এবং তিনি স্বীয় উম্মাতকে ও এ বিষয়ে সবিস্তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যেমন উপরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

ইস্তিখারার সালাত

মানুষের জ্ঞানসীমিত। বেশির ভাগ সময় এমন মনে হয় যে, মানুষ কোন একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নিবে সম্পাদনও করে কিন্তু তা পরিণামে শুভ হয়না। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ইস্তিখারার সালাত আদায়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন এবং বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন দিক নির্দেশ নেয়ার লক্ষ্যে সে যেন আল্লাহ্র কাছে কল্যাণের তাওফীক কামনা করে।

٢٢٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِى الأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، يَقُوْلُ اِذَاهَمَّ اَحَدُكُمْ بِالاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ- اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا الاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ (اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ

اَمْرِیْ وَاٰجِلِه) فَاقْدِرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اِنَّ هٰذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ (اَوْ قَالَ فِیْ
عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَیْرَ
حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ قَالَ یُسَمِّیْ حَاجَتَهُ - رواه البخاری

২২৯. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটি কাজে আমাদেরকে ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয ব্যতীত দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। তারপর বলে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। তুমিই শক্তি ও ক্ষমতার আধার, আমার কোন ক্ষমতা নেই। তুমি অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী, আমার কোন জ্ঞান নেই। তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ও সম্যকভাবে জ্ঞাত। হে আল্লাহ্! তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য, আমার দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজের পরিণামের দিক থেকে, অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন; আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে কল্যাণকর মনে কর, তবে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও। পক্ষান্তরে তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য আমার দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজকর্মের পরিণামের দিক থেকে, অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে ক্ষতিকর মনে কর, তবে তুমি সে কাজটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে বিরত রাখ। যেখান থেকে হোক তুমি আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ও বলেছেন প্রার্থনাকারী যেন এ কাজটির স্থলে নিজের উদ্দিষ্ট কাজের নাম করে। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ এই দু'আ থেকে ইস্তিখারার হাকীকত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আর ইস্তিখারার তাৎপর্য হল, মানুষ তার বিনয়ভাব ও অজ্ঞতা স্বীকার করে জ্ঞানের আধার, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নির্দেশনা ও সাহায্য চাইবে এবং নিজের ব্যাপারটিকে তাঁর উপর ন্যস্ত করে দিবে, যেন তিনি তাই নির্ধারণ করেন যা তার জন্য উত্তম ও কল্যাণকর। এহেন দু'আ দ্বারা বান্দা মূলতঃ নিজ ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র মর্জির মধ্যেই বিলীন করে দেয়। যদি এই দু'আ আদর থেকে উৎসারিত হয় তবে.

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে পথনির্দেশ করবেন না কিংবা সাহায্য করবেন না এমনটি কখনো হতে পারে না। বান্দা কিভাবে পথ নির্দেশ লাভ করবে, হাদীসে তার কোন ইঙ্গিত নেই। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় বান্দাদের এ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, স্বপ্নযোগে অথবা অদৃশ্য লোকের ইঙ্গিতে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। আবার কখনো কখনো এরূপ হয় যে, কর্ম সম্পাদনকারীর স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত কাজে প্রবল স্পৃহা জন্মে অথবা বিপরীত দিকে উক্ত কাজের অনীহা কাজে উভয় অবস্থাকেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং দু'আ কবূল হওয়ার ফল গণ্য করা উচিত। যদি ইস্তিখারা করার পরও অন্তরে দোদুল্যমানভাব বিরাজ করে, তাহলে বারবার ইস্তিখারা করা যেতে পারে এবং যতক্ষণে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা না যাবে ততক্ষণে পিছপা হওয়া যাবে না।

মোটকথা সালাতুল ইস্তিগ্ফার, সালাতুল হাজাত ও সালাতুল ইস্তিখারা আল্লাহ্ তা'আলার মহান নি'আমাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে এ উম্মাত লাভ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন।

সালাতুত্ তাসবীহ্

٢٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اُخْبِرُكَ اَلاَ افْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذَالِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمَدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَنَهُ اَنْ تُصَلِّىَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَفَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسُ عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذَالِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَالِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ

تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةُ فَاِنْ لَمْ
تَفْعَلُ فَفِى عُمُرِكَ مَرَّةً - رواه أبوداؤد وابن ماجة والبيهيقى فِى
الدعوات الكبير - وروى الترمذى عن أبى رافع نحوه

২৩০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে বলেন ঃ হে আব্বাস! হে প্রিয়তম চাচা! আমি কি আপনাকে দান করব না। আমি কি আপনাকে উপহার দিব না, আমি কি আপনাকে অবহিত করব না, আমি কি আপনার জন্য দশটি কাজ করব না। আপনি যদি তা করেন আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন, প্রথমের গুনাহ শেষের গুনাহ, পুরনো গুনাহ- নতুন গুনাহ, অনিচ্ছাকৃত গুনাহ - ইচ্ছাকৃত গুনাহ সগীরাগুনাহ - কবীরা গুনাহ এবং গোপন গুনাহ ও প্রকাশ্য গুনাহ (সে আমল সালাতুস তাসবীহ্ এবং এর পদ্ধতি)। আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। এর প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন। যখন আপনি প্রথম রাক'আতের কিরা'আত শেষে দাঁড়াবেন তখন পনের বার 'সুবাহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহু ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' পাঠ করবেন। এরপর রুকূ করবেন এবং রুকূ অবস্থায় এ বাক্য দশবার বলবেন। এর পর রুকূ থেকে মাথা উঠাবেন এবং দাঁড়ান অবস্থায় তা দশবার পাঠ করবেন। তার পর সিজ্‌দায় যাবেন এবং সিজ্‌দা অবস্থায় তা দশবার পাঠ করবেন। এরপর সিজ্‌দা হতে মাথা উঠাবেন এবং দশবার তা পাঠ করবেন। তারপর সিজ্‌দায় যাবেন এবং তা দশবার বলবেন। এবং পর মাথা উঠাবেন এবং তা দশবার বলবেন। সুতরাং এভাবে প্রত্যেক রাক'আতে পঁচাত্তর বার পাঠ করবেন। এভাবে আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। যদি আপনি প্রত্যহ একবার এরূপ সালাত আদায় করতে পাবেন করবেন। যদি তা করতে না পারেন, তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করবেন। যদি তাও না পারেন, তবে প্রত্যেক মাসে একবার করবেন। যদি তাও করতে না পারেন, তাহলে বছরে একবার আদায় করবেন। যদি তাও না পারেন, তবে অন্ততঃ জীবনে একবার আদায় করবেন। (আবূ দাঊদ, ইব্‌ন মাজাহ, বায়হাকীর দাওয়াতুল কাবীর। তিরমিযী (র.) আবূ রাফি' (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস গ্রন্থসমূহে বিপুল সংখ্যক সাহাবী 'সালাতুত তাসবীহ্' এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় বিষয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মুক্তদাস হযরত আবূ রাফি (রা.) সূত্রে এ

বিষয়ে রিওয়ায়াত বর্ণনার পর লিখেছেন যে, এছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর এবং ফাযল ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে ও বর্ণিত আছে। হাফিয ইব্ন হাজার (র.) 'আল খিসালুল মুকাফ্ফিরাহ' গ্রন্থে ইব্ন জাওযীর এ হাদীস সংক্রান্ত অভিযোগ প্রত্যাখান করে[১] তার সূত্রের উপর সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর এই আলোচনার মূলকথা হল, এই হাদীসখানা কমপক্ষে 'হাসান' তথা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের । কিছু সংখ্যক তাবিঈ ও তাবে তাবিঈ যাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (রা) ও রয়েছেন। তাঁরা সালাতুত্ তাসবীহ্ আদায়ের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। এবং তাঁরা যে ফযীলাত বর্ণনা করেছেন তাও প্রামাণ্য বর্ণনা। তাঁদের মতে, সালাতুত্ তাসবীহ্'র শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা সংক্রান্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। দীর্ঘকাল যাবত সালাতুত তাসবীহ্ সজ্জনদের আমলরূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

হযরত শাহ্ওয়ালী (র.) এই সালাত সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম কথা লিখেছেন যার সারমর্ম নিম্নরূপঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সকল সালাতের বিবিধ রকমের যিক্র ও দু'আ প্রমাণিত। কাজেই আল্লাহ্র কোন বান্দা যদি এসব যিক্র ও দু'আ স্বীয় সালাতে পুরোপুরি আদায় করতে না পারে তার জন্য 'সালাতুত তাসবীহ্' পূর্ণভাবে আদায়ের মধ্য দিয়ে তা উক্ত দু'আ ও যিকরের স্থলাভিষিক্ত রূপে বিবেচিত হতে পারে। কেননা এতে আল্লাহ্র যিক্র, তাস্বীহ্, তাহ্মীদ ইত্যাদির বিরাট অংশের সমাবেশ ঘটেছে। এ সালাতে যেহেতু একটি বাক্যই বারবার পাঠ করার বিধান রয়েছে তাই সাধারণের জন্য এ ধরনের সালাত আদায় করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সালাতুত তাসবীহ্ আদায়ের যে পদ্ধতি ইমাম তিরমিযী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) থেকে প্রমাণিত তাতে অপরাপর সালাতের ন্যায় কিরা'আতের পূর্বে 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা' শেষ পর্যন্ত, রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' সাজ্দায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক রাক'আতে কিরা'আত পাঠের পূর্বে কিয়াম অবস্থায় 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' পনেরবার, কিরা'আতের পর রুকূতে যাবার পূর্বে এই বাক্যটি দশবার পাঠ করার বিষয় উল্লেখ আছে। এভাবে প্রত্যেক রাক'আতের কিয়ামে এই বাক্যটি পঁচিশবার পাঠ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় সিজ্দার পর এই বাক্যটি কোন

টিকা.১. আল্লামা ইব্ন জাওযী (র.) এর হাদীস গ্রহণের কঠোর সর্বজনবিদিত। তিনি এমন বহু হাদীসকে জাল বলেছেন যা বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রতিষ্ঠিত সত্য প্রমাণ্য। তিনি সালাতুত্ তাসবীহ্ সংক্রান্ত হাদীস ও জাল হাদীস মনে করেন। হাফিয ইব্ন হাজার (র.) 'আল খিসালুল মুকাফ্ফিরাহ' গ্রন্থে তাঁর এ অভিযোগ খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রাক্'আতে পাঠ করা হবে না, এভাবে এই বাক্যটি প্রত্যেক রাক'আতে পঁচাত্তরবার করে হবে এবং চার রাক'আতে হবে তিনশবার। মোটকথা সালাতুত তাসবীহ্র উভয় পদ্ধতিই স্বীকৃত ও আমলযোগ্য। এই সালাত আদায় কারী যে কোনভাবে আদায় করতে পারে।

সালাতুত তাসবীহ্'র প্রভাব ও বরকত

সালাতের মাধ্যমে পাপ বিমোচিত হওয়ার এবং পাপের দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়ার বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশ। সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়।" (১১, সূরা হূদ ঃ ১১৪)

এ আয়াতের নিরিখে সালাতুত তাসবীহ্'র যে বিরাট মাকাম রয়েছে তা হাদীসে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। অর্থ্যাৎ এর বরকতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার আগে পিছের পুরনো নতুন, অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছাকৃত, কাবীরা-সাগীরা, গোপন - প্রকাশ্য সর্ববিধ গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সুনানে আবূ দাঊদের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সাহবী (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) কে সালাতুত্ তাসবীহ্ শিক্ষা দানের পর বললেন ঃ فانك لو كنت أعظم أهل الارض ذنبا غفرلك ذالك "তুমি যদি দুনিয়ার সব চাইতে বড় পাপীও হয়, তবুও এর বরকতে তোমার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ ফযীলতে থেকে বঞ্চিত না করে ঐ সকল সৌভাগ্যবান বান্দাদের মধ্যে গণ্য হাওয়ার তাওফিক দিন, যাঁরা রহমত ও মাগফিরাতের আহবান শুনে তা থেকে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে তৎপর হয়ে উঠে।

নফলের এক বিশেষ উপকারিতা

'সালাতুত্ তাসবীহ্' পর্যন্ত আলোচনা করে সফল সালাতের বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। এই সমাপনীর পরিশিষ্ট পর্যায়ে নিম্নোক্ত হাদীসখানা পাঠ করে নেয়া যাক।

٢٣١- عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيْصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدَّثَنِىْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَنْفَعَنِىْ بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلٰوتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنْ انْقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَعَالَى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ لِيَكْمِلَ بِهِ مَا انْقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنَ سَائِرُ اَعْمَالِهِ عَلَى ذَالِكَ- رواه الترمذى والنسائى

২৩১. হযরত হুরাইস ইব্ন কাবীসা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমণ করলাম এবং বললাম "হে আল্লাহ্ ! আমাকে একজন সৎ সহযোগী দান কর" বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট অবস্থান করলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমি আল্লাহ্র কাছে একজন উত্তম সৎসহযোগী চাইলাম এখন আমি আপনার খিদ্মতে হাযির হয়েছি। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, এমন একটি হাদীস আমাকে বলুন। আশা করি আল্লাহ্ আমাকে এর মাধ্যমে কল্যাণ দান করবেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি ঠিকমত সালাত আদায় করা হয়ে যাকে তবে সে মুক্তি পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি সালাত নষ্ট হয়ে থাকে, তবে মহান দয়াময় আল্লাহ্ বলবেন ঃ দেখ, বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি-না, থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘটিতি পূরণ করা হবে। তার সমস্ত কাজের বিচার এভাবে করা হবে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ সুন্নাত ও নফল সালাত আদায়ের উপকারিতা ও গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই একটি হাদীসই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে।

উম্মাতে মুসলিমার বিশেষ প্রতীক ও সামষ্টিক সালাত জুমু'আ ও দুই ঈদের সালাত

দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার বিধান রয়েছে। এ ছাড়া যে সকল সুন্নাত ও নফল একাকী আদায় করা হয় সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীও আমলসমূহ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এমন কতিপয় সালাত রয়েছে যা সামষ্টিকভাবে আদায় করা হয় এবং তা উম্মাতের ঐক্যের বিশেষ প্রতীকরূপে স্বীকৃত। এসবের মধ্যে রয়েছে জুমু'আর

সালাত যা সপ্তাহান্তে একবার আদায় করা হয় এবং ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার সালাত যা বছরে একবার করে আদায় করা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করায় যে উপকারিতা রয়েছে তার মধ্যে বিশাল স্থান জুড়ে রয়েছে জুমু'আর এবং দুই ঈদের সালাত। এ ছাড়া আরো কিছু রহস্য নিহিত রয়েছে যা সপ্তাহান্তে ও বছরান্তে সামষ্টিক সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। প্রথমতঃ জুমু'আর সালাতের ব্যাপারে কতিপয় হাদীস পাঠ করা যেতে পাবে। আল্লাহ্‌ চাহেত এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য বুঝে পাঠক এর থেকে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কেবল এলাকাবাসী জামা'আতে অংশগ্রহণ করে। তাই সপ্তাহে একটি দিন রাখা হয়েছে যাতে পুরো শহরবাসী কিংবা মহল্লার সকল মুসলমান এক বিশেষ সালাতের জন্য এক বড় মসজিদে জমায়েত হন। আর ঐ জমায়েতের জন্য যুহরের দীর্ঘ সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং যুহরের চার রাক'আত সালাতের বিপরীতে জুমু'আর সালাত দুই রাক'আত রাখা হয়েছে। শরী'আতে জুমু'আর সালাতের বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং নবীযুগ, তৎপরবর্তী সাহাবী ও তাবিঈ যুগ পেরিয়ে অধ্যাবধি কার্যকর। তা যে বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, শহর কিংবা বস্তিতে বিশাল আকারে এক স্থানে জুমু'আর সালাতের আয়োজন করা উচিত। হ্যাঁ তবে এরূপ বিশাল মসজিদ যদি না থাকে যাতে গোটা শহর ও বস্তি সব এলাকার লোক একত্রে সালাত আদায় করতে পারে তবে শহরে জুমু'আর জন্য আরো মসজিদ তৈরি করা যেতে পারে। তবে এদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, এক মহল্লায় যেন একটি জামে' মসজিদই থাকে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসজিদে যদি পৃথকভাবে জুমু'আর সালাতের আয়োজন করা হয় তবে তা শরী'আত প্রবর্তিত জুমু'আর সালাতের উদ্দেশ্য পরিপন্থী কাজ হবে। বলা বাহুল্য, এই জমায়েত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে অফুরান উপকারিতা বয়ে আনায় দুই রাক'আত সালাতের পরিবর্তে 'খুতবা' অপরিহার্য করা হয়েছে। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য জুমু'আর দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে এ দিনটি সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ ও বরকতময়। রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্‌ যেমন তাঁর রহমত ও সাহায্য ধন্য করার লক্ষ্যে স্বীয় বান্দার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং বছরের একটি বিশেষ রাতে (শবে কাদরে) নাযিল করেন, তেমনি সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে জুমু'আর দিনে বান্দার প্রতি বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আর তাই তো এ দিনের আল্লাহ্‌ তা'আলা বিরাট বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংঘটিত করেছেন। এই গরুত্বের দিক বিবেচনা করেই সামষ্টিকভাবে সালাত আদায়ের লক্ষ্য জুমু'আর দিনকে ধার্য করা হয়েছে। তাই এ সালাতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ও জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং এ

সালাত আদায়ের লক্ষ্যে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্না পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যাবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যাতে সাপ্তাহিক এই সালাতে মুসলমানরা দু'আ ও যিক্‌র দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক বরকত লাভের পাশাপাশি বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে পারে এবং এই জমায়েতকে যেন ফিরিশতাদের জমায়েতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তোলা যায়। এই ভূমিকার পর জুমু'আ বার এবং জুমু'আর সালাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

জুমু'আ বারের মাহাত্ম্য ও ফযীলত

٢٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُيَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رواه مسلم

২৩২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুর্য উদিত হয় এমন দিনগুলোর (সপ্তাহের সাত দিনের) মধ্যে জুমু'আর দিন হল সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। সেদিনে আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হয়, তাঁকে ঐদিনই তাঁকে তা থেকে বের (করে দুনিয়ায় পাঠান হয় সেখানে তাঁর বংশধরের আবাদ) করা হয়। আর কিয়ামতও সংঘটিত হবে জুমু'আর দিন। (মুসলিম)

জুমু'আ বারের বিশেষ আমল হল দুরূদ শরীফ

٢٣٣- عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ ؟ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ - رواه أبوداؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى والبيهقى فى الدعوة الكبير

২৩৩. হযরত আওস ইব্‌ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ এ দিনই আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনই তাঁর ওফাত হয়েছে। এদিনই শিঙগায় ফুৎকার ধ্বনিত হবে এবং পুন:জীবিত করার লক্ষ্যে শিঙগায়

ফুৎকার দেওয়া হবে। কাজেই তোমরা এদিনে আমার প্রতি বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবা কিরাম বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার কাছে আমাদের দুরূদ কিভাবে পেশ করা হবে অথচ আপনার পবিত্র দেহ মাটিতে মিশে যাবে? তিনি বললেন, নবীদের শরীর মাটির জন্য (ফলে কবরে তাঁদের পবিত্র দেহ অক্ষত থাকে, মাটি কোন প্রভাব ফেলতে পারেনা) আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ, দারিমী ও বায়হাকীর দাওয়াতুল কাবীর গ্রন্থ)

ব্যাখ্যাঃ উপরে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের মত আওস ইব্‌ন আওস সাকাফীর হাদীসে জুমু'আর দিনে সংঘটিত অসাধারণ ঘটনাসমূহের বিবরণ দিয়ে মূলতঃ জুমু'আর দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। তবে পরের হাদীসে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যে, এদিনে বেশি বেশি দুরূদ পড়া চাই। রমাযানুল মুবারকের বিশেষ আমল যেমন কুরআন তিলাওয়াত এবং তা যেমন রমাযানের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, হাজ্জের সফরে তালবীয়া যেমন বিশেষ আমল তদ্রূপ হাদীসের আলোকে জুমু'আর দিনের বিশেষ আমল হল দুরূদ পাঠ। তাই এ দিনে বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করা উচিত।

ইন্‌তিকালের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ পাঠ এবং হায়াতুন্নবী প্রসঙ্গ

এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি অধিক দুরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মাতের দুরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেন এবং এবং এ পদ্ধতি আমার ইন্‌তিকালের পরেও অব্যাহত থাকবে। অন্য হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ফিরিশ্‌তা দুরূদ পৌঁছিয়ে দেন।" একথা শুনবার অব্যবহিত পরেই সাহাবা কিরামের মনে এই প্রশ্ন উঠল যে, আপনার জীবদ্দশায় ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে আমাদের দুরূদ পেশ করা হবে একথা আমাদের বোধগম্য হল, কিন্তু আপনার ইন্‌তিকালের পর যখন আপনাকে দাফন করা হবে এবং সাধারণ নিয়ম অনুসারে আপনার শরীর মাটিতে একাকার হয়ে যাবে, তখন আমাদের দুরূদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী-রাসূলদের শরীর কবরে পূর্ববৎ অবস্থায় অটুট থাকে। মাটির স্বাভাবিক প্রভাব নবীদের দেহে কার্যকর হয় না। যেভাবে পৃথিবীতে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ও ঔষধের সাহায্যে মৃত্যুর পর মরদেহ অটুট রাখা হয়, ঠিক একইভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ কুদ্‌রত ও নির্দেশে নবী-রাসূলদের তিরোধানের পর তাঁদের শরীর অটুট ও অক্ষুন্ন রাখেন এবং সেখানে তাঁদের এক

বিশেষ ধরনের জীবন দান করেন (যেরূপ পৃথিবীতে থাকাকালীন সময় ছিল)। তাই ইন্‌তিকালের পরেও দুরূদ পৌঁছাবার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

জুমু'আর দিনে রহমত প্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে

٢٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ –

رواه البخارى ومسلم

২৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তটি পেলে এবং আল্লাহ্‌র নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তা দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সারা বছরে রহমত প্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের জন্য যেমন লায়লাতুল কাদ্‌র বা মহিমান্বিত নির্ধারিত, যাতে বান্দা তাওবা -ইস্‌তিগফার করে দু'আ করলে সৌভাগ্যের ছোঁয়া পায় এবং আল্লাহ্ তার দু'আ কবূল করেন। একইভাবে প্রতি সপ্তাহে জুমু'আর দিনেও রহমত প্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। কাজেই বান্দা যদি উক্ত সময়ে দু'আ করে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তার দু'আ কবূল করবেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম ও কা'ব ইব্‌ন আহ্‌বার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, জুমু'আর দিনের দু'আ কবূলের মুহূর্তটির বিষয়ে তাওরাতেও বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য, এ দু'জনেই ছিলেন তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিশেষজ্ঞ আলিম।

জুমু'আর দিনের এই মুহূর্তটি সনাক্ত করতে যেয়ে হাদীস বিশারদগণ অনেক অভিমত দিয়েছেন। এর মতে দু'টি এমন মত রয়েছে যা প্রকাশ্য কিংবা ইঙ্গিতে কোন কোন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে তাই উল্লেখ করা হলো–

১. ইমাম যখন খুত্‌বা দানের জন্য মিম্বরে উঠেন, সে সময় থেকে শুরু করে সালাত আদায় শেষ করা পর্যন্ত দু'আ কবূলের এই মুহূর্তটি স্থায়ী থাকে।

মোদ্দকথা, খুত্‌বা এবং সালাতের মধ্যবর্তী সময়ই মূলতঃ দু'আ কবূলের মুহূর্ত।

২. আসর থেকে শুরু করে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এ অভিমত দু'টি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' উল্লেখ করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

উল্লিখিত অভিমত দু'টিতে সময় নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। বরং খুত্‌বা ও সালাতের সময় যেহেতু বান্দা বিশেষভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হয় তখনই ইবাদত ও দু'আ করার বিশেষ সময়-এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য। তাই আশা করা যায় যে, ঐ সময়ই মূলতঃ দু'আ কবূলের মুহূর্ত। একইভাবে আসরের সময় থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় যেহেতু ভাগ্য প্রসন্ন হওয়ার মুহূর্ত এবং দিনের শেষ সময় কাজেই সে সময় ও দু'আ কবূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোন কোন মনীষী লিখেছেন ঃ কাদ্‌রের রাত যে কারণে অনির্দিষ্ট ঠিক একই কারণে জুমু'আর দিনের দু'আ কবূলের মুহূর্তটিও অজ্ঞাত রাখা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, তথাপিও রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে, বিশেষত সাতাশতম রাত কাদ্‌রের রাত হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন হাদীসে যেমন ইঙ্গিত রয়েছে, ঠিক একইভাবে জুমু'আর দিনের দু'আ কবূলের মুহূর্তটি সম্পর্কেও সালাত ও খুত্‌বার সময় এবং আস্‌র থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই এই দু'সময়েই যেন আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে এবং গুরুত্বের সাথে দু'আ করে।"

এই অধম তাঁর কোন কোন প্রবীন উস্তাদদের দেখেছেন যে, তাঁরা এই দু'সময়ে লোকদের সাথে মেলামেশা এবং কথাবার্তা বলা পসন্দ করতেন না, বরং সালাত অথবা যিক্‌র ও আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন।

জুমু'আর সালাত ফরয হওয়া এবং তা আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ

٢٣٥- عَنْ طَارِقْ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ عَلَى اَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ اَوْ اِمْرَاَةٍ اَوْ صَبِىٍّ اَوْ مَرِيْضٍ - رواه أبوداؤد

২৩৫. হযরত তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমু'আর সালাত প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামা'আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু তা চার প্রকার লোকের উপর ওয়াজিব নয়। ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি। (আবূ দাঊদ)

٢٣٦- عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا قَالاَ سَمِعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ اَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ - رواه مسلم

২৩৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিম্বরের দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, যারা জুমু'আর সালাত পরিত্যাগ করে, তাদের্‌কে এ কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, নতুবা আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। এরপর তারা অবশ্যই গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

٢٣٧- عَنْ اَبِىْ الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ - رواه أبوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة

২৩৭. আবুল জা'দ যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে অলসতা হেতু তিনটি জুমু'আ ত্যাগ করে আল্লাহ্ তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন। (ফলে সে নেকআমলের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়)। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ ও দারিমী, ইমাম মালিক সাফওয়ান ইব্‌ন সুলায়ম সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

٢٣٨- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضُرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لاَ يُمْحَى وَلاَ يُبَدَّلُ وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلٰثًا- رواه الشافعى-

২৩৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অকারণে জুমু'আর সালাত বর্জন করে, সে মুনাফিক বলে আল্লাহ্‌র এ দফতরে লেখা হয় যার লেখা পরিবর্তন করা যায় না। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনটি (জুমু'আ) বর্জন করেছে। (শাফিঈ)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত হাদীসসমূহে জুমু'আর সালাতের ব্যাপারে যে অসাধারণ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বর্জনকারীদের প্রতি যে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। যে সকল অপরাধের কারণে বান্দা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত পড়ে এবং অন্তরে মোহর মারা হয় তা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন।

জুমু'আর সালাত আদায়ের গুরুত্ব এবং তা আদায়ের নিয়ম

২৩৯- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَااسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمُسُّ مِنْ طِيْبَ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يَخْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَاكُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الاِمَامُ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الاُخْرٰى -

رواه البخارى

২৩৯. হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য পবিত্র হয়ে স্বীয় তেল থেকে ব্যবহার করে কিংবা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, এরপর (মসজিদের উদ্দেশ্যে) বের হয় এবং এক সাথে বসা দু'জন লোককে ফাঁক করে না বসে, তারপর তার জন্য নির্ধারিত সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুতবা দানের সময় চুপ থাকে, তাহলে তার সেই জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারী)

২٤٠- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اِغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةَ فَلَمْ اَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ اِمَامُهُ حَتّٰى يَفْرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا -- رواه أبوداؤد

২৪০. হযরত আবূ সাঈদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং আপন উত্তম পোশাক পরিধান করে জুমু'আর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য (মসজিদে) যায় এবং মানুষের ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে চলে না এবং তার পক্ষে যথা সম্ভব সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করে। তার পর যখন ইমাম (খুতবা দানের জন) বের তখন নীরব থাকে যতক্ষণ না আপন সালাত থেকে অবসর হয়, তার এ জুমু'আ ও পূর্ব জুমু'আর মধ্যকার গুনাহ রাশির কাফ্ফারা হয়ে যায়। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ শরী'আতে জুমু'আর গোসলের যে মর্যাদা এবং যে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা সুন্নাত কি মুস্তাহাব সে বিষয় ইতপূর্বে এই অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত দু'টি হাদীসের জুমু'আর সালাতের জন্য গোসলের সাথে সাথে আরো কতিপয় কাজের উল্লেখ রয়েছে। ১.

যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন, ২. উত্তম পোশাক পরিধান, ৩. সুগন্ধি ব্যবহার, ৪. মানুষের কষ্ট হতে পারে কিংবা পারস্পরিক তিক্তভাব জন্ম হতে পারে এমন কাজের বিষয় সতর্কতা অবলম্বন করা, যেমন পূর্বে বসা দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে বসা অথবা লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া, ৫. যথাসাধ্য নফল সালাত আদায় করা, ৬. খুত্‌বার সময় একান্ত মনোনিবেশ সহকারে খুতবা শুনা, ৭. জুমু'আর সালাত আদায় করা। যে ব্যক্তি এভাবে জুমু'আর সালাত বিশেষ গুরুতত্বের সাথে আদায় করবে, পূর্বোক্ত দুই হাদীসের তা তার বিগত সপ্তাহের গুনাহ ক্ষমার মাধ্যম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবতে হবে যে, এসব কাজ যদি বিশুদ্ধ মন মানস নিয়ে সম্পাদন করা হয় তাহলে আমলকারীর অন্তরে কীরূপ রেখাপাত করবে এবং তার জীবনে সালাতের কী প্রভাব পড়বে এবং তার সাথে আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাতের কী গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

٢٤١- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ - رواه مالك ورواه ابن ماجة وهو عن ابن عباس متصلا

২৪১. উবায়দ ইবন সাব্‌বাক (র.) তাবিঈ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জুমু'আর খুত্‌বায় বলেছেন ঃ হে মুসলমানগণ! মহান আল্লাহ্‌ জুমু'আর দিনকে ঈদ স্বরূপ করেছেন। সুতরাং তোমরা এদিন গোসল করবে এবং যার নিকট সুগন্ধি আছে সে তা দেহে মাখলে তার কোন ক্ষতি হবে না এবং তোমরা অবশ্যই মিস্‌ওয়াক করবে। (মালিক ও ইব্‌ন মাজাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করছেন।)

জুমু'আর দনি ক্ষৌরকর্ম করা এবং নখকাটা

٢٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْلِمُ اَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الصَّلٰوةِ - رواه البزار والطبرانى فى الاوسط

১. হাদীসবিশারদগণ এই হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সহীহ্‌ বুখারীর বরাতে হযরত সালমান ফারেসী (রা.) থেকে যে হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ (স.) জুমু'আর দিন পবিত্রতা অর্জনের জন্য যে অনুপ্রাণিত করেছেন তার ব্যাপকতার মধ্যে এসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২৪২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন মসজিদে যাওয়ার পূর্বে তাঁর নখ এবং গোঁফ কেটে নিতেন।[১] (মুসনাদে বায্যার ও তাবারানীর মু'জামুল আওসাত গ্রন্থ)

জুমু'আর দিন উত্তম পোশাক পরিধানের প্রতি গুরুত্বারোপ

٢٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّلَامِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلَى اَحَدِكُمْ اِنْ وَجَدَ اَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَىْ مَهْنَتِهِ -

رواه ابنِ مَاجَةَ ورواه مالك عن يحي بن سعيد

২৪৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যদি সামর্থ্য থাকে, তবে জুমু'আর সালাতের জন্য কাজের কাপড় ব্যতীত একজোড়া উত্তম কাপড় রাখার কোন ক্ষতি নেই। (ইব্‌ন মাজাহ, মালিক ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেন)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যহ পরিধেয় কাপড় ব্যতীত পৃথক একজোড়া কাপড় রাখায় মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে এ কাজ সাদাসিধে জীবন ও কৃচ্ছতা পরিপন্থী এবং অপছন্দনীয়ও বটে। আলোচ্য হাদীসে উক্ত সন্দেহ দূর করা হয়েছে। হাদীসের মর্ম হল এই যে, জুমু'আর সালাত মূলত মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদ। তাই সাধ্যমত উত্তম পোশাক পরিধান করা আল্লাহ্র কাছে পসন্দনীয় ব্যাপার। তাই সালাতের জন্য আরেক জোড়া বিশেষ কাপড় রাখায় দোষের কিছু নেই।

ইমাম তাবারানী (র.) মু'জামুস সাগীর ও আওসাত গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজোড়া বিশেষ কাপড় ছিল। তিনি জুমু'আর দিন তা পরিধান করতেন। এরপর তিনি সালাত শেষ করে বাসায় ফিরলে আমরা তা ভাজ করে রাখতাম। পরবর্তী জুমু'আর জন্য আবার বের করতাম কিন্তু হাদীসবিশারদগণের নিকট এই হাদীসের সূত্র দুর্বল।[১]

প্রথম ওয়াক্তে জুমু'আর সালাতে যাওয়ার ফযীলাত

٢٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الاَوَّلَ فَالاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِىْ بَدْنَةً ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ

১. জামউল ফাওয়ায়েদ মা'আত'তালীকাতি আ'যাবিল মাওয়ারিদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬০ দ্র.

دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الاِمَامُ طَوَوْصُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ –

رواه البخارى ومسلم

২৪৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে গোসল করে এবং সালাতের জন্য (মসজিদে) যায় সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি এরপর গমন করবে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় গমনকারী ব্যক্তি যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ গমনকারী ব্যক্তি যেন একটি মুরগী কুরবানী দান করল। পঞ্চম গমনকারী ব্যক্তি যেন একটি ডিম কুরবানী করল। এর পর ইমাম যখন খুত্‌বা দানের জন্য মিম্বরের উদ্দেশ্যে তখন ফিরিশ্‌তাগণ নিজেদের রেজিষ্টার বন্ধ করে খুত্‌বা শুনায় শরীক হয়ে যান। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মূলকথা হল, জুমু'আর দিন প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে যাওয়ার প্রতি অনুপ্রেরণা দান এবং আগে পিছে আগমনকারীদের মর্যাদার ব্যবধান উপমা সহকারে বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

জুমু'আর সালাত ও খুত্‌বা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল

٢٤٥– عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا اَشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلَوةِ يعنى الْجُمُعَةَ– رواه البخارى

২৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীতের সময় সকাল সকাল (প্রথম ওয়াক্তেই জুমু'আর) সালাত আদায় করতেন। আর তীব্র গরমের সময় ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) সালাত আদায় করতেন। অর্থাৎ জুমু'আর সালাত। (বুখারী)

٢٤٦– عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًااَوْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا – رواه مسلم

২৪৬. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুত্‌বা হতো দু'টি। তিনি উভয়ের মাঝে বসতেন। তিনি তাতে কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতেন। তাঁর সালাত ও খুত্‌বা ছিল মধ্যম ধরনের (দীর্ঘও নয় একেবারে সংক্ষিপ্তও নয়) (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মর্ম হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুতবা না দীর্ঘ হতো আর না একেবারে সংক্ষিপ্ত হতো। একইভাবে তাঁর সালাত না একেবারে দীর্ঘ হতো আর না একেবারে সংক্ষিপ্ত হতো। বরং উভয়ই ছিল মধ্যম ধরনের। কিরা'আত অনুচ্ছেদে কিরা'আত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ ইতেপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং জুমু'আর সালাতে তিনি বেশির ভাগ কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করতেন তাতে আরও উল্লেখ রয়েছে।

٢٤٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَى صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْهِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى- رواه مسلم

২৪৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তখন চোখ দু'টি রক্তিমাভ হতো, কণ্ঠস্বর উঁচু হতো এবং তীব্র ক্রোধ প্রকাশ পেত। মনে হতো তিনি যেন আক্রমণকারী শত্রুসেনা সম্পর্কে সতর্ক করছেন এবং বলছেন তারা সকালে তোমাদের উপর চড়াও হবে এবং বিকালে আক্রমণ করবে। তিনি আরো বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এই দু'টির ন্যায় (এই বলে তিনি) মধ্যম আঙ্গুল ও তর্জনী মিলিয়ে দেখাতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মূলকথা হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে আবেগময়ী ভাষায় খুতবা দিতেন। তাঁর অবস্থা বক্তব্যের অনুরূপ হতো। তিনি বিশেষভাবে কিয়ামত নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হওয়ার এবং তার ভয়াবহ তার কথা জোর দিয়ে বলতেন। মধ্যম ও তর্জনী আঙ্গুল মিলিয়ে তিনি একথা বলতেনঃ তোমরা ভাল করে জেনে রেখ, এই দুইটি আঙ্গুল যেমন কাছাকাছি তদ্রূপ আমার নবুওয়াতের পরে কিয়ামতও কাছাকাছি। আমার পরে কোন নবী আসবেন না। আমার নবুওয়াত কালেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কাজেই তোমরা সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

জুমু'আর (ফরয) সালাতের পূর্বের ও পরের সালাত

٢٤٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا- رواه الطبرانى فى الكبير

২৪৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর সালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত[১] সালাত আদায় করতেন। (তাবারাণীর কাবীর গ্রন্থ)

২৪৯- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا - رواه مسلم

২৪৯. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুলায়ক গাতফানী জুমু'আর দিন মসজিদে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মিম্বরের উপর বসাছিলেন। সুলায়ক (রা.) সালাত আদায় না করে বসে পড়লেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি দাঁড়াও এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও অন্যান্যদের মত হলো যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাত আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে আসে তার উপর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায় করা ওয়াজিব। যদিও ইমাম খুত্বা শুরু করেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরীসহ বিপুল সংখ্যক ইমামের মতে (তা ওয়াজিব নয়)। তাঁদের সবের ভিত্তি হল ঐ সব হাদীস যাতে খুতবা শুরু হলে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তা শুনার ব্যাপারেই রয়েছে বিশেষ তাকিদ এবং অনুপ্রেরণা। তাই অধিকাংশ সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈগণ কার্যত ও ফাতোয়ার দিক থেকে কখনো খুতবার সময় সালাত আদায়ের ব্যাপারে অনুমতি দেননি। সুলায়ক গাতফানীর আলোচ্য হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এ মাস'আলার ব্যাপারে উভয়পক্ষের শক্তিশালী দলীল প্রমাণ রয়েছে।[২] তাই সতর্কতার দাবি হল, জুমু'আর দিন এমন সময় মসজিদে পৌঁছা কর্তব্য যাতে কমপক্ষে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা যায়।

---

১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীস জামউল ফাওয়াইদে তাবারানীর বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সনদসূত্রে হাদীসটি দুর্বল।

কিন্তু 'আযাবুল মাওয়ারিদ' গ্রন্থে একটি ভিন্ন সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে কোন দুর্বলতা নেই। বরং ইরাকী এই হাদীসটিকে উত্তম সনদে বর্ণিত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২. মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (র) 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থে এই মাস'আলায় উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণ সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি লিখেছেন : ন্যায়বিচারের কথা হল, কোনটি প্রাধান্য পাবার দাবি রাখে সে বিষয় এখনো বক্ষ উম্মোচিত হয়নি। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ এ বিষয়ে জটিলতার অবসান ঘটিয়ে দিবেন।

٢٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا

২৫০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমু'আর (ফরয) সালাত আদায় করলে সে যেন তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। (মুসলিম)

٢٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ- رواه البخارى مسلم

২৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর পর কোন সালাত আদায় করতেন না। তবে বাড়ীতে ফিরে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হাদীস গ্রন্থসমূহে জুমু'আর ফরযের পর যে সব সুন্নাত সালাতের বিবরণ এসেছে তার মধ্যে দুই রাক'আত, চার রাক'আত ও ছয় রাক'আতের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জুমু'আর ফরয সালাতের পর দুই রাক'আত, চার রাক'আত আবার কখনো ছয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তাই বিশেষজ্ঞ আলিমগণ প্রনিধানযোগ্য বিষয় নিরূপণের ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোন কোন মনীষী দুই রাক'আতকে, কোন কোন মনীষী চার রাকা'আতকে আবার কেউ কেউ ছয় রাক'আতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহা

প্রত্যেক জাতিরই কিছু কিছু বিশেষ জাতীয় উৎসব রয়েছে যাতে তারা সামর্থ্যানুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করে এবং উপাদেয় খাবার পাকায় এবং বিভিন্নভাবে মনের আনন্দ প্রকাশ করে। বলাবাহুল্য এ হচ্ছে, মানব স্বভাবের সহজাত দাবি। তাই এমন কোন মানব গোষ্ঠি নেই, যাদের বিশেষ কোন জাতীয় উৎসব নেই।

ইসলামে জাতীয় উৎসবের দু'টি দিন রয়েছে। যথা:- ১. ঈদুল ফিত্র এবং ২. ঈদুল আযহা। এদু'টিই হল মুসলমানদের ধর্মীয় বড় উৎসব। এছাড়া মুসলমানরা যে সব অনুষ্ঠান পালন করে তার কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই, বরং তার বেশির ভাগই রয়েছে নানা আজে বাজে উপাদান।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন শুরু হয়। আর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এ সময় থেকেই শুরু হয়।

উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্‌র রমযানের অব্যবহিত পরে ১লা শাওয়াল অনুষ্ঠিত হয়। আর ঈদুল আযহা অনুষ্ঠিত হয় যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে। ধর্মীয় পবিত্রতা সংরক্ষণ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বিধানের লক্ষ্যে মুবারক মাস। এ মাসেই কুরআন অবতরণের শুভ সূচনা ঘটে। এ মাসের পুরো সময়ে সিয়াম পালন করা মুসলিম উম্মাতের উপর ফরয। এ মাসে স্বতন্ত্র জামা'আতবদ্ধ সালাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৎকাজে অধিক লাভের বিষয় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, পুরো মাসটিকে প্রবৃত্তি দমন ও কৃচ্ছতা অবলম্বন এবং সর্ববিধ আনুগত্য ও বেশি বেশি ইবাদত করার মাসরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঈমানী ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকে এ মাসের পর যেদিন আসে সে দিনের সবচেয়ে বড় দাবি হল, মুসলিম উম্মাত এদিনে আনন্দ-স্ফূর্তি করবে। তাই এ দিনকে ঈদুল ফিতরের দিন বলা হয়েছে।

দশই যিলহাজ্জ একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিনে মুসিলম উম্মাতের পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে স্বীয় কলিজার টুকরা (সন্তান) হযরত ইসমাঈল (আ) কে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে গলায় ছুরি চালিয়ে দিয়ে ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে চূড়ান্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের প্রমাণ রেখে ছিলেন। আল্লাহ্- তা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দাকে কুরবানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা দিয়ে হযরত ইসমাঈল (আ) কে জীবিত রেখে একটি পশুর কুরবানী কবূল করেন। তার পর আল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এর মাথায় اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (আমি তোমাকে বিশ্বমানবতার নেতা নির্বাচন করেছি।) এর মুকুট পরিয়ে দেন এবং তিনি কুরবানীর এই ধারাকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রীতির স্মারকরূপে স্বীকৃতি দেন। কাজেই এই বিরাট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দিনকে স্মরণীয় করে রাখা হলে তা মুসলিম উম্মাতের জন্য ইব্‌রাহিমী উত্তরাধিকারের স্মারক হতে পারে। এ ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার ক্ষেত্রে দশই যিল্‌হজ্জের চেয়ে উত্তম কোন দিন ধার্য করা যায় না। তাই দ্বিতীয় ঈদ হিসেবে ঈদুল আযহাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে উপত্যকায় হযরত ইসমাঈল (আ) এর কুরবানী হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয় উক্ত উপত্যকায় সম্মিলিতভাবে সমবেত হওয়া, হজ্জ অনুষ্ঠান পালন ও কুরবানী করা মূলতঃ মূল ঘটনাকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় এটাই মূল স্মারক। আর প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্রে কিংবা মহল্লায় যে সালাত ও কুরবানী অনুষ্ঠিত হয় তা যেন দ্বিতীয় পর্যায়ের স্মারক মোটকথা এ দু'দিনের (১ শাওয়াল ও ১০ যিলহজ্জ) উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে এ গুলোকে মুসলমানদের উৎসবের দিন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই দীর্ঘ ভূমিকার পর উভয় ঈদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ পাঠ করা যেতে পারে। আলোচ্য সালাত অধ্যায়ে দুই ঈদের সালাতের বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য , তবূও দুই ঈদ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের বিধান সম্বলিত হাদীসসমুহ ও হাদীস বিশারদগণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এখানে আনা হয়েছে।

দুই ঈদের উৎপত্তি

٢٥٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَبْدَلَكُمْ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الاَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرُ - رواه أبوداؤد

২৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা যাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বছরে দুই দিন খেলাধূলা ও আনন্দ উৎসব করে থাকে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই দু'টি দিন কিসের এর মূল ভিত্তি ও তাৎপর্য কি? তারা বলল, জাহিলিয়্যা যুগে আমরা এই দুই দিন খেলাধূলা ও আনন্দ উৎসব করতাম সেই প্রথা এখনও বহাল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এই দুই দিনের বিনিময়ে অন্য দু'টি উত্তম দিন দান করেছেন এখন এগুলোই তোমাদের জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব রূপে গণ্য হবে। তাহল, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌র। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন জাতির আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়েই মূলত তাদের বিশ্বাস, ইতিহাস -ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে। তাই ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়া যুগে মাদীনাবাসী উৎসবের আয়োজন করত এবং তার মধ্যে দিয়ে জাহিলিয়া যুগের চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারার বহিঃ প্রকাশ ঘটত।

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হয়ে সেকেলে জাতীয় উৎসব নির্মূল করে ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা নামে দু'টি জাতীয় উৎসব তাঁর উম্মাতের জন্য নির্ধারণ করেন। আর এর মধ্য দিয়ে তাঁর তাওহীদি চেতনা, ঐতিহ্য জীবনবোধের নীতি ইত্যাদি চিন্তা -চেতনার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। কাজেই মুসলমানরা যদি এই জাতীয় উৎসব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশনা অনুযায়ী উদ্‌যাপন করে, ইসলামের প্রাণশক্তি ও এর আহবানের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য এ দু'টি উৎসব যথেষ্ট।

ঈদের সালাত ও খুতবা

٢٥٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحَى اِلَى الْمُصَلَّى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَءُ بِهِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَّقْطَعَ بَعَثًا قَطَعَهُ اَوْيَاْمُرَ بِشَىْءٍ اَمَرَبِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ - رواه البخارى ومسلم

২৫৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে গিয়ে সর্বপ্রথম যে কাজ করতেন তা হলো সালাত। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তারা তাদের কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন, ওয়াসীয়াত করতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন হবে তাদের প্রথম করে নিতেন অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন, তবে তা জারী করতেন। এরপর তিনি ফিরে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ– আলোচ্য হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, দুই ঈদের সালাতের জন্য মদীনার মসজিদ এলাকা ছেড়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঈদগাহ নির্বাচন করেছিলেন সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং এ ছিল তাঁর সাধারণ আমাল । তরে মাঠের চারিপাশ প্রাচীর ঘেরা ছিলনা বরং তা ছিল উন্মুক্ত মাঠ। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, এ ঈদগাহ মসজিদে নববী থেকে মাত্র এক হাজার কদম দূরে অবস্থিত ছিল। একবার তিনি বৃষ্টিজনিত কারণে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেছিলেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে একটি হাদীসের বর্ণনা আসবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঈদের দিন ঈদের সালাত ও খুতবা দান শেষে আল্লাহর তাওহীদের বাণীর আওয়ায বুলন্দ করার লক্ষ্যে সেনাদলকে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করা হতো এবং ঈদগাহ থেকে তাদের বিদায় অভ্যর্থনা জানানো হতো।

বিনা আযান ও ইকামাতে দুই ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত

٢٥٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَ هُمَا - رواه البخارى ومسلم

২৫৪. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একাধিকবার দুই ঈদের সালাত আযান-ইকামাত ছাড়াই আদায় করেছি। (মুসলিম)

٢٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَءَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ مُتَّكِئًا عَلَى بِلاَلٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَضَى اِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلُ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ - رواه النسائى

২৫৫. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একবার ঈদের দিন নবী করীম ﷺ এর সাথে সালাতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি খুত্‌বার পূর্বে আযান-ইকামাত ছাড়াই সালাত শুরু করে দিয়েছেন। এর পর সালাত আদায় করে বিলালের শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রশস্তি বর্ণনা করলেন। এর পর লোকদের উপদেশ দিলেন। তাদের (আখিরাতের কথা) স্মরণ করালেন এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি অনুপ্রানিত করলেন। তিনি বিলাল (রা) কে সাথে নিয়ে মহিলাদের দিকে অগ্রসর হলেন। এরপর তিনি তাদেরকে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। তাদের কিছু বিষয়ে উপদেশ দেন এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণিত এই হাদীসে ঈদের খুত্‌বায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ও পৃথকভাবে সম্বোধন করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আববাস(রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ খেয়াল করেছিলেন যে, নারীরা খুতবা শুনতে পায়নি (তাই তিনি পৃথকভাবে তাদের নসীহত করেন)।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে দুই ঈদের সালাতে সাধারণভাবে মহিলারা অংশ নিত। বরং বলা যায় , এ বিষয়ে তাঁর নির্দেশও ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এবং মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ দেখা দেওয়ায় ফিক্‌হবিদ বিশেষজ্ঞ আলিমগণ যেমন জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে মহিলাদের জামা'আতে অংশগ্রহণ করাকে অসমীচীন মনে করেন, অনুরূপভাবে দুই ঈদের সালাতের ক্ষেত্রেও তাদের ঈদগাহে যাওয়া তারা অসমীচীন মনে করেন।

দুই ঈদের সালাতের আগে কিংবা পরে কোন সুন্নাত সালাত নেই

٢٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهُمَا- رواه البخارى ومسلم

২৫৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন মাত্র দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এর পূর্বেও কোন সালাত আদায় করেন নি এবং পরেও না। (বুখারী ও মুসলিম)

দুই ঈদের সালাতের সময়

٢٥٧- عَنْ يَزِيْدَبْنِ بْنت خُمَيْرِ الرَّحْبِىِّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحَى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الاِمَامِ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا وَذَالِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ- رواه ابوداؤد

২৫৭. হযরত ইয়াযীদ ইব্ন খুমায়র রাহবী (র) নামক তাবিঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসর (রা) ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন লোকদের সাথে সালাত আদায়ের জন্য রওয়ানা হন, ইমামের বিলম্বের কারণে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমরা এমন সময় অর্থাৎ ইশরাকের সময় বর্ণনাকারী বলেন সময়টি ছিল নফল সালাত। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসর (র) ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। তিনি অষ্টাশি হিজরীতে হিমসে ইনতিকাল করেন। সম্ভবত এই ঘটনা সেখানেই ঘটেছিল। একবারই ইমাম ঈদের সালাত বিলম্ব করায় তিনি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, আমারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্য একটু উপরে উঠতেই ঈদের সালাত আদায় করে নিতাম। হাফিয ইব্ন হাজার (র) 'তালখীসুল হাবীর' নামক গ্রন্থে আহ্মাদ ইব্ন হাসানুল বান্নার 'কিতাবুল আযাহী', গ্রন্থের বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জুন্দুব (রা) থেকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতের সময় সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

" كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والاضحى على قيد رمح "

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে এমন সময় ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্য তখন দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যেত। আর ঈদুল আযহার সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, সূর্য তখন এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যেত।"

বর্তমানকালে বেশিরভাগ স্থানে বিলম্বে দুই ঈদের সালাত আদায় করা হয়। নিঃসন্দেহে কাজ সুন্নাত পরিপন্থী।

২৫৮- عَنْ عُمَيْرِبْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رُكْبًا جَاؤُا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُوْنَ اَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُفْطِرُوْا وَاِذَا اَصْبَحُوْا اَنْ يَغْدُوْا اِلَى مُصَلاَّهُمْ - رواه أبوداؤد والنسائى

২৫৮. হযরত আবূ উমায়র ইব্‌ন আনাস (রা) তাঁর কয়েকজন চাচা যারা নবী করীম ﷺ এর সাহাবী ছিলেন, থেকে বর্ণনা করেন একবার এক কাফেলা নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে অবস্থিত হয়ে বললেন যে, তাঁরা গতকাল চাঁদ দেখেছেন। তখন তিনি তাদের সিয়াম ভংগ করতে এবং পরের দিন সকালে ঈদের সালাত আদায় করতে বলেন। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যামানায় ২৯ শে রমাযান চাঁদ দেখা না যাওয়ায় ৩০শে রমাযান সবাই সিয়াম পালন করেন। কিন্তু একটি বাণিজ্য কাফেলা বাইর থেকে দিনে মদীনায় এসে পৌঁছল এবং তাঁরা জানালেন আমরা গতকাল সন্ধ্যায় (ঈদের) চাঁদ দেখেছি। নবী করীম ﷺ তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে বললেন। তোমরা সিয়াম ভংগ কর এবং আগামী দিন ভোরে ঈদের সালাত আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

স্পষ্টতই, এই কাফিলাটি দিনের অনেক বেলা হওয়ার পর মদীনায় পৌঁছেছিলেন এবং তখন সালাতের সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় এটাই মাসআলা যে ঐদিন সালাতের সময় না থাকায় পরের দিন ঈদের সালাত আদায় করতে হয়।

দুই ঈদের সালাতে কিরা'আত

২৫৯- عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَءُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الاَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ - رواه مسلم

২৫৯. উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। একবার উমর (রা) আবূ ওয়াকিদ লায়সীকে জিজ্ঞেস করলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাতে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন ঃ তিনি উভয় ঈদের সালাতে সূরা কা'ফ, সূরা 'কামার' পাঠ করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ একথা বিশ্বাসযোগ্য যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই ঈদের সালাতের কিরা'আত হযরত উমর (রা) এর স্মরণ না থাকায় আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আসলে সম্ভবত আবূ ওয়াকিদ লায়সীর স্মরণ শক্তি যাচাই করার জন্যই তিনি এ প্রশ্ন করে ছিলেন অথবা নিজের জানা বিষয় সম্পর্কে আরো আশ্বস্ত হবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

٢٦٠- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَاَ بِهِمَا فِى الصَّلٰوتَيْنِ - رواه مسلم

২৬০. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদে এবং জুমু'আর সালাতে সূরা গাশিয়া ও সূরা আ'লা পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে একত্র হলে উক্ত সূরা দু'টি তিনি উভয় সালাতে পাঠ করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবূ ওয়াকিদ লায়সী ও নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) বর্ণিত। হাদীসদ্বয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের সালাতে কখনো সূরা কাফ ও সূরা কামার এবং কখনো সূরা আ'লা ও গাশিয়া পাঠ করতেন।

বৃষ্টি কারণে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা

٥٦١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ - رواه أبوداؤد و ابن ماجة

২৬১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ঈদের দিন বৃষ্টি হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করেন। (আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম উম্মাতের ধর্মীয় জাতীয় উৎসবের যে মর্যাদা তার অনিবার্য দাবি হল, দুনিয়ার অপরাপর সম্প্রদায়ের জাতীয় উৎসবের ন্যায় সামষ্টিকভাবে দুই ঈদের সালাত উন্মুক্ত মাঠে আদায় করা।

উল্লিখিত হাদীস সূত্রে একথা জানা যায় যে, সাধারণভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত উন্মুক্ত ঈদগাহে আদায় করতেন। আর ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায় করাই সুন্নাত। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, যদি বৃষ্টি হয় কিংবা অন্য কোন কারণ উপস্থিত হয় এমতাবস্থায় ঈদের সালাত মসজিদেও আদায় করা যেতে পারে।

দুই ঈদের খাবার ঈদগাহে গমনের আগে না পরে?

٢٦٢- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمُ وَلاَ يُطْعِمُ يَوْمَ الاَضْحَى حَتَّى يُصَلِّى - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

২৬২. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌রের দিন কিছু না খাওয়া পর্যন্ত ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন সালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ ও দারিমী)

ব্যাখ্যাঃ সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহে যাবার পূর্বে কয়েকটি খেজুর খেয়ে নিতেন এবং বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। ঈদুল আযহার দিন সালাতের পরে আহারের কথা আসার কারণ হল, যেন ঐদিন প্রথম খাবার কুরবানীর গোশ্‌ত দ্বারা হয়, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক ধরনের আপ্যায়ন। আর ঈদুল ফিতরের দিন সালাত আদায়ের পূর্বে কিছু আহার করে নেয়ার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে বান্দা গোটা রমাযান মাসের দিনসমূহে খানা বন্ধ রেখেছিল। আজ যেহেতু খানা গ্রহণের অনুমতি পাওয়া গেছে এবং এতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রয়েছে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী বান্দা প্রভু প্রদত্ত আপ্যায়নের স্বাদ দিনের প্রথমভাগেই গ্রহণ করে। কারণ এটাই বান্দার প্রকৃত অবস্থান

گر طمع خواهد زمن سلطان دیں

خاك برفرق قناعت بعدازیں

"ভোগের হুকুম দিলে প্রভু, ত্যাগে আমি দেই ছুটি।

ঈদগাহে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাস্তা পরিবর্তন করা

٢٦٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ- رواه البخارى

২৬৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার সময়) ভিন্ন পথ ধরে আসতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন যে পথে ঈদগাহে যেতেন, ফেরার সময় অন্য কোন পথে বাড়ী আসতেন। আলিমগণ এর একাধিক ব্যাখ্যাও হিক্মত বর্ণনা করেছেন। এই অধমের দৃষ্টিতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হল এরূপ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের প্রতীক এবং মুসলমানদের সামাজিক উৎসব সমূহের অধিক প্রকাশ ও প্রচার। তাছাড়া ঈদের আনন্দ উৎসবের এটাই দাবি যে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ও বিভিন্ন এলাকা দিয়ে গমনাগমন হয়।

সাদাকাতুল ফিত্র আদায়ের সময় এবং এর হিক্মত

٢٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ - رواه البخارى ومسلم

২৬৪. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের উপর রমাযানের সাদাকাতুল ফিত্র ফরয করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম ক্রীতদাস ও স্বাধীন নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবার উপর এক সা খেজুর অথবা এক সা যব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর সালাতের উদ্দেশ্য (ঘর থেকে) বের হওয়ার পূর্বে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যাকাতের ন্যায় সাদাকা-ই-ফিতর ও বিত্তবানদের উপর আদায় করা ওয়াজিব। একথা যেহেতু সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝে, তাই হাদীসে সবিস্তার বিবরণ আসেনি যে, কে ধনী এবং ইসলামে ধন্যাঢ্যতার মাপকাঠি কি? এ বিষয় সবিস্তার বিবরণ ইনশাআল্লাহ যাকাত অধ্যায়ে দেওয়া হবে।

আলোচ্য হাদীসে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সাদাকা-ই-ফিত্র স্বরূপ এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, উপরিউক্ত দু'টি বস্তুই তদানীন্তন যুগে মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় খাদ্যদ্রব্য

হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তাই এই হাদীসে এদু'টি বস্তুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মনীষী লিখেছেন, সেকালে একটি ছোট পরিবারের জন্য এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব যথেষ্ট মনে করা হতো। এই হিসাবে প্রত্যেক বিত্তবানের পক্ষ থেকে তার পরিবারের ছোট বড় সবার এতটুকু পরিমাণ সাদাকা-ই-ফিত্‌র আদায় করা উচিত যাতে একটি সাধারণ পরিবারের একদিনের ব্যয় মিটে যায়। বর্তমানকালে উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিমের মতে, এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সেরের কাছাকাছি।

٢٦٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرًا الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ - رواه أبو داؤد

২৬৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়ামকে অনর্থক কথা, অশ্লীল ব্যবহার হতে পবিত্র করার এবং দুঃস্থদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে সাদাকা-ই-ফিত্‌র নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে সাদাকা-ই-ফিতরের দু'টি হিক্‌মত এবং দু'টি বিশেষ উপকারিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১. মুসলমানদের উৎসবের দিন তাদের দানের দ্বারা যাচ্ঞাকারীদের তৃপ্তি সহকারে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। ২. জিহবার অসংলগ্ন ও অনভিপ্রেত কথাবার্তা দ্বারা সিয়ামের উপর যে প্রভাব পড়ে সাদাকা-ই-ফিতর আদায়ের মধ্য দিয়ে তার কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যায়।

ঈদুল আযহার কুরবানী (পশু যবাই)

٢٦٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَمَلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْ بِهَا نَفْسًا- رواه الترمذى وابن ماجة

২৬৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরবানীর দিন বনী আদমের কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করা অপেক্ষা প্রিয় কাজ আর নেই। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশু, শিং, চুল এবং খুরসহ উপস্থিত হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত যমীনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হয়ে যায়। কাজেই তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে কুরবানী কর। (তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ)

٢٦٧– عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذِهِ الاَضَاحِيْ يَا رَسُولُ اللّٰهِ ؟ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ ، قَالُوْا فَالصُّفُوْفُ يَارَسُولُ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّفُوْفُ حَسَنَةٌ – رواه أحمد وابن ماجة

২৬৭. হযরত যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কুরবানী কী তিনি বললেন ঃ এতো তোমাদের (আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয়) পিতা ইব্‌রাহীম (আ) এর সুন্নাত। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কুরবানী করায় আমাদের জন্য কী পুরস্কার রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ প্রতিটি (গরু, বকরী ইত্যাদির) পশমে বিনিময়ে রয়েছে একটি করে নেকী। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পশমে? তিনি বললেন ঃ (মেষ, দুম্বা, উট হত্যাদির) প্রতিটি পশমে রয়েছে একটি করে নেকী। (আহ্‌মাদ ও ইব্‌ন মাজাহ্)

٢٦٨– عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ– رواه الترمذى

২৬৮. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর দশ বছর অবস্থান করেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করেন। (তিরমিযী)

٢٦٩– عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْصَانِيْ اَنْ اُضَحِّيْ عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّيْ عَنْهُ

২৬৯. হযরত হানাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আলী (রা) কে দু'টি দুম্বা কুরবানী করতে দেখে বললাম, আপনি এ কি (একটির স্থলে দু'টি কুরবানী) করছেন ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে ওসীয়াত করেছেন যে, আমি যেন তাঁর নামে কুরবানী করি। সে মতে আমি তাঁর পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করছি। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থানকালে প্রতি বছর কুরবানী

করেন। আর হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে এ মর্মে ওসীয়াত করে যান যে, তিনি যেন তাঁর নামে কুরবানী করেন। সে মতে এই ওসীয়াত মুতাবিক হযরত আলী মুরতাযা (রা) সব সময় নবী করীম ﷺ এর পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।

কুরবানী করার নিয়ম

٢٧٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ قَالَ وَاضِعًا قَدْمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا وَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرَ - رواه البخاری ومسلم

২৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে সাদা-কালো রং মিশ্রিত দুই শিং বিশিষ্ট দু'টি দুম্বা যবাই করেন এবং তাতে 'বিসমিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার' পাঠ করেন। আমি দেখলাম, তিনি দুম্বা দু'টির পার্শ্বদেশে পা রেখে বলছেন ঃ "বিসমিল্লাহে ওয়া আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ্‌র নামে, সেই আল্লাহ্ মহান। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ " اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ عَلَى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ - رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة والدارمى وفى روايته لاحمد وابى داؤد والترمذى ذبح بيده وقال بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِىْ

২৭১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সাদা-কালো রং মিশ্রিত, দুই শিং বিশিষ্ট দু'টি খাসি দুম্বা যবাই করেন। তারপর যখন তিনি এ দু'টিকে কিবলামুখি করেন তখন এই দু'আ পাঠ করেন–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوةِ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ –

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ করছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৬, সূরা আন'আম ঃ ৭৯)। বলুন, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে (৬, আন'আম ঃ ১৬২) তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি এ (সাক্ষ্য দানের) জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আর আমি মুসলমানদেরই একজন। হে আল্লাহ্! তোমার পক্ষ থেকে পাওয়া বস্তু তোমার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে পেশ করছি। আল্লাহ্‌র নামে সেই আল্লাহ্ মহান।" তারপর তিনি যবাই করেন, (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ ও দারিমী)

আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযীর অন্য বর্ণনায় আছে, তা নিজ হাতে যবাই করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র নামে যে আল্লাহ্ মহান। হে আল্লাহ্! এতো আমার পক্ষ থেকে এবং আমার সে সব উম্মাতের পক্ষ থেকে যাদের কুরবানী করার সামর্থ্য নেই।

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানী করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে আরযি পেশ করতেন ঃ আমার পক্ষ থেকে অথবা কুরবানী দানে আমার অসমর্থ উম্মাতের পক্ষ থেকে এই কুরবানী। স্পষ্টতই এটাই ছিল উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রগাঢ় স্নেহের প্রকাশ। তবে এর মর্ম এই নয় যে, তিনি সকল উম্মাতের পক্ষ থেকে অথবা অসমর্থ লোকদের পক্ষে কুরবানী করেছেন, তাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং তাদের আর কুরবানী করতে হবে না। বরং এর মর্ম হল, হে আল্লাহ্! কুরবানীর সাওয়াবে আমার সাথে আমার উম্মাতকেও অংশীদার কর। সাওয়াবে অংশীদার করা এক জিনিস, আর সবার পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় হয়ে যাওয়া ভিন্ন জিনিস।

কুরবানীর পশু সম্পর্কে দিক নির্দেশনা

٢٧٢– عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا ذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ اَرْبَعًا اَلْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ

الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِى لاَ تُنْقِىْ -

رواه مالك وأحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى

২৭২. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরবানী করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পশু বাদ দেওয়া উচিত সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি নিজের হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ চার রকমের (ত্রুটিযুক্ত) পশু বাদ দেওয়া উচিত। তা হল, খোড়া-যার খোঁড়ানো সুস্পষ্ট, অন্ধ-যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন-যা রুগ্নতা সুস্পষ্ট এবং দুর্বল যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। (মালিক, আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ ও দারিমী)

٢٧٣- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُضَحِّىْ بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالاُذُنِ - رواه ابن ماجة

২৭৩. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাঙ্গা শিং ও ছেড়াঁ কান বিশিষ্ট পশু (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) যবাই করতে নিষেধ করেছেন। (ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানী মুলতঃ বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে এক প্রকার নযরানা। তাই সাধ্যানুসারে ভাল পশু কুরবানী করা উচিত। খোড়া, অন্ধ, কান বিহীন, রুগ্ন, দুর্বল, জীর্ণ-শীর্ণ, ভাঙ্গা শিং বিশিষ্ট এবং কানছেঁড়া পশু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করা উচিত নয়। কুরআন মাজীদে তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

এটাই কুরবানী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনার প্রাণশক্তি ও বিশেষ উদ্দেশ্যে।

বড় পশু কয়ভাগে কুরবানী করা যাবে?

٢٧٤- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ - رواه مسلم وأبوداؤد واللفظ له

২৭৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি গরু সাতজনের এবং প্রতিটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। (মুসলিম ও আবূ দাঊদ শব্দমালার আবূ দাঊদের)

ব্যাখ্যা ঃ আরব দেশে গরুও মহিষকে একই সাথে শ্রেণীভুক্ত মনে করা হয়, আরবে এগুলো না থাকায় হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি, মহিষের কুরবানীতেও সাত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঈদের সালাতের পরেই কুরবানী করার সময়

٢٧٥- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ نَبْدَءُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ فَاِنَّمَا ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ نُصَلِّيْ هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ- رواه البخارى ومسلم

২৭৫. হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্য ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ আজকের এই দিনে আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করব তাহল সালাত আদায়। এরপর ফিরে গিয়ে কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে করবে সে আমাদের সুন্নাতকে অনুরসণ করল (তার কুরবানী আদায় হবে)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করল সে তার পরিবারের জন্য অগ্রিম গোশ্ত খাওয়ার জন্য বকরী যবাই করল। তা কিছুতেই কুরবানী নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧٦- عَنْ جُنْدُبِ بْنِتِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدَتُ الاَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ اَضَاحِيْ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ اَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَى- رواه البخارى ومسلم

২৭৬. হযরত জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একবার কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সালাত শেষ করার সাথে সাথেই তাঁর দৃষ্টি কুরবানীর গোশ্তের উপর পড়ল। এই কুরবানীর পশু সালাত আদায়ের পূর্বেই যবাই করা হয়েছিল। সে মতে তিনি বললেন ঃ যে

সব লোক সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করে তাদের (সালাতের পরে) আরেকটি কুরবানী করা উচিত (কেননা সালাতের পূর্বে কুরবানী হয়না)। (বুখারী ও মুসলিম)

১০ ই যিলহজ্জের ফযীলত ও সম্মান

আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে যেমন জুমু'আর দিনকে, বছরের বার মাসের মধ্যে রমযান মাসকে, তারপর রমযানের তিন দশকের মধ্যে শেষ দশদিনকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তেমনি ১০ই যিলহাজ্জকেও দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছেন। আর তাই এই দশদিনের মধ্যে হজ্জের দিনকে রাখা হয়েছে। মোটকথা এই দিনগুলোতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত। এসব দিনের সৎকাজ আল্লাহর অতি এবং মূল্যবান।

٢٧٧– عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ هٰذِهِ الاَيَّامِ الْعَشَرَةِ– رواه البخارى

২৭৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ১০ই যিলহাজ্জ তারিখের আমলের চেয়ে কোন প্রিয় আমল আল্লাহ্র কাছে আর নেই। (বুখারী)

٢٧٨– عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُّضَحِّىَ فَلاَ يَاْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا – رواه مسلم

২৭৮. হযরত উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন যিলহজ্জের প্রথম দশদিন শুরু হয় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করতে চায় সে যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত চুল এবং নখ না কাটে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ১০ই যিলহজ্জ প্রকৃতপক্ষে হজ্জের দিন এবং এদিনে অনেক বিশেষ করণীয় কাজ রয়েছে। কিন্তু হজ্জব্রত পালন করতে হয় মক্কা শরীফে গিয়ে। তাই সামর্থ্যবানের উপর জীবনে কেবল একবার তা আদায় ফরয করা হয়েছে। যে লোক সেখানে গিয়ে হজ্জব্রত পালন করে সেই প্রকৃত অর্থে বিশেষ বরকত লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে এ রহমত লাভের যে, হজ্জের দিনসমূহে যেন তারা স্ব-স্ব স্থানে থেকে হজ্জ এবং হাজীর কাজসমূহের সাথে সম্পৃক্ত কাজে অংশগ্রহণ করে। এক ধরনের সম্পর্ক করে নেয়। ঈদুল আযহার কুরবানীর মূলে এটাই বিশেষ রহস্য। হাজীগণ ১০ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কুরবানী করে থাকেন। তবে বিশ্বের যে সকল

মুসলমান হজ্জে অংশগ্রহণ করেন নি তাঁদের জন্য নির্দেশ হল, তারা যেন নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করে। হাজীগণ যেভাবে ইহ্‌রাম বাঁধার পর চুল ও নখ কাটেন না তদ্রুপ যে সকল মুসলমান কুরবানী করতে ইচ্ছুক তারাও যেন যিলহাজ্জের চাঁদ দেখার পর চুল অথবা নখ না কাটে। এভাবে যেন তারা হাজীদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। কতই না চমৎকার দিক নির্দেশনা। যার উপর আমল করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল মুসলমান হজ্জের বরকত ও নূর লাভ করে ধন্য হতে পারে।

সতর্কবাণী ঃ প্রকাশ থাকে যে, এখানে কুরবানী এবং এর পূর্বে সাদাকা-ই-ফিতর এর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসমূহ মুহাদ্দিসগণের অনুকরণে দুই ঈদের সালাতের সাথে অবিচ্ছেদ্য বিধায় এখানেই উল্লেখ করা হলো।

সূর্য গ্রহণের সালাত এবং বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

জুমু'আ ও দুই ঈদের যেমন সামষ্টিক সালাতের দিন তারিখ সুনির্ধারিত, এছাড়া আরো দুই সালাত সামষ্টিকভাবে আদায় করা হয়। তবে তার দিনক্ষণ তারিখ নির্ধারিত নেই। এর মধ্যে একটি সূর্য গ্রহণের সালাত এবং অপরটি হল বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত (সালাতুল ইস্তিস্‌কা)

সূর্য গ্রহণের সালাত

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদ্‌রতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যখন চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণ হয় তখন অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র আসনে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর দয়া ও করুণা প্রার্থনা করা উচিত। উল্লেখ্য, নবী নন্দন হযরত ইব্‌রাহীমের বয়স যখন দেড় বছর তখন তিনি ইনতিকাল করেন[১] এবং ঐদিন সূর্যগ্রহণও লেগেছিল। জাহিলিয়া যুগের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, কোন মহান ব্যক্তির তিরোধান জনিত কারণেই মূলতঃ সূর্যগ্রহণ হয়। যেন তার মৃত্যুতে সূর্যকালো চাদর গায়ে শোকের আচ্ছন্ন হয়। হযরত ইব্‌রাহীমের ইন্‌তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হওয়ায় মানুষ উক্ত ভুল ধারণার শিকার হতে পারত। বরং কোন কোন বর্ণনায় আছে, কোন কোন মানুষের মুখে একথা উচ্চারিত হয় যে, তাঁর মৃত্যুতেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাই সূর্যগ্রহণের সময়

---

১. নবীনন্দন হযরত ইব্‌রাহীম (রা) দশম হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন এ বিষয় বিপুল সংখ্যক হাদীস বিশারদ ঐকমত্য পোষণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি রাবীউল আউওয়াল মাসে ইন্‌তিকাল করেন। বিগত শতাব্দীর খ্যাতিমান মনীষী মরহুম মাহমূদ পাশা এ বিষয়ে ফরাসী ভাষায় একটি নিবন্ধ লিখেছেন যার আরবী তরজমা ১৩০৫ হিজরীতে মিসরে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উক্ত সূর্যগ্রহণের তারিখ দশম হিজরীর ২৯ শে সাওওয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত ঐদিন সকাল সাড়ে আটটার সূর্যগ্রহণ লেখেছিল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণভাবে শংকিত হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জামা'আত সহ দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এ সালাত ছিল ভিন্ন ধর্মী। তিনি এতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করেন এবং কিরা'আতের মধ্যে কখনো কখনো তন্ময় হয়ে ঝুঁকে পড়তেন। আবার সোজা হয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন। একইভাবে এ সালাতে তিনি দীর্ঘ রুকূ সিজ্‌দা করেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সালাতে আল্লাহ্‌র দরবারে কাতর প্রার্থনা করেন। তারপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। কারো মৃত্যু জনিত কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হওয়ার বদ্ধমূল ধারণা চিরতে বিদূরিত করেন। তিনি বলেন, এ হল, জাহিলিয়া যুগের চিন্তা-চেতনারই ফল যার কোন ভিত্তি নেই। এ হচ্ছে মূলতঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদ্‌রতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই কখনো সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হলে বিনয় নম্রতার সাথে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া, তাঁর ইবাদাত করা এবং দু'আ করা উচিত। এই দীর্ঘ ভূমিকার পর সূর্য গ্রহণের সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় হাদীস পাঠ করা যেতে পারে।

٢٧٩- عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعَيْبَةَ قَالَ كَسَفَةِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا اللّٰهَ - رواه البخارى ومسلم

২৭৯. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাঁর ছেলে ইব্‌রাহীমের ইন্‌তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়ে ছিল। তখন লোকেরা বলাবলি শুরু করল যে, ইব্‌রাহীমের ইন্তিকালের কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কারো মৃত্যু জনিত কারণে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয় না। কাজেই তোমরা গ্রহণ দেখতে পেলে সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি খুবই সংক্ষিপ্ত, এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত আদায়ের বিষয়ও এতে স্থান পায়নি। অন্য বর্ণনায় তাঁর সালাত আদায় এবং তার বিশেষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ এসেছে।

٢٨٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشَى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ مَارَاَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هٰذِهِ الاٰيَاتُ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَارَاَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ - رواه البخارى ومسلم

২৮০. হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার সূর্যগ্রহণ হলো। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিয়ামত হয়ে যাওয়ার আশংকা করতে থাকেন। এরপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চাইতে দীর্ঘ সময় দরে কিয়াম ও রুকূ-সিজ্‌দাসহ সালাত আদায় করেন। তিনি আরো বলেন, এগুলো হলো নিদর্শন যা আল্লাহ্ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সতর্ক করেন। সুতরাং যখনই তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখনই আল্লাহ্‌র যিকর দু'আ এবং ইস্‌তিগফারের দিকে ধাবিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨١- عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىِّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَّتْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ - رواه أبوداؤد والنسائى

২৮১. হযরত কাবীসা হিলালী (রা) থেকে বির্ণত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। এ সময় তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এত দ্রুত বের হয়ে আসেন যে, তার চাদর মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল এবং এ সময় মদীনাতে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তারপর তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন, যাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। তাঁর সালাত শেষ করার সাথে সাথে সূর্যগ্রহণও শেষ হয়। তখন তিনি বললেন ঃ এটা আলাহ্ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে থাকেন। যখন তোমরা এরূপ হতে দেখবে তখন দ্রুত তোমাদের সর্বশেষ ফরয সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করবে। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)

٢٨٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اَرْتَمِى بِاَسْهُمٍ لِى بِالْمَدِيْنَةِ فِى حَيوةِ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اذْ كَسَفَت الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللّٰه لاَنْظُرَنَّ الَى مَا حَدَثَ لِرَسُوْلِ للّٰه ﷺ فِى كُسُوْفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الصَّلَوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيُحْمِدُ وَيَدْعُوْ حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ - رواه مسلم

২৮২. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তীর-ধনুক নিয়ে মদীনায় অনুশীলন করছিলাম। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ লাগল। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কী করেন আমি অবশ্যই তা দেখব। তিনি বলেন, আমি দেখতে পেলাম, তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন। হাত তুলে তিনি তাসবীহ্, হামদ, তাহ্‌লীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) তাক্‌বীর ও দু'আয় মশগুল আছেন। সূর্যগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত সালাত ও দু'আ করতে থাকেন। এ সালাতে তিনি দু'টি সূরা পাঠ করেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। (মুসলিম)

٢٨٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَت الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الاُخْرَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الاُوْلَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهِ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ انَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰه لاَ يَخْسَفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِه فَاذَا رَاَيْتُمْ ذَالِكَ فَادْعُوْ اللّٰه وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ انْ مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِىْ عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِىْ اَمَتُهُ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰه لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا الاَهَلْ بَلَّغْتُ - رواه البخارى ومسلم

২৮৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর রুকূ করেন এবং দীর্ঘ রুকূ করেন। রুকূ হতে মাথা উঠান এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু পূর্বের দাঁড়াবার সময়ের চাইতে তা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর রুকূ করেন এবং দীর্ঘ রুকূ করেন কিন্তু তা ছিল প্রথম রুকূ হতে কিছু কম। এরপর সিজ্‌দা করেন, এবং দীর্ঘ সিজ্‌দা করেন। তা প্রথম রুকূ হতে কিছু কম। এরপর প্রথম রাক'আতের ন্যায় দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। তারপর তিনি ফিরেন। এদিকে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিতে যেয়ে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পাঠ করেন। এরপর বলেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণ দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে, তাক্‌বীর বলবে, সালাত আদায় করবে এবং দান সাদাকা করবে। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাত। কোন গোলাম বা বাদীর ব্যভিচারে কেউ এত ক্রুদ্ধ ও বিরক্তি বোধ করে না যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গোলাম বাঁদীর ব্যভিচারে ক্রুদ্ধ হন (তাই তাঁর শাস্তিকে ভয় কর এবং ব্যভিচার ও নাফরমানি থেকে দূরে থাক)

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাত! আল্লাহ্‌র শপথ। যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কাঁদতে বেশি এবং হাসতে কম। পরে তিনি বলেন, আমি কি আল্লাহ্‌র নির্দেশ যথাযথভাবে প্রচার করতে পেরেছি? (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সালাত যেহেতু ব্যতিক্রমধর্মী তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তা ব্যতিক্রমরূপেই আদায় করেন। ফলে অনেক সাহাবী এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানে শুধু পাঁচজন সাহাবীর রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হলো। হাদীস গ্রন্থসমূহে বিশের অধিক সাহাবী সূত্রে এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী (র.) বিভিন্নসূত্রে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্বলিত হাদীস নয় জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীস থেকে এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ জানা যায়। এর মধ্যে অধিকাংশ হাদীসেই একটি বিষয় চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে যে, এ সালাত সাহাবা কিরামের নিকট ছিল একান্তভাবেই নতুন এবং এর পূর্বে তাঁরা কখনো চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করেন নি। রিওয়ায়াত সমূহে একথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত যে, নবী নন্দন ইব্‌রাহীমের ইন্‌তিকালের দিনই সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। হাদীস বিশারদগণ বলেছেন ঃ ইব্‌রাহীম (র.) দশম হিজরী সনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইন্‌তিকালের

কয়েক মাস পূর্বে ইন্তিকাল করেছিলেন। এর দ্বারা একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কেবল একবারই সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করেছিলেন। আর হাদীস সূত্রেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। চন্দ্রগ্রহণের সময়কালীন সালাত আদায় সম্পর্কিত বিষয়টিও আলোচ্য হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চন্দ্র গ্রহণের সালাত আদায় করেছেন বলে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না। সম্ভবত এ কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি কেবল সূর্যগ্রহণের বিষয় আদিষ্ট হন এবং এর কয়েক মাস পর এ নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। আর এ সময়ের মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ হয়নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সালাত একান্তভাবেই ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে আদায় করেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে কতিপয় নতুন নতুন বিষয় প্রকাশিত হতে থাকে। এক. তিনি এই সালাত দীর্ঘ সময় ধরে আদায় করেন (যদিও জামা'আতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সালাত আদায় করা সচরাচর অভ্যাস পরিপন্থী ছিল বরং লোকদের এ থেকে নিষেধও করতেন)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি এই সালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা বাকারা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আলে-ইমরান পাঠ করেন। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এই সালাতে লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বরং মাটিতে পড়ে যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, এই সালাতে মানুষ চেতনাহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের মাথায় পানি ঢালতে হয়েছিল।

এ সালাতের নূতনত্বের মধ্যে এও ছিল যে, তিনি কিয়াম অবস্থায় হাত তুলে তাসবীহ্ তাহ্লীল, তাহ্মীদ ও তাক্বীর বলে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করে। অন্য হাদীসে এ বিস্ময়কর তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে যে, তিনি সালাতে দাঁড়ান অবস্থায় আল্লাহ্‌র হুযূরে ঝুঁকে পড়েন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থেকে দাঁড়িয়ে যান এবং কিরা'আত পাঠ করে রুকূ-সিজ্দা করেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, কিয়াম অবস্থা থেকে কেবল একবার নয় বরং কয়েকবার রুকূর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি এই সালাত আদায় কালে কখানা পিছনে হটে যান আবার কখনো সামনে এগিয়ে যান। আবার কখনো তিনি হাত সামনে সম্প্রসারিত করেন যেমন মানুষ কোন কিছু গ্রহণের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে থাকে। তিনি পরে খুতবায় বলেন ঃ এসময় তাঁর সামনে অদৃশ্য জগতের বহু হাকীকত প্রকাশ পায়। তিনি জান্নাত জাহান্নাম সামনে দেখতে পান। তিনি জাহান্নামের ভয়বাহ মর্মান্তিক শাস্তি প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি এমন বস্তুও দেখেন যা ইতো-পূর্বে কখনো দেখেন নি।

এই সালাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল বিষয় নূতনরূপে প্রকাশ পায় তাহল সালাতে হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করা, কিরা'আত পাঠরত অবস্থায় বারবার আল্লাহ্‌র সমীপে ঝুঁকে পড়া, কখনো পিছে হটে যাওয়া আবার কখনো সামনে এগিয়ে যাওয়া, কখনো নিজ হাত সামনে বাড়িয়ে দেওয়া এসবই অদৃশ্য বিষয় দর্শনের কারণেই হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ নবী নন্দন হযরত ইব্‌রাহীমের ইন্‌তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হওয়ায় তিনি খুত্‌বায় জোর দিতে ঘোষণা করেন যে, এই সূর্যগ্রহণের সাথে আমার বাসভবনের ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের কিছু মনে করা হবে মারাত্মক ভুল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সত্যভাষণ ও পবিত্র বাণী তাঁর সত্যতা পবিত্রতার এমনই দলীল যা ভয়ানকভাবে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কারীদের মনে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ প্রভাব কেবল জীবন্ত অন্তরেই অনুভূত হবে।

বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত (সালাতুল ইস্তিস্‌কা)

সকল প্রাণীর জীবন জীবিকা পানির সাথে সম্পৃক্ত থাকায় বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কাজেই কোন এলাকায় দুর্ভিক্ষ ও খরা দেখা দিলে তা সাধারণ বিপদের রূপ নেয়। বরং বলাচলে, এক ধরনের সাধারণ শাস্তির রূপ ধারণ করে। ব্যক্তিগত সমস্যা উত্তরনের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সালাতুল হাজতের (প্রয়োজন পূরনের সালাত) শিক্ষা দিয়েছেন যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, ঠিক একইভাবে সামষ্টিক বিপদ উত্তরনের লক্ষ্যেও একটি সালাত শিক্ষা দিয়েছেন যা সালাতুল ইস্তিস্‌কা (বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত) নামে পরিচিত। ইস্তিস্‌কার আভিধানিক অর্থ পানি প্রার্থনা করা এবং পানি দ্বারা যমীন প্লাবিত করার দু'আ করা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি সালাতুল ইস্তিস্‌কা আদায় করেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে তখন বৃষ্টিও বর্ষিত। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে উক্ত ঘটনার সবিস্তার বিবরণ পাঠ করা যেতে পারে।

٢٨٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَا النَّاسُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَامَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ

جَرْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّتَ وَبَلاَغًا اِلٰى حِيْنٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرُكِ الرَّفْعَ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ اِبِطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَنْشَاءَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَفَرَقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَاتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَاٰى سُرْعَتَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ - رواه ابوداؤد

২৮৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে। তিনি দিন ক্ষণ ঠিক করে সকলের নিকট থেকে ঈদগাহের ময়দানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি মাঠে মিম্বর স্থাপানের নির্দেশ দিলে তা স্থাপিত হয় । আয়েশা (রা.) বলেন সে দিন সূর্য উঠার সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে গিয়ে উক্ত মিম্বরে আরোহন করে সর্বপ্রথম তাক্‌বীর বলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করছ অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন ঃ যদি তোমরা তাঁর নিকট দু'আ কর, তবে তিনি তা কবুল করবেন। এরপর তিনি বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি পরমদাতা, মেহেরবান, কিয়ামতের দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ্! তুমি আল্লাহ্! তুমি ছাড়া অপর কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নেই। এবং আমরা তো তোমার মুখাপেক্ষী। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং তার সাহায্যে খাদ্য শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা কর। তার পর তিনি উভয় হাত এত উপরে উঠান যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এরপর তিনি লোকদের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে স্বীয় চাদর মুবারক উল্টিয়ে দেন এবং ঐ সময়ে ও তাঁর হাত উপরে ছিল। অবশেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে মিম্বর

হতে অবতরণের পর দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে মেঘ সঞ্চার করেন এবং মেঘের গর্জন ও ঘনঘটা শুরু হয়ে যায়। তার পর আল্লাহ্‌র হুকুমে এমন বৃষ্টিপাত হতে থাকে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে আসার পূর্বেই সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। এর পর তিনি যখন তাদেকে আর্দ্রতা হতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখেন, তখন এমনভাবে হেসে দেন যে, তাঁর দাঁত মুবারক দৃষ্টিগোচর হয়। এরপর তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহ্‌র বান্দাও রাসূল। (আবূ দাঊদ)

٢٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ اِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِىْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَفِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْوَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - رواه البخارى ومسلم

২৮৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হন এবং তাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এতে তিনি উচ্চকণ্ঠে কিরা'আত পাঠ করেন। এসময় তিনি নিজ হাত দু'টি উপরে তুলে কিব্‌লামুখী হয়ে দু'আ করেন। কিবলামূখী হওয়ার সময় তিনি নিজ চাদর উল্টিয়ে নিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ فِى الاِسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا - رواه الترمذى وأبوداؤد والنسائى وابن ماجة

২৮৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সালাতুল ইস্তিস্কার উদ্দেশ্যে সাধারণ পোশাক পরে (মাঠের উদ্দেশ্যে) বের হন। তিনি বিনয় নম্রতা সহকারে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করতে করতে পথ চলেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ 'সালাতুল ইস্তিসকা' মূলতঃ সাধারণ দুর্ভিক্ষ ও সামষ্টিক বিপদ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আদায় করা হয় এবং এত দু'আ করা হয়, উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহ থেকে এই সালাত সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় জানা যায়। যথাঃ-

১. সালাতুল ইস্তিস্‌কা উন্মুক্ত মাঠে আদায় করা উচিত, কারণ বৃষ্টি প্রার্থনার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত মাঠই যোগ্য স্থান এবং সেখানে মূলতঃ নিজ আকুতি অধিক প্রকাশ পায়।

২. জুমু‘আ ও ঈদের সালাত আদায়ের জন্য যেমন গোসল করা হয় ও উত্তম পোশাক পরিধান করা হয় তদ্রূপ এ সালাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। বরং এর বিপরীত সম্পূর্ণ সাধারণ পোশাক পরে দুঃস্থ ও ফকীরের বেশে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়া উচিত। যাঞ্চ্ঞনাকারীর জন্য ছেঁড়া কাপড় এবং দুঃস্থ অবস্থা বহাল রাখাই সমীচীন।

৩. নাচোড় বান্দার ন্যায় দু‘আ করা উচিত এবং এ উদ্দেশ্য আকাশের দিকে হাত অধিক উত্তোলন করা চাই।

প্রথমোক্ত দুই হাদীসে চাদর পরিবর্তন করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিব্‌লামুখী হয়ে নিজ চাদর পরিবর্তন করে নেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হে আল্লাহ্! আমি যেভাবে চাদর উল্টিয়ে নিয়েছি তুমি তেমনি বৃষ্টি বর্ষণ করে অনাবৃষ্টির অবস্থা পরিবর্তন করে দাও। সম্ভবত হাত উঠানোর ন্যায় একাজও আমলের অংশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতুল ইস্তিস্‌কা আদায় করেন তখন আকাশে মেঘের সঞ্চার হয় এবং তা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, অন্যান্য সাহাবীর রিওয়ায়াতে ও এ বিষয় বর্ণনা পাওয়া যায়।

আল-হামদুলিল্লাহ্! এবিষয়ে উম্মাতের ও সাধারণ অভিজ্ঞতা রয়েছে। অধম তার জীবনে কমপক্ষে তিনবার এই সালাত আদায় করেছে, প্রথম শৈশবে, দ্বিতীয়বার পনের বছর বয়সে লাখ্‌নৌতে এবং তৃতীয়বার ১৯৫১ সালে পবিত্র মদীনায়। তিন বারই আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, যখন সালাত ও দু‘আর ফলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা‘আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।”

পূর্ণ দাসত্বের দাবি হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সালাত এবং দু‘আর ফলস্বরূপ মু‘জিযারূপে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

ঘোষণা দেওয়া জরুরী মনে করেন যে এসব যা হয়েছে তা মূলতঃ আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছারই অভিব্যক্তি। তাই তিনিই সার্বিক হামদ ও শুক্‌রের মালিক, আর আমি কেবল আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ্! তোমার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি রহমত বর্ষণ কর।

জানাযার সালাত এবং তার আগে ও পরে করণীয়

হাদীস বিশারদগণ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সালাত অধ্যায়ের শেষে জানাযা অধ্যায় সন্নিবেশিত করে তার অধীনে মৃত্যু, মৃত্যুশয্যার রোগ বরং সাধারণ রোগ ব্যাধি ও তখনকার করণীয় ইত্যাকার বিষয় আলোচনা করেন। এর পর মৃতর গোস, দাফন-কাফন, জানাযার সালাত, শোকপ্রকাশ, কবর যিয়ারত ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসসমূহ বর্ণনা করেন। এই নিয়মের অনুসরণে এখানে এ সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী ও আমলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এসব হাদীসের সারকথা হল,মৃত্যু অবশ্যাম্ভাবী এবং তার কোন নির্ধারিত সময় নেই। কাজেই মৃত্যুর ব্যাপারে কোন মুসলমানের অচেতন থাকা উচিত নয়, সর্বদা তা স্মরণ রাখা এবং আখিরাতের এই সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। বিশেষতঃ যখন কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তার নিজ দীনী ও ঈমানী অবস্থা সংশোধন করে নেয়া উচিত। এবং আল্লাহ্ সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। একজন রোগাক্রান্ত হলে অপরজনের সেবা শুশ্রূষা ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার চিন্তা হাল্‌কা করা উচিত এবং তার মনোরঞ্জনের ও সাধ্যমত চেষ্ট করা উচিত। রোগ মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তার জন্য দু'আ করে তার দেহে ফুঁক দেওয়া উচিত সাওয়াব লাভ করা যায় এমন কথা বলা এবং আল্লাহ্‌র শান ও রহমতের আলোচনা তার সামনে করা উচিত। তবে বিশ্বাস জন্মে যে, রোগী সুস্থ হবে না এবং মুত্যু অত্যাসন্ন এমতাবস্থায় তার অন্তর আল্লাহ্ অভিমুখী করা এবং ঈমানের কালেমা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার যথোচিত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তার পর মারা গেলে মৃতের নিকটাত্মীয়দের ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং মৃত্যু সহজাত ব্যাপার একে আল্লাহ্‌র ফয়সালা মনে করে তাদের মাথা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঝুঁকিয়ে দেয়া উচিত, এরূপ দুঃখ -কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাওয়াব প্রাপ্তির আশা করা এবং মৃতের জন্য দু'আ করা উচিত। এরপর মৃতের গোসলের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাফন পরানো এবং সুগন্ধি ব্যবহার করানো চাই। এরপর তার জানাযার সালাত আদায় করে নিতে হবে এবং তাতে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ ও প্রশংসা। তাঁর মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি এবং উম্মাতের (মৃত ব্যক্তিসহ সকল মু'মিনের) পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য

রহমতের দু'আ করতে হবে। এসবের পর মৃতের জন্য আল্লাহ্‌র দয়া অনুগ্রহ কামনা করে দু'আ করা উচিত। এরপর অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে মাটির মধ্যে রেখে দিতে হবে, যে মাটির অংশ দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর মৃতের শোক সন্তপ্ত নিকটাত্মীয়-স্বজনের সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত এবং তাদের সান্ত্বনা দিয়ে দুশ্চিন্তা লাঘবের চেষ্টা করা উচিত।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর রহস্য পরিষ্কার, অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গেছে যে, সাধারণ রোগ-ব্যাধি এবং অপরাপর বিপদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত কার্যক্রম অনুযায়ী কাজ করা হলে অন্তরে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসে। তাঁর দেওয়া প্রতিটি শিক্ষা ও নির্দেশনা অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণের ক্ষেত্রে ঔষধরূপে কাজ করে। মৃত্যু আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের মাধ্যম হওয়ায় তা একজন বান্দার অভিপ্রেত ব্যাপার হচ্ছে যায়। এগুলো দুনিয়ারী বরকতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আখিরাতের বিষয়সমূহ ইনশাআল্লাহ্ সামনে আসবে যা প্রাপ্তি অঙ্গীকার পরবর্তী হাদীসসমূহে করা হয়েছে। এই ভূমিকার পর এ পর্যায়ে কতিপয় হাদীস পাঠ করা যেতে পারে।

মৃত্যুর স্মরণ এবং তার আকাঙ্ক্ষা

٢٨٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَهَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ- رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة

২৮৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধ্বংসী মৃত্যুর কথা তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করবে। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ)

٢٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِىَّ فَقَالَ كُنْ فِىْ الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ، وَكَانَ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَااَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَّاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيوتِكَ لِمَوْتِكَ - رواه البخارى

২৮৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন ঃ তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের ন্যায় অথবা পথযাত্রীর মত থাকবে। আর ইব্‌ন উমর (রা) (এই হাদীসের ভিত্তিতে) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা

করবে না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। (যেহেতু ততক্ষণ বাঁচবে কিনা জানা নেই) তোমার সুস্থতার অবকাশে তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখবে। আর জীবিতাবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। (বুখারী)

٢٨٩– عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ –رواه البخارى ومسلم

২৮৯. হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহ্ও তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অপ্রিয় মনে করে, আল্লাহ্ও তাঁর সাক্ষাৎ অপ্রিয় মনে করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) বর্ণিত হাদীসখানা রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) অথবা নবী সহ ধর্মিনীদের অন্য কেউ বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমাদের অবস্থান হল এই আমরা তো মৃত্যু অপসন্দ করি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবে যা বলেছেন তার সারমর্ম হল, আমার কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষ মৃত্যু কামনা করুক, কেননা মৃত্যু অপ্রিয় হওয়া মানুষের সহজাত ব্যাপার। বরং আমার কথার উদ্দেশ্য হল, মৃত্যুর পর মু'মিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র যে দয়া অনুগ্রহ লাভ উদ্দেশ্য যা মৃত্যুর সময় তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা যেন সে প্রিয় মনে করে এবং তা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়। যার অবস্থা এরূপ আল্লাহ্ তাকে পসন্দ করেন বেং তার সাক্ষাৎ কামনা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দকাজসমূহ আঞ্জাম দেওয়ায় আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তির উপযুক্ত, মৃত্যুর সময় তাকে তার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তাই যে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হওয়াকে অপ্রিয় মনে করে এবং নিজের জন্য কঠিন বিপদ মনে করে। এরূপ ব্যক্তির সাক্ষাৎ আল্লাহ্ চান না, বরং তাকে অপসন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী لقاء الله দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নয় বরং মৃত্যু পরবর্তী সময়ে বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র যে আচরণ হবে তা-ই বুঝানো হয়েছে। একই বিষয়ের উপর বর্ণিত আয়েশা (রা.) এর হাদীসের শেষাংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, اَلْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللّٰهِ "মৃত্যু হল আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের পূর্ব ঘটনা।"

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন মানুষের এই দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবার সময় কাছাকাছি এসে পড়ে তখন পাশবিকতা ও জড় জগতের গাঢ় পর্দা ছিন্ন হয়ে যায় এবং আত্মার কাছে আখিরাত স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঐ সময় নবী-রাসূলগণ বর্ণিত আখিরাতের হাকীকত ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াবলী তার সামনে ফুটে উঠে। এসময় মু'মিন ব্যক্তির আত্মা যা সর্বদা পাশবিকতার দাবি নিয়ন্ত্রণ করে ফিরিশতাসুলভ গুর্ণাবলী অর্জনে সচেষ্ট থাকত, সে আল্লাহ্ অনুগ্রহও দয়া দেখে তাড়াতাড়ি আখিরাতের জগতে প্রবেশের মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আত্মপূজায় এবং পাশবিকতার মাঝে আকণ্ঠ নিয়জ্জিত থেকে দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদনে ব্যস্ত ছিল, সে মৃত্যুর সময় তার মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে। ফলে সে কোনভাবে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে চায় না। শাহ্ওয়ালী উল্লাহ্ (র.) বলেন, এই দুই ব্যক্তির অবস্থাকেই أحب لقاء الله এবং كره لقاء الله বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আব أحب لقائه এবং كره لقائه দ্বারা উদ্দেশ্য হল যথাক্রমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি, পুরস্কার ও তিরস্কার, সাওয়াব ও আযাব।

২৭. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ - رواه البيهقى فِى شعب الايمان

২৯০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত্যু হল মু'মিনের জন্য উপহার। (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, সহজাত কারণেই মানুষের কাছ মৃত্যু প্রিয় বস্তু নয়। কিন্ত আল্লাহ্র যে সকল বান্দা ঈমানরূপী দৌলত ধন্য হয়েছে। সে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশেষ পুরস্কার লাভের আশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে এবং সংগত কারণেই মৃত্যুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে সহজাত কারণে মানুষ চোখে অস্ত্রোপচার করাতে আগ্রহী নয়। কিন্তু যখন তার হৃদয়ে এই বিশ্বাস জন্মে যে, তার চোখে আলো ফিরে আসবে তখন সে তা (অস্ত্রোপচার) করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং ডাক্তারকে দেখিয়ে চোখে অস্ত্রোপচার করতে যায়। এখানে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আস্ত্রোপচারের ফলে চোখের জ্যোতি ফিরে আসার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত নয়। কারণ কখনো কখনো অস্ত্রোপচার ব্যর্থও হয়। কিন্ত মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহ্র কাছ থেকে বিপুল পুরস্কারে ভূষিত হওয়া এবং তার দীদার লাভের বিষয়টি একান্তভাবেই সুনিশ্চিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যু উপহার স্বরূপ। এবিষয়টি

ভালভাবে বুঝে নেয়ার জন্য আরো একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। প্রত্যেক মেয়ের জন্য বিবাহ পরবর্তী জীবনের পিতা-মাতার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে যাওয়ার বিষয়টি একারণে অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক যে, সে পিতা-মাতার স্নেহে-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যত জীবন অপরিচিত পরিবেশ ও লোকজনের মধ্যে ঘর বাধতে যাচ্ছে। কিন্তু বিবাহের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সুখশান্তি অর্জনের লক্ষ্যে সন্দেহাতীতভাবে বিবাহের জন্য তার মনে প্রবল আগ্রহও থাকে। বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের বিষয়টিও ঠিক একই ধরনের। কারণ মৃত্যুর পর সে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, নৈকট্য লাভ ইত্যাকার কারণে মৃত্যুর প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ও ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়।

মৃত্যু কামনা করা এবং এর জন্য দু'আ করা নিষেধ

অনেক লোক দুনিয়ার কষ্ট ও দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে মৃত্যু কামনা করে এবং মৃত্যুর জন্য দু'আ ও করে, তবে একাজন নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা, ভীরুতা ও ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক এবং ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণও বটে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٩١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اَمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَاَمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَسْتَعْتِبَ -

২৯১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে সৎ হলে আরো নেকী অর্জন করবে আর অসৎ হলে (তাওবা করে) আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে যে শব্দগুচ্ছ যোগে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য দেখা যায়। তাতে মৃত্যু কামনার সাথে সাথে মৃত্যুর জন্য দু'আ করার বিষয়েও নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

٢٩٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ- رواه البخارى ومسلم

২৯২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ বিপদ গ্রস্ত হয়েও যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে তা করতেই চায় তবে যেন বলে اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ "হে আল্লাহ্! আমাকে জীবিত রাখ যে পর্যন্ত আমার জীবন আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

রোগ ব্যাধি মু'মিনের জন্য রহমত এবং পাপের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন যে, মৃত্যুবরণ করা অর্থ অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া নয় বরং এক জীবন হোকে অন্য জীবনে পাড়ি জমানো। মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয় এদিক থেকেই মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপহার স্বরূপ। তাই তিনি বলেছেন, রোগব্যাধি কোন দুঃখের কিংবা বিপদের বিষয় নয়। বরং একদিক থেকে তা রহমতও বটে। কারণ এর দ্বারা পাপ বিমোচিত হয়। রোগব্যাধি ও অপরাপর বিপদাপদকে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য সতর্কবাণী বলে মনে করতে হবে এবং নিজের সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এসব বিষয়ের শিক্ষা ও নির্দেশনা রয়েছে।

٢٩٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبَ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ اَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - رواه البخارى ومسلم

২৯৩. হযরত আবূ সাঈদ (র.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হয়, রোগাক্রান্ত হয়, কোন দুশ্চিন্তার শিকার হয়, কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় এমন কি তার দেহের কোথাও কাঁটাবিদ্ধ হয় এসব দ্বারা আল্লাহ্ তার পাপরাশি মুচে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا - رواه البخارى ومسلم

২৯৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলামানের প্রতি যে কোন কষ্ট পৌঁছে থাকুক না কেন,

চাই তা রোগ-ব্যাধি বা অন্য কিছু আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা তার পাপরাশি ঝেড়ে ফেলেন যে ভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ -رواه الترمذى

২৯৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন নারী ও পুরুষের বিপদ লেগেই থাকে। কখনো তার নিজের উপর, কখনো তার ধন-সম্পদে, কখনো তার সন্তান-সন্ততিতে যার দরুন তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি সে আল্লাহ্র দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হয় যে তার কোন পাপই থাকে না। (তিরমিযী)

٢٩٦- عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ خَالِدِ السُّلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعِلْمِهِ ابْتِلاَهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهِ اَوْ فِىْ مَالِهِ اَوْ فِىْ وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ ذَالِكَ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ -رواه أحمد وأبو داؤد

২৯৬. মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ সুলামী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর পিতামহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দার জন্য যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে এবং সে যদি তা আমল করে অর্জন করতে না পারে তখন আল্লাহ্ তাঁর শরীর, সম্পদ ও সন্তানের দ্বারা পরীক্ষা করেন। তার পর তাকে ধৈর্যের তাওফীক দেন যাতে সে বিপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্র নির্ধারিত মর্যাদা লাভ করতে পারে। (আহ্মাদ ও আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল ক্ষমতার উৎস ও এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি যদি চান তাহলে বিনা কাজে তাঁর বান্দারকে মর্যাদা সমুন্নত করতে পারেন। কিন্ত সুবিচারের দাবি হল, যে ব্যক্তি তার কাজ দ্বারা যে মর্যাদা পেতে পারে তাকে সে স্থানে রাখা। কেননা আল্লাহ্র বিধান হল এরূপ যে, যখন তিনি কোন বান্দার কাজ পসন্দ করেন অথবা কারো দ্বারা দু'আ করিয়ে তার মর্যাদা সমুন্নত করেন অথচ কাজ দ্বারা সে উক্ত মর্যাদায় উন্নতি হতে পারে নি, এমতাবস্থায় ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং তাতে ধৈর্যধারণেরও তাওফীক দেন।

٢٩٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِيْنَ يُعْطَى اَهْلَ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ - رواه الترمذى

২৯৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছান্দ্যে বসবাসকারীরা কিয়ামতের দিন যখন দেখবে যে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাওয়াব দেয়া হচ্ছে, তখন তারা আফসোস করে বলবে, হায় দুনিয়াতে যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কাটা হতো। (তিরমিযী)

٢٩٨- عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا صَابَهُ السَّقْمُ عَافَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوْبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَاِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَا مَرِضَ اُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ اَهْلُهُ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلِمَ اَرْسَلُوْهُ - رواه أبوداؤد

২৯৮. হযরত আমির আর-রামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, মু'মিন ব্যক্তির যখন রোগ হয় তার পর আল্লাহ্ তাকে আরোগ্য দান করে এতে তার অতীত পাপের ক্ষতিপূরণ হয় এবং ভবিষতের জন্য শিক্ষণীয় ও সতর্কবাণী হয়ে থাকে। কিন্তু মুনাফিক আখিরাত থেকে গাফিল যখন রোগাক্রান্ত হয় এরপর তাকে আরোগ্য দান করা হয় সে এ থেকে উপকৃত হয় না। তার দৃষ্টান্ত ঐ উটের ন্যায় যাকে তার মালিক বেঁধেছিল তার পর ছেড়ে ছিল। অথচ সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, অস্থিরতা (যা এই দুনিয়ায় আকশ্যিকভাবে হয়েই থাকে) তাকে কেবল বিপদ এবং আল্লাহ্র ক্রোধের ও শাস্তির বহিঃপ্রকাশ মনে না করা উচিত আল্লাহ্র সাথে যারা নিবিড় সম্পর্ক রাখে তাদের জন্য এ সবের মধ্যে বিরাট কল্যাণ ও রহমত নিহিত রয়েছে। এর দ্বারা পাপ বিমোচিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ এবং বুলন্দ মর্যাদা লাভ করা যায় এবং আমলের ঘাটতি পূরণ হয়। এগুলো দ্বারা ভাগ্যবানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আল্লাহ্‌র যে সকল বান্দা বড় বড় রোগ ব্যাধি এবং বিপদাপদকে অনুগ্রহ ও দয়া প্রাপ্তির একটি মাধ্যম মনে করেন তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত শিক্ষার মধ্যে কতই না বিরাট বরকত নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিরল মর্যাদা যাদের দান করেছেন তারা ভালভাবে জানেন যে, একত বিরাট অনুগ্রহ। তারা আরো জানেন, রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাদের ঈমানে কত শক্তি সঞ্চয় হয় এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসার স্তর কত উন্নত করা যায়।

রোগাক্রান্ত থাকাকালে সুস্থ থাকাকালীন আমলের সাওয়াব লাভ

٢٩٩– عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرَكُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا – رواه البخارى

২৯৯. হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয় অথবা সফর করে যার ফলে নিয়মিত আমল করতে পারে না তার জন্য তাই লেখা হয় যা সে সুস্থ থাকা অবস্থায় অথবা বাড়ী থাকা অবস্থায় আমল করত। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা সফরে থাকে অথবা অন্য কোন উযরবশত তার সাধারণ আমল করতে না পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় সুস্থ ও মুকীম বাড়ীতে অবস্থানরত থাকা কালে তার কৃত আমলের সাওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেন। 'হে আল্লাহ্! তোমারই প্রশংসা, তোমারই জন্য শোক্‌র, আমরা তোমার গুণ-কীর্তন করে শেষ করতে পারব না।"

রোগীর সেবা করা, সান্ত্বনা দেওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা

রোগীর সেব করা, সান্ত্বনা দেওয়া এবং তার সেবাযত্ন করাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সার্বোচ্চ সৎকাজ এবং গ্রহণযোগ্য ইবাদাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং বিভিন্নভাবে এ সরের প্রতি অনুপ্রাণিতও করেছেন। তিনি স্বয়ং রোগীদের সেবা করতে যেতেন এবং তাদের সাথে এমন কথা বলতেন যাতে তাদের মনে প্রশান্তি আসত এবং দুশ্চিন্তা হাল্‌কা হয়ে যেত। আল্লাহ্‌র নাম ও কুরআন পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিতেন এবং অন্যান্যদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

٣٠٠– عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ – رواه البخارى

৩০০. হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তদের অন্ন দাও, রুগীদের সেবা কর এবং বন্দীদের মুক্তি দাও। (বুখারী)

٣٠١- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمُ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ لَمْ يَزَلْ فِىْ خَرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعُ - رواه مسلم

৩০১. হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যখন তার কোন রোগী মুসলমান ভাইয়ের সেবা করতে যায়, প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানের ফল চয়ন করতে থাকে। (মুসলিম)

٣٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَى مَرِيْضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً- رواه ابن ماجة

৩০২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সেবা করতে যায়, আকাশ থেকে একজন আহবায়ক তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি মুবারক হও এবং মুবারক হোক তোমার এই পদচারণা। তুমি জান্নাতে নিজ আবাস তৈরি করে নিলে। (ইব্‌ন মাজা)

٣٠٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَه فِىْ اَجَلِه فَاِنَّ ذَالِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطِيْبُ بِنَفْسِه -رواه الترمذى وابن ماجة

৩০৩. হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন রোগীর কাছে যাবে তার জীবন সম্পর্কে আনন্দদায়ক কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেবে। (এ সাত্ত্বনার বাণী) ভাগ্যের পবির্তন ঘটাবে না যা ঘটার তাই ঘটবে কিন্তু তার মন সাত্ত্বনা লাভ করবে। যা রোগীকে দেখতে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য। (তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা)

٣٠٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلاَمُ يَهُوْدِىٌّ يَخْدِمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِه فَقَالَ لَه اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلَى اَبِيْهِ وَهُوَ

عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَضَهُ مِنَ النَّارِ- رواه البخارى

৩০৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ইয়াহূদী যুবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমত করত। একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে যান এবং তার শিয়রে বসে বললেন ঃ তুমি মুসলমান হায় যাও। সে তার পিতার দিকে তাকাচ্ছিল। উল্লেখ্য, তার পিতাও তখন তার কাছে ছিল। সে (তার পিতা) বলল, তুমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মেনে নাও। সুতরাং সে মুসলমান হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে বের হয়ে বললেন ঃ ঐ আল্লাহ্‌রই প্রশংসা যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিলেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস সূত্রে একটি বিশেষ কথা জানা গেল যে, অমুসলিমরাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করত । দ্বিতীয়ত এও জানা গেল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিম রোগীদেরও দেখতে যেতেন। তৃতীয়ত এও জানা যায় যে, কোন অমুসলিমের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যের ফলে এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ত যে, নিজ পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য সমর্পণ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করত।

রোগীর উপর ফুঁক দেওয়া এবং তার আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ করা

٣٠٥- عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَكَى مِنَّا اِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقْمًا - رواه البخارى ومسلم

৩০৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত তার দেহে বুলাতেন এবং বলতেন اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقْمًا "হে মানুষের প্রতিপালক! এই রোগ নিরাময় কর এবং তাকে সুস্থ কর। কেননা তুমিই রোগ নিরাময়কারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত এমন কোন আরোগ্য নেই যা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٦- عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ اَبِىْ الْعَاصِ اَنَّهُ شَكَى اِلَى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَجْعًا يَجِدُهُ فِىْ جَسَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِىْ يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ فَفَعَلْتُ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِىْ - رواه مسلم

৩০৬. হযরত উসমান ইব্‌ন আবুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এমন রোগের কথা জানান যা তিনি নিজ দেহে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তোমার দেহের বেদনাযুক্ত স্থানে নিজ হাত রাখ এবং তিনবার বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা আর সাতবার হল ঃ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ "আমি যা অনুভব করছি এবং আশংকা করছি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও কুদ্‌রতের পানাহ চাচ্ছি।" তিনি বলেন, আমি কার্যত তাই করলাম। ফলে আমার শরীরের কষ্ট আল্লাহ্ দূর করে দিলেন। (মুসলিম)

٣٠٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ اُعِيْذُ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ رواه البخارى

৩০৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রা.) এর জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন এবং বলতেন اُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ ঃ لاَمَّةٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ "আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যসমূহের দ্বারা পানাহ চাচ্ছি প্রত্যেক শয়তান থেকে, প্রত্যেক বিষধর কীট থেকে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চোখ থেকে। তিনি আরো বলতেন, তোমাদের উর্দ্ধতন পিতা (ইব্‌রাহীম আ.) এই শব্দমালার দ্বারা তাঁর দুই সন্তান যথাক্রমে হয়রত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) এর জন্য পানাহ চাইতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ "কালিমায়ে তাম্মাহ" দ্বারা আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম অথবা কুরআন মাজীদ বুঝানো হয়েছে। তিনি ইমাম হাসান ও হুসাইন (রা.) এর জন্য পানাহ চেয়ে এই

দু'আ পাঠ করে ফুঁক দিতেন এবং তাঁদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন।

٣٠٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيْ كَانَ تُوُفِّيَهِ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيْ كَانَ يَنْفُثُ وَاَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ - رواه البخارى ومسلم

৩০৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত হলে মু'আব্বিযাত (সূরা নাস ও ফালাক) দ্বারা নিজ দেহের উপর ফুঁক দিতেন এবং নিজ হাত শরীরে বুলাতেন। যখন তিনি ঐ রোগে আক্রান্ত হন যাতে তাঁর ইন্‌তিকাল হয়, তখন আমি মু'আব্বিযাত পাঠ করে তাঁর শরীর ফুঁক দিতাম যে মু'আব্বিযাত পাঠ করে তিনি নিজে ফুঁক দিতেন। তবে আমি তাঁর পবিত্র হাত দ্বারাই তাঁর শরীর মুছে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত মু'আব্বিযাত দ্বারা সূরা নাস ও ফালাক বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাওয়া হয় এবং যা পাঠ করে তিনি রোগীদের উপর ফুঁক দিতেন। এমনিতর কিছু সংখ্যক দু'আ উপরে বর্ণিত হাদীসেও এসেছে। আল্লাহ্ চাহেত অবশিষ্ট দু'আ আদ-দাওয়াত অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

মৃত্যুর লক্ষণ স্পষ্ট হলে করণীয় কী?

٣٠٩- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ- رواه مسلم

৩০৯. হযরত আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মুমূর্যু ব্যক্তিদেরকে একথা বলার উপদেশ দেবে যে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে মৃত বলতে মুমূর্ষু ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে যার মৃত্যুর লক্ষণ পরিষ্কার হয়ে ওঠেছে। এসময় তাদের সামনে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এই কালিমার উপদেশ দেওয়ার অর্থ হল, তার মন যেন আল্লাহ্‌র তাওহীদের দিকে ধাবিত হয়। যদি মুখে উচ্চারণ করতে পারে তাহলে কালিমা পাঠ করে যেন তার ঈমান শাণিত করে নেয় এবং এ অবস্থার মধ্য দিয়েই যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আলিমগণ পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঃ মুমূর্ষু অবস্থায় যেন কালেমা পাঠ করানোর

চেষ্টা করা না হয়। কারণ অজান্তে তার মুখ থেকে অন্য শব্দও বের হতে পারে। তাই মৃতের সামনে কেবল কালিমা ঃ পাঠ করাই যথেষ্ট।

٣١٠- عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه أبوداؤد

৩১০. হযরত মু'আয ইব্ন জাবল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার (জীবনের) শেষ বাক্য হবে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰه সে জান্নাতী। (আবূ দাঊদ)

٣١١- عَنْ مَعْقَلِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا سُوْرَةَ يس عَلَى مَوْتَاكُمْ-رواه أبوداؤد وابن ماجة

৩১১. হযরত মালিক ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষদের উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে। (আহ্মাদ, আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মৃত্যু পথযাত্রীরূপে তাদের বুঝনো হয়েছে যাদের উপর মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে কী হিক্মত নিহিত তা কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তবে একথা স্পষ্ট যে এই সূরা ইয়াসীন ও ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সবিস্তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। বিশেষত সর্বশেষে فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ "অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬, সূরা ইয়াসীন ঃ ৮৩) আয়াতটি মৃত্যুর সময়ের খুবই উপাযোগী।

٣١٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثِ اَيَّامٍ يَقُوْلُ لاَ يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللّٰهِ - رواه مسلم

৩১২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র প্রতি মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের এটাই দাবি। আল্লাহ্কে ভয় করার সাথে সাথে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে মানুষ বিশেষ করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ কালে যেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ আশা করে। রোগী যেন স্বয়ং এ চেষ্টা করে এবং তার সেবকও যেন তার সামনে এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তার সুধারণা স্থাপিত হয় এবং দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশার সঞ্চার হয়।

মৃত্যুর পর করণীয় কী?

٣١٣- عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى اَبِىْ سَلْمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاَبِىْ سَلْمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِىْ الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ - رواه مسلم

৩১৩. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবূ সালামার কাছে যান। তখন তাঁর চোখ দু'টি বিস্ফারিত ছিল। তিনি তা বন্ধ করে দেন এবং বলেন, আত্মা যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন চোখ সাথে সাথে চলে যায় (তাই মৃত্যুর পর চোখ বন্ধ করে দেওয়া উচিত)। একথা শুনে তাঁর পরিবারের সদস্যরা উচ্চঃস্বরে কেঁদে ওঠলো এবং নানা অভিশাপমূলক বাক্য উচ্চারণ করতে লাগল। তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেদের জন্য ভাল ব্যতীত দু'আ করো না। কারণ তোমাদের কথার সাথে মিল রেখে ফিরিশ্‌তারা আমীন আমীন বলতে থাকে। তারপর তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আবূ সালামাকে ক্ষমা করে দাও, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করে দাও এবং তাঁর উত্তরসূরীদের জন্য তুমিই অভিভাবক হয়ে যাও। হে জগতসমূহের প্রতিপালক ! আমাদেরকেও তাঁকে ক্ষমা করে দাও। তাঁর জন্য কবর প্রশস্ত করে দাও এবং তাঁর কবরকে জ্যোতির্ময় করে দাও।" (মুসলিম

٣١٤- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَاامَرَهُ اللّٰهُ بِهِ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَافَلَمَّا مَاتَ اَبُوْسَلَمَةَ قُلْتُ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بَيْتٍ هَاجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اِنِّىْ قُلْتُهَا فَاخْلَفَ اللّٰهُ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - رواه مسلم

৩১৪. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যখন বিপদে পড়ে, তখন যে যদি আল্লাহ্‌র

নির্দেশানুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলে নিম্নের দু'আ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها "হে আল্লাহ্! আমাকে বিপদে ধর্যধারণের সাওয়াব দাও এবং এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য কর" পাঠ করে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করবেন। যখন আবূ সালামা (রা.) ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি বললাম, আবূ সালামা (রা.) থেকে কে উত্তম হতে পারে? কারণ তাঁর পরিবার প্রথম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হিজরত করেছিল। তারপর আমি এই দু'আ পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আমার জন্য দান করলেন। (মুসলিম)

٣١٥- عَنْ حَصِيْنِ ابْنِ وَحْوَحٍ اَنَّ طَلْحَةَ ابْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لاَ انِّىْ لاَأُرَى طَلْحَةَ الاَّ قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَاَذِنُوْبِهِ وَعَجِّلُوْا فَانَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَتَيْ اَهْلِهِ-

رواه أبوداؤد

৩১৫. হাসীন ইব্ন ওয়াহওয়াহ্ থেকে বর্ণিত। তালহা ইব্ন বারা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম ﷺ তাঁকে দেখতে যান। তিনি তাঁর নাযুক অবস্থা দেখে বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। যদি তা-ই হয় তবে আমাকে সংবাদ দেবে এবং তাঁর দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সেরে নিবে। কারণ মৃতকে তার দীর্ঘক্ষণ পরিবারের মধ্যে আটকে রাখা কোন মুসলমানর জন্য সমীচীন নয়। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর মৃতের দাফন-কাফনের কাজ যথা সাধ্য তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা উচিত।

মৃতের জন্য কান্নাকাটি, উচ্চস্বরে বিলাপ ও মাতম করা

কারো মৃত্যুজনিত কারণে তার নিকট আত্মীয় স্বজনের দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া এবং তার ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ বেয়ে পানি ঝরা কিংবা অন্য কোন-ভাবে দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মৃতের জন্য তার আপন জনদের আন্তরিক ভালবাসা ও সমবেদনারই প্রতিফলন যা মানবতার এক মূল্যবান ও পসন্দনীয় উপাদান। একারণে শরী'আতে এটা নিষিদ্ধ নাই বরং কিছুটা প্রশংসনীয়ও বটে। তবে কান্নাকাঠি ও মাতম করাকে শরী'আত কখনো অনুমোদন করে না। যদিও একদিক থেকে এর মূল্যায়ন করা হয়েছে কিন্তু অপর দিকে উচ্চস্বরে কান্না ও মাতম এবং স্বেচ্ছায় বিলাপ করাকে কঠিনভাবে

নিষেধ করা হয়েছে। প্রথমত, এ কাজ দাসত্বের অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি রূপ যে নি'আমত দান করেছেন এবং বিপদাপদ উত্তরণের যে বিশেষ যোগ্যতা দান করেছেন উচ্চস্বরে চিৎকার, মাতম, বিলাপ ইত্যাদি করা মূলতঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত সে নি'আমতের অস্বীকৃতি বৈকি! কারণ এর ফলে অন্যের দুঃখ বেদনা আরো বেড়ে যায় এবং চিন্তাও কার্যশক্তি দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া উচ্চস্বরে কাঁদা ও মাতম করা মৃতের জন্য (কবরে) শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

٣١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِيْ غَاشِيَةٍ فَقَالَ قَدْ قُضِيَ ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ لاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَاَشَارَ اِلَى لِسَانِهِ اَوْ يَرْحَمُ وَاِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ - رواه البخارى

৩১৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে যান আর তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে গোলাম তখন যদি ছিলেন বেহুঁশ। তিনি জানতে চাইলেন তাঁর কি ইন্‌তিকাল হয়েছে? উপস্থিত লোকজন বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি ইন্‌তিকাল করেন নি। তখন তিনি কেঁদে উঠলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাঁদতে দেখে সাহাবা কিরাম ও কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা মনে রাখ যে, আল্লাহ্ অন্তরের ব্যথা ও চোখের পানির জন্য কাউকে শাস্তি দেন না। তিনি তাঁর জিহবার দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ্ শাস্তি দেন (মাতমের কারণে) কিংবা দয়া করেন (দু'আ ইস্তিগ্‌ফারের কারণে) তবে মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের (উচুস্বরে বিলাপও) কান্নার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মূল বক্তব্য হল, মৃতের জন্য উচ্চস্বরে না কাঁদা এবং মাতম না করা। কারণ এগুলো কাজ আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তির কারণ। বরং ইন্না

লিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এবং ইস্তিগফার পাঠ করা উচিত এবং এমন কথা বলা উচিত যাতে আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ লাভ হয়। এই হাদীসে পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে মৃতের শাস্তি হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এই বিষয়ের হাদীস ইব্ন উমর (রা.) ছাড়াও তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবা বর্ণনা করেছেন। কিন্ত হযরত আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) এই বিষয় অস্বীকার করেন।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, তাঁর কাছে যখন হয়রত উমর এবং উমর তনয় ইব্ন উমর (রা.)-এর রিওয়ায়াত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় তখন তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এ দু'জন সত্যবাদী, কিন্তু এই রিওয়ায়াতের বিষয়ে তাঁরা ভুলে গিয়েছেন অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী শুনা কিংবা বুঝার ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হয়েছেন। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) কুরআনের এই আয়াত لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। (৬ সূরা আন'আম ঃ ১৬৪) দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, এই আয়াতে এ মর্মে একটি মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, কারো পাপের শাস্তি কেউ বহন করবে না। কাজেই পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে কীভাবে মৃতের শাস্তি হতে পারে। কিন্ত হযরত উমর (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে যে রিওয়ায়াত পাওয়া যায় তা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, না তাঁরা ভুলের শিকার হয়েছেন আর না তাঁরা হাদীসের মর্ম অনুধাবনে ভুল করেছেন। অপরপক্ষে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক পেশকৃত দলীলও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। তাই হাদীস বিশারদগণ উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা হল, এই পরিবারের সদস্যদের কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারে যদি মৃতের কোন সম্পৃক্ততা ও অসাবধানতা থাকে, যেমন সে মৃত্যুর পূর্বে যদি উচ্চস্বরে চিৎকার ও মাতম করার ওসীয়াত করে, যেরূপ আরব সমাজে প্রচলন ছিল এবং নিদেনপক্ষে সে যদি পরিবারের লোকদের কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে নিষেধ না করে থাকে (তবে মৃতের কবরে শাস্তি হবে)। এক্ষেত্রে হযরত উমর ও ইব্ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতের যথার্থতা দেখা যায়। স্বয়ং ইমাম বুখারী (র) সহীহ্ বুখারীতে এরূপ সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

অন্য এক ব্যাখ্যা হলো, যখন মৃতের পরিবারের লোকেরা তার মৃত্যুতে উচুস্বরে কাঁদে কিংবা মাতম করে এবং জাহিলিয়্যা যুগের প্রথা অনুযায়ী মৃতের

কৃতকর্ম বর্ণনা করার জন্য সমাবেশের আয়োজন করে তখন প্রশংসায় তাকে আকাশে তোলা হয় এবং ফিরিশতারা মৃতকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, ওহে! তুমি কি এরূপ এরূপ ছিলে? একথা কোন কোন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয় এখানেই শেষ করা সমীচীন মনে করছি। যিনি এ বিষয়ে সবিস্তার জানতে চান তিনি 'ফাতহুল মুলহিম' (কৃত মাওলানা শাববীর আহমাদ ওসমানী (র) পাঠ করে নিতে পারেন। এ হাদীসে হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার যে বিবরণ এসেছে তা থেকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এক বর্ণনা মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্‌তিকালের পর হযরত আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্‌তিকাল করেন। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) হযরত উমর (রা)-এর খিলাফাতকালে ইন্‌তিকাল করেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

٣١٧- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اُغْمِىَ عَلَى اَبِىْ مُوْسَى فَاَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمِىْ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا بَرِئٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ - رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم

৩১৭. আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার (আমার পিতা) আবূ মূসা (রা) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এতে তাঁর স্ত্রী উম্মু আবদুল্লাহ্ (রা) সুর করে বিলাপ করতে থাকেন। তারপর তিনি হুঁশ ফিরে পেয়ে উম্মু আবদুল্লাহ্‌কে বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীর বিষয় অবহিত নও যে, তিনি বলেছেন ঃ যে (মৃতু শোকে) মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলে, উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং জামার ছিঁড়ে আমি তার সাথে সম্পর্ক মুক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)। তবে শব্দমালা মুসলিমের)

٣١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ - رواه البخارى

৩১৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যু শোকে) আপন মুখমণ্ডল আঘাত করে, জামা ছিঁড়ে এবং জাহিলিয়্যা যুগের ন্যায় হা-হুতাশ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী)

চোখের পানি বের হওয়া এবং অন্তরে ব্যাথা অনুভব করা

٣١٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبِىْ سَفٍّ الْيَقِيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لاِبْرَهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَالِكَ وَاِبْرَاهِيْمَ بِجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَذْرَفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنُ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرَى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ الْقَلْبَ يَجْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ الاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ الْمَحْزُوْنُوْنَ - رواه البخارى ومسلم

৩১৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আবূ সাঈফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি নবী নন্দন হযরত ইব্‌রাহীম (রা)-এর ধাত্রী (মাওলা বিন্‌ত মুনযির)-এর স্বামী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্‌রাহীমকে (কোলে) নিলেন এবং চুম্বন করলেন ও ঘ্রাণ নিলেন। এরপর আরেকবার আমরা তাঁর নিকট গেলাম আর তখন ইব্‌রাহীম (রা)-এর ইন্‌তিকাল আসন্ন ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল। তা দেখে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) (না বুঝে আশ্চর্য হয়ে) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন)? তখন তিনি বললেন হে ইব্‌ন আওফ! (এটা তো দোষের কিছু নয়) এটাতো দয়া। এরপর আবার তাঁর চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল। এ সময় তিনি বললেন ঃ চোখ পানি ঝরাচ্ছে এবং অন্তর দু:খিত হচ্ছে। তথাপি আমি তাই প্রকাশ করছি যাতে আমরা প্রতিপালক সন্তুষ্ট থাকেন। তারপর তিনি বললেন ঃ হে ইব্‌রাহীম! তোমার বিয়োগে আমরা শোকাভিভূত। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, বৈষয়ক বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন এবং দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরত। নিঃসন্দেহে মানবসূলভগুণের পূর্ণরূপের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, আনন্দ-খুশীর ব্যাপারে আনন্দিত হওয়া এবং দুশ্চিন্তা ও কষ্টদায়ক ব্যাপারে চিন্তিত ও বিষন্ন হয়ে পড়া। যদি কারো অবস্থান না হয়, তবে তা অপূর্ণতা, পূর্ণতা নয়।

হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফসানী (র) মাকতূবাতের একস্থানে লিখেছেন ঃ আমার জীবনে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয় যে, আনন্দদায়ক বস্তুও আমাকে আনন্দ দিত না এবং কষ্টদায়ক বিষয়ও আমাকে ভাবিয়ে তুলত না। এ সময় আমি নবী

করীম ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে চেষ্টা করে আনন্দের ঘটনায় আনন্দ এবং কষ্টের ঘটনায় চিন্তিত হতে থাকলাম। এরপর আল্লাহ্‌র অসীম মেহেরবানীতে আমার পূর্বোক্ত অবস্থা কেটে যায়। তারপর আমার অবস্থা এরূপ হয়ে যায় যে, দুঃখ কষ্টের শিকার হলেই দুশ্চিন্তা আমাকে স্পর্শ করে, একইভাবে আনন্দের কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে স্বাভাবিকভাবেই আমি আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠি।

বিপদগ্রস্তের জন্য শোক ও সমবেদনা প্রকাশ মৃত্যু কিংবা এমনি ধরনের কোন ভয়াবহ বিপদের সময় কোন ব্যক্তি সান্ত্বনা দেওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা এবং তার দুশ্চিন্তা হাল্‌কা করার চেষ্টা করা মূলত মহোত্তম চরিত্রের অনিবার্য দাবি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্যান্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছেন।

٣٢٠- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ- رواه الترمذى وابن ماجة

৩২০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করবে বিপদগ্রস্তের অনুরূপ সাওয়াব তাকেও দান করা হবে। (তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা)

মৃতের পরিবারের লোকদের আহারের বন্দোবস্ত করা

মৃতের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের লোকদের যেহেতু খানা পাকাবার মত অবস্থা থাকে না, তাই তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, তাদের নিজেদের ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের আহারের সুবন্দোবস্ত করা।

٣٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَايَشْغَلُهُمْ- رواه الترمذى وأبوداؤد وابن ماجة

৩২১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (আমরা পিতা) জাফর (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদ এলো, তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা জাফরের পরিবারের লোকদের জন্য খানা পাকাও। কারণ তাঁদের কাছে তাঁর (শাহাদাতের) সংবাদ আসায় খানা পাকানোর মত অবস্থা তাদের নেই। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজা)

কারো মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ এবং তার প্রতিদান

٣٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ جَزَاءُ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلاَّ الْجَنَّةَ- رواه البخارى

৩২২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার প্রিয় ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই এবং এতে সে সাওয়াবের আশা করে, আমার কাছে তার প্রতিদান জান্নাত। (বুখারী)

٣٢٣- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُوَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - رواه أحمد والترمذى

৩২৩. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কারো সন্তান মারা যায় আল্লাহ্ তা'আলা তখন ফিরিশ্‌তাদের বলেন ঃ তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের আত্মা উঠিয়ে আনলে? তারা বলেন, জ্বী হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধন কেড়ে আনলে? তারা বলেন, জ্বী-হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দা কি বলল? তারা বলেন, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহ্' বলেছে। তখন আল্লাহ্ বলেন (এর প্রতিদানে) আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নাম রাখ 'বায়তুল হাম্‌দ'। (আহ্‌মাদ ও তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি শোকগাঁথা এবং ধৈর্যের উপদেশ

٣٢٤- عَنْ مُعَاذٍ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنُ فَكَتَبَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ التَّعْزِيَةَ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَى مُعَاذَبْنِ جَبَلٍ سَلاَمُ عَلَيْكَ فَاِنِّى اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاعْظَمُ اللّٰهُ لَكَ الاَجْرَ وَالْهَمَكَ

الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ فَاِنْ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَيْئَةِ وَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدِعَةِ مَتَّعَكَ اللّٰهُ بِهِ فِىْ غِبْطَةٍ وَسُرُوْرٍ وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرٍ الصَّلٰوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدَى اِنِ احْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ وَلاَ يُحِيْطُ جَزْعَكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزْعَ لاَيَرُدُّ مَيِّتًا وَلاَ يَدْفَعُ حُزْنًا وَمَا هُوَ نَازِلُ فَكَانَ قَدَوَ السَّلاَمَ - رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط

৩২৪. মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর একটি পুত্র সন্তান মারা যাওয়ায় নবী করীম ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে একটি শোকবাণী লিখে পাঠান।

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে"

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে মু'আয ইব্‌ন জাবালের প্রতি। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি প্রথমে তোমার পক্ষ থেকে ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আমি দু'আ করি আল্লাহ্ তোমাকে বিপুল পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ধৈর্যধারণের তাওফীক দিন। আমাদেরকে এবং তোমাকে তাঁর নি'আমতের শুক্‌রিয়া আদায়ের সামর্থ্য দিন। মূলকথা হল এই, আমাদের জীবন, আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবারের-পরিজন এ সবই আল্লাহ্‌র বিশেষ দান এবং তাঁর দেওয়া আমানত। তিনি যখন চাইবেন এ সমুদয় থেকে উপকৃত করবেন এবং অন্তরে শান্তি যোগাবেন। আর যখন চাইবেন তিনি তাঁর আমানত তোমার থেকে ফিরিয়ে নিবেন। তবে এর বিপরীতে তিনি তোমকে বিপুল পুরস্কারে ধন্য করবেন। আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য রয়েছে বিশেষ অনুগ্রহ, দয়া এবং হিদায়াতের পথ নির্দেশক। কাজেই তুমি সাওয়াব চাইলে ধৈর্যধারণ কর। হে মু'আয! তুমি ধৈর্য ধর! তোমার বিলাপও শোক প্রকাশ যেন এমন পর্যায়ে না পড়ে যাতে মূল্যবান প্রতিদান প্রাপ্তির আশা ব্যাহত হয়। ফলে তুমি লজ্জিত হয়ে পড়বে। তুমি জেনে রেখ, গভীর শোক প্রকাশ ও বিলাপ করা হলেও মৃত কখনো (জীবিত হয়ে ফিরে) আসে না এবং শোক ও দুঃখও লাঘব হয় না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ অবধারিত তা কার্যকর হবেই বরং বলা যায়। তা কার্যকর হয়ে গিয়েছে। তোমার প্রতি সালাম"। (তাবারানীর কাবীর ও আওসাত গ্রন্থ)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মাজীদে বিপদে ধৈর্যধারণকারীদের তিনটি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে–

" أُوْلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

"এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আশিস ও দয়া বর্ষিত হয়। আর এরাই সৎপথে পরিচালিত।" (২, সূরা বাকারা ঃ ১৫৭)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শোক বার্তায় মূলত কুরআনের উল্লিখিত বাণীর সুসংবাদের প্রতি ইংগিত করেছেন এবং বলেছেন–

"হে মু'আয! তুমি যদি সাওয়াব প্রাপ্তি ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের লক্ষ্যে এই বিপদে ধৈর্যধারণ কর, তবে আল্লাহ্র কাছে তোমার জন্য তাঁর রহমত, দয়া ও সুসংবাদ রয়েছে।"

যে কোন মুসলমান বিপদগ্রস্থ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ শোকবার্তা পাঠ করে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং পেতে পারে মনের প্রশান্তি। সম্ভবত আমরাও নিজ নিজ বিপদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঈমান বর্ধক শোক গাঁথা থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। ধৈর্য ও শোকর আদায়ের এই পদ্ধতিকে প্রতীক বানিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র বিশেষ দয়া, অনুগ্রহ ও হিদায়াত প্রাপ্তির লক্ষ্যে এগিয়ে আসা সবার কর্তব্য।

মৃতের গোসল ও কাফন

আল্লাহ্র যে বান্দা মৃত্যুবরণ করে দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে পাড়ি জমায়-ইসলামী শরী'আত তাকে সম্মানজনকভাবে বিদায় জানানোর এক বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে এর পবিত্র, ইবাদাত সমৃদ্ধ, সমবেদনামূলক সম্মানজনক পদ্ধতি। প্রথমত মৃতকে এমনভাবে গোসল দিতে হবে যেমন জীবিত অপবিত্র মানুষ ভালভাবে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। এ গোসলে পবিত্রতা অর্জন ছাড়াও গোসলের বিশেষ নিয়ম-কানূনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গোসলের সময় পানিতে এমন বস্তু মিশানো উচিত জীবদ্দশায় মানুষ যা ব্যবহার করে, তাছাড়া কর্পূর জাতীয় সুগন্ধি পানিতে মিশানো যেতে পারে। এতে মৃতের শরীর পবিত্র হওয়ার পাশাপাশি সুগন্ধিময় হয়ে উঠবে। তারপর অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় দিয়ে কাপন পরাতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থায় অপচয় করা যাবে না। এরপর জামা'আতের সাথে তার জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করতে হবে। এরপর শেষ বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে গোরস্থান যাওয়া উচিত। এরপর অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে কবরে রেখে আল্লাহ্র রহমতের হাতে ন্যস্ত করে আসতে হবে। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও হিদায়াত সমৃদ্ধ নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

٣٢٥- عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذَالِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الاَخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا وَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا - رواه البخارى ومسلم

৩২৫. হযরত উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূল তনয়াকে গোসল দানকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে তিনবার অথবা পাঁচবার কিংবা প্রয়োজন মনে করলে আরো অধিক বার বরই কচিপাতা দিয়ে পানি গরম করে গোসল দাও। সবশেষে কর্পূর মিশিয়ে দেবে। তোমাদের গোসল দেওয়া শেষ হলে আমাকে জানাবে। আমরা গোসল কার্য শেষ করে তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর তহবন্দ দিয়ে বললেন ঃ এটা তাঁর শরীরের সাথে লাগিয়ে পরিয়ে দাও। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার কিংবা সাতবার–বেজোড় গোসল দাও এবং তোমরা ডানদিক থেকে এবং উযূর অঙ্গসমূহ থেকে ধোয়া শুরু করো। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত অনরূপ এক রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে কন্যাকে গোসলের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনি হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত যায়নাব (রা) আবুল আ'সের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি অষ্টম হিজরীর প্রথম দিকে ইন্তিকাল করেন। যে সকল মহিলা সাহাবী তাঁর গোসলে অংশগ্রহণ করছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলোচ্য হাদীসের রাবী উম্মু আতিয়্যা আনসারিয়্যা (রা) ছিলেন অন্যতমা। এ ধরনের খিদমত আঞ্জাম দানের ক্ষেত্রে তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। মৃত মহিলাদের লাশ গোসল করানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। বিশিষ্ট তাবিঈ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, আমি মৃতকে গোসল দানের পদ্ধতি তাঁর কাছেই শিখেছি।

আলোচ্য হাদীসে বরইপাতা দিয়ে পানি গরম করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে । কারণ এর দ্বারা সহজেই শরীরের ময়লা দূর হয়ে যায়। এই যুগে শরীর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করে তোলার লক্ষ্যে যেমন আমরা সাবান ব্যবহার করে থাকি, তেমনি সে যুগেও লোকেরা শরীরের ময়লা দূর করার উদ্দেশ্যে বরই পাতা দিয়ে পানি গরম করে নিত। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন

এবং প্রয়োজনবোধে তিনবারেরও অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, কেননা বেজোড় সংখ্যা আল্লাহ্‌র কাছে পসন্দনীয়। অর্থাৎ তিন, পাঁচবার ও প্রয়োজনবোধে সাতবারও গোসল করানো যেতে পারে। শেষবারে কর্পূর মিশিয়ে ও গোসল দেওয়া যেতে পারে যাতে সুগন্ধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ব্যবস্থাই মৃতের সম্মান ও মর্যাদার দিক স্পষ্ট।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীসে নিজ কন্যাকে নিজের তহবন্দ দিয়ে গোসলকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তারা যেন তা তার দেহের সাথে লাগিয়ে পরান। এ পর্যায়ে আলিমগণ বলেন, আল্লাহ্‌র কোন প্রিয় মকবুল বান্দার পোশাক যদি বরকাতের উদ্দেশ্যে মৃতকে পরিয়ে দেওয়া হয় তবে তা যেমন জায়িয। তেমনি উপকৃত হওয়ারও আশা করা যেতে পারে। তবে এসবের উপর ভিত্তি করে যদি আমল বাদ দিয়ে অচেতনভাবে দিন কাটায়, তবে নিঃসন্দেহে তা হবে গুমরাহী।

আলোচ্য রিওয়ায়াত দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে না যে, নবী তনয়াকে কয় কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছে। কিন্তু হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) জাওযাকীর সূত্রে উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

" فكفناها فى خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحى "

"আমরা নবী দুহিতাকে পাঁচটি কাপড় দ্বারা কাফন পরিয়েছি "এবং জীবিতাবস্থায় যেমন তিনি ওড়না পরতেন তেমনি তাকে ওড়না পরিয়েছি।"

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে মহিলাদের জন্য পাঁচটি কাপড় কাফনরূপে ব্যবহার করা সুন্নাতরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

কাফনে কয়টি কাপড় হবে এবং তা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়?

٣٢٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بَيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصُ وَلاَ عَمَامَةٌ -رواه البخارى

৩২৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে,রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনটি সাদা সাহুলী সূতি কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তবে কাপড়সমূহের মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিল না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ ভাষ্যকার সাহুলী কাপড়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ ইয়ামানের একটি বস্তীর নাম সাহুলী। ঐ এলাকার কাপড় ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ অন্য ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত হল এই যে,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্‌তিকালের পূর্বেও ইয়ামানী চাদর ব্যবহার করেছিলেন। ইন্‌তিকালের পর ত-ই তাঁর কাফন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে তাঁর এ তিন কাফনের মধ্যে কামিজ (কোর্তা) ও পাগড়ী ছিলনা। পুরুষ লোকের কাফনের জন্য তিনটি কাপড়ই সুন্নাত।

٣٢٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ - رواه مسلم

৩২৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে (কোন মুসলমানকে) কাফন পরায় সে যেন তাকে উত্তমরূপে কাফন পরায়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মৃতের সম্মানের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, কোন মৃতকে কবরে দাফন করা এবং মাটিতে শুইয়ে দেওয়া মূলত তার সম্মানের প্রতিই ইংগিত করে। পুরাতন ও ছেঁড়া- ফাঁড়া কাপড় দিয়ে কাফন না পরানো চাই। মৃতের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে সম্মানজনকভাবে তার কাফন পরানো উচিত।

٣٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ - رواه أبوداؤد والترمذى وابن ماجة

৩২৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে, কেননা কাপড়সমূহের মধ্যে সাদা কাপড় উত্তম এবং সাদা কাপড় দ্বারাই তোমাদের মৃতদের কাফন দিবে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা)

٣٢٩- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُغَالُوْا فِى الْكَفَنِ فَاِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا- رواه أبوداؤد

৩২৯. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বেশী দামী কাপড় কাফনরূপে ব্যবহার করো না, কেননা তা অচিরেই নষ্ট হযে যাবে। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যেমন মৃতকে পুরাতন কাপড় দিয়ে কাফন পরানো উচিত নয় তেমনি বেশী দামী কাপড় ও কাফনরূপে ব্যবহার করা সমীচীন

নয়। পুরুষের জন্য তিন এবং মহিলাদের জন্য পাঁচ মধ্যম মূল্যমানের কাপড় দ্বারা কাফন পরানো উচিত। তবে এনিয়ম কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন মৃতের পরিবারের লোকদের সামর্থ্য থাকবে। অন্যথায় অসমর্থ অবস্থায় একটি পুরাতন কাপড় দিয়েও কাফন পরানো যেতে পারে এবং এতে দোষেরও কিছু নেই।

উহুদ যুদ্ধে শহীদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আপন চাচা হযরত হামযা (রা.)-এবং মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা.) কে এমন একটি করে কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়েছিল যে, তা যদি মাথার দিকে টেনে দেওয়া হতো, তবে পা বেরিয়ে যেত আবার পায়ের দিকে টান দিলে মাথা বের হয়ে যেত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশক্রমে চাদর দ্বারা তাঁদের মাথা আবৃত করা হয় এবং ইয্খির ঘাস দ্বারা পা ঢেকে দেওয়া হয় এবং এরূপ কাফন পরানোর পর তাঁদের দাফন করা হয়।

জানাযার (লাশের) পেছনে পেছনে যাওয়া এবং জানাযার সালাত আদায়ের সাওয়াব

٣٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ يُصَلِّى عَلَيْهَا يُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الاَجْرِ بِقَرَطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلَ اُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ - رواه البخارى ومسلم

৩৩০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের লাশের অনুসরণ করে এবং জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করে সে দুই 'কীরাত' সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া, জানাযার সালাত আদায় করা এবং দাফনে অংশ নেয়ার ফযীলাত বর্ণনা ও অনুপ্রেরণা দান করাই আলোচ্য হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়। মোদ্দাকথা হল, যে ব্যক্তি জানাযার পেছনে হেঁটে কেবল জানাযার সালাত আদায় করে প্রত্যাবর্তন করে সে কেবল 'এক কীরাত' সাওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানাযার সালাত ও দাফনে অংশ নেয়া সে দুই কীরাত সাওয়াব লাভ করবে।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত অনুযায়ী 'কীরাত' হচ্ছে এক দিরহামের এক দ্বাদশ অংশ (১২ ভাগ), প্রায় দুই পায়সার কাছাকাছি। উল্লেখ্য, তদানীন্তন যুগে দিন

মজুরদেরকে কীরাতের হিসেবে মজুরী দেওয়া হতো। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানে 'কীরাত" শব্দটি বলেছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন: একে দুনিয়ার এক দিরহামের এক দ্বাদশ অংশ মনে করার অবকাশ নেই বরং আখিরাতের এক কীরাত দুনিয়ার মুকাবিলায় উহুদ পাহাড়ের ন্যায় বড় ও অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন হবে। এর সাথে সাথে তিনি আরো বলেছেন, এ সাওয়াব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তখনই পাবে যখন এই কাজের সাথে তার ঈমান- আমল ও সাওয়াবের নিয়্যাত থাকবে। অর্থাৎ এ সাওয়াব প্রাপ্তি মূলতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আখিরাতে সাওয়াব লাভের আশার উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কেবল আত্মীয়তার জন্য এবং তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জানাযার সালাত আদায় করে এবং দাফনে অংশ নেয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন এবং আখিরাতে সাওয়াব লাভের বিষয়টি প্রাধান্য না দেয়, তবে সে এ বিরাট সাওয়াব লাভের যোগ্য হবে না। হাদীসে বর্ণিত " اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا " এর মর্ম এ-ই। উল্লেখ্য, আখিরাতে পুরস্কার প্রাপ্তির এটা একটা সাধারণ শর্ত এ প্রসঙ্গ মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডের শুরুতে " اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ "। হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'ইখ্‌লাস' সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

জানাযার পেছনে দ্রুত চলা এবং তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ

٣٣١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْرَعُوْا بِالْجَنَاجَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذَالِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ - رواه البخارى

৩৩১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃতকে তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও। যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তবে তাকে কল্যাণের দিকে অগ্রসর করে দিলে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কিছু হয়, তবে মন্দকে তোমার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিলে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে, লাশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কাফন পরানোর কাজে নিষ্প্রয়োজনে বিলম্ব না করাই উচিত এবং দাফনের জন্য রওয়ানা করার পর অনর্থক ধীরেধীরে চলা অনুচিত। বরং যথাযোগ্য দ্রুত গতিতে চলতে হবে। যদি মৃতু ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমতের পূর্ণ অধিকারী হয়, তবে অবিলম্বে তাকে

তার ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ না করুন যদি বিপরীত হয়, তবুও তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে বোঝা হাল্‌কা করে নেয়া উচিত।

জানাযার সালাত এবং মৃতের জন্য দু'আ

٣٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ- رواه أبوداؤد وابن ماجة

৩৩২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন মৃতের জানাযার সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে। (আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ জানাযার সালাতের মূল উদ্দেশ্য হল, মৃতের জন্য দু'আ করা। কেননা প্রথম তাক্‌বীরের পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন এবং দ্বিতীয় তাক্‌বীরের পর দুরূদ শরীফ পাঠ করা মূলতঃ আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করারই ভূমিকা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার সালাতে যে সব দু'আ পাঠ করতেন তা ঐ স্থানের জন্য খুবই উপযোগী।

٣٣٣- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرَ مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذَالِكَ الْمَيِّتَ- رواه مسلم

৩৩৩. হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার সালাত আদায় কালে যে দু'আ পাঠ করতেন আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। তিনি বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْتَسِلْهُ وَالثَّلْجِ وَالْبِرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ

الاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

"হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা কর, তাকে দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন কর, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে ধুয়ে মুছে নাও পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিলা বৃষ্টির পানি দ্বারা। তাকে এমনভাবে পাপমুক্ত করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন করা হয়। তাকে তার (দুনিয়ার) ঘর থেকে উত্তম ঘর দান কর, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার ও তার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে কবরের ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।" বর্ণনাকারী বলেন,(নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করায়) আমি আকাঙক্ষা করেছিলাম আমি যদি এই মৃত ব্যক্তি হতাম। (মুসলিম)

٣٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَ تُحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ- رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى وابن ماجة

৩৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযার সালাত আদায় করতেন তখন এই বলে দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَ تُحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মৃত্যু দিবে তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং (মৃত্যুর পরে) ফিতনা বা পরীক্ষায় ফেলে দিওনা। "(আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)"

٣٣٥- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ - رواه أبوداؤد وابن ماجة

৩৩৫. হযরত ওয়াসিলা ইব্ন আস্কা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে এক মুসলিম ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করেন। আমি তখন তাঁকে এই দু'আ পাঠ করতে শুনলাম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"হে আল্লাহ্! আমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার প্রতিবেশিত্বের আশ্রয়ে রইল । অতএব তুমি তাকে কবরের বিপদ ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে পানাহ দিও। তুমি তো প্রতিশ্রুতি পূরণকারী ও সত্যের উৎস। হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা করে এবং তার প্রতি দয়া করে। কেননা নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ জানাযার সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তিনটি প্রসিদ্ধ দু'আর কথা পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়। পাঠক যে কোন একটি বা একাধিক পাঠ করে নিতে পারেন।

উপরে বর্ণিত বিশেষত ওয়াসিলা ইব্ন আস্কা ও আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবীম ﷺ এমন আওয়াযে দু'আ পাঠ করেছিলেন যে, তা শুনে সাহাবা কিরাম মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো সালাতে সশব্দে দু'আ পাঠ করতেন যাতে অন্যান্যরা সহজেই শুনে মুখস্থ করে নিতে পারে। জানায়ার সালাতেও সম্ভবতঃ তাঁর উচুস্বরে দু'আ পাঠ করার এটাই উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নিঃশব্দে দু'আ করাই উত্তম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতি পালককে ডাক।" (৯, সূরা আরাফ ঃ ৫৫)

জানাযার সালাতে অধিক সংখ্যক লোক সমাবেশের বরকত এবং গুরুত্ব

٣٣٦- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مَائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ -رواه مسلم

৩৩৬. হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তির জানাযায় যদি একশ' লোক অংশ গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক তার জন্য সুপারিশ করে, তবে তাদের সুপরিশ কবূল করা হবে। (মুসলিম)

٣٣٧- عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ اَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ اُنْظُرْ مَااجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ فَاِذَا نَاسٌ قَدْ اِجْتَمَعُوْا لَهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُوْلُهُمْ اَرْبَعُوْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَخْرِجُوْهُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ شَفَّعَهُمْ اللّٰهُ فِيْهِ - رواه مسلم

৩৩৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর মুক্তদাস কুরাইব সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কুদাইদ অথবা উস্ফান নামক স্থানে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর এক পুত্র ইন্তিকাল করেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন ঃ হে কুরাইব দেখে এস, কি পরিমাণ লোক জানাযার জন্য জড়ো হয়েছে। তিনি বলেন, আমি বেরিয়ে গেলাম এবং লোকদের জমায়েত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাদের সংখ্যা চল্লিশ হবে কি? কুরাইব বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাকে বের করে নিয়ে এসো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তার জানাযায় যদি অংশীবাদী নয় এমন চল্লিশজন লোক অংশগ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সম্পর্কে তাদের সুপারিশ কবূল করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ 'কুদাইদ' মক্কা ও মদীনার পথে রাবিগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি অঞ্চলের নাম। আর উস্ফান মক্কা ও রাবিগ এর মধ্যবর্তী মক্কা থেকে আনুমানিক ৩৫ কিংবা ৩৬ মাইল দূরবর্তী একটি বস্তির নাম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) তনয় কুদাইদে না উস্ফান নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে।

٣٣٨- عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ ثَلٰثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ اَوْجَبَ فَكَانَ مَالِكُ اِذَا اسْتَقَلَّ اَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلٰثَةَ صُفُوْفٍ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ - رواه أبوداؤد

৩৩৮. হযরত মালিক ইবন হুবায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুসলমান ইন্‌তিকাল করার পর যদি মুসলমানদের তিন সারি লোক তার জানাযার সালাত আদায় করে ও তার জন্য দু'আ করে তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দেন। (অধ:স্তন বর্ণনাকারী বলেন,) সুতরাং মালিক ইব্‌ন হুবায়র যখন জানাযায় কম লোক দেখতেন তখন এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে তিন সারিতে ভাগ করে দিতেন। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত তিনটি হাদীস যথাক্রমে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে একশ' লোকের কোন জানাযায় অংশগ্রহণ, এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে কারো জানাযায় চল্লিশ জন লোকের অংশগ্রহণ এবং সর্বশেষ মালিক ইব্‌ন হুবায়র বর্ণিত হাদীসে কারো জানাযায় তিন সারি মুসলমান শরীক হলে মাগফিরাত ও জান্নাত লাভের বিষয় পরিষ্কার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই তিনটি কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত তাঁকে প্রথমে বলা হয়েছে যে, কোন মুসলমান ব্যক্তির জানাযায় যদি একশ' লোক অংশগ্রহণ করে এবং তাতে তারা মৃতের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃতের পক্ষে এই দু'আ কবূল করবেন। এরপর এ বিষয়টি আরেকটু হাল্‌কা করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে চল্লিশজন লোকও যদি কারো জানাযায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের সংখ্যা যদি চল্লিশের কমও হয় তবু ও তার জন্য এ সুসংবাদ রয়েছে।

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, জানাযায় অধিক লোকের সমাগম বরকত লাভের কারণ বটে । কাজেই যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক লোক একত্র করার চেষ্টা করা উচিত।

লাশ দাফনের রীতিনীতি ও তার আদাব

٣٣٩- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعَدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعَدَبْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ فِىْ مَرْضِهِ الَّذِىْ هَلَكَ فِيْهِ الْحِدُوْلِىْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - رواه مسلم

৩৩৯. হযরত আমির ইব্ন সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন আবু ওয়াককাস (রা.) তাঁর মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত অবস্থায় বলেছেন, আমার জন্য যেন লাহাদ কবর (বুগলী) কবর তৈরি করা হয় এবং তাতে যেন কাঁচা ইট লাগানো হয় যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরে কাঁচা ইট লাগানো হয়েছিল। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল যে, বুগলী কবরই উত্তম। তবে তাতে কাঁচা ইট বিছিয়ে দেওয়া চাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরও ঠিক এভাবে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কাঁচা মাটি হওয়ার দরুন যদি বগলী কবর খনন করা না যায় তবে 'শিক্‌ক' কবর খনন করা যেতে পারে। কোন কোন বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় উভয় প্রকার কবর তৈরি করা হতো। তবে বগ্‌লী কবরই উত্তম।

٣٤٠- عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ اُحُدٍ اِحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَعْمِقُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثَةَ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا- رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى

৩৪০. হযরত হিশাম ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছেন ঃ তোমরা শহীদগণের জন্য কবর খনন কর, একে প্রশস্ত কর, খুব গভীর কর এবং খুব সুন্দর করে তৈরি কর। তার পর প্রত্যেক কবরের দুইজন কি তিনজন করে রাখ। তবে যে ব্যক্তি কুরআনের অধিক জ্ঞান রাখত তাকে প্রথমে রাখ। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ উহুদ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তবে তাঁদের সবার জন্য পৃথক পৃথক কবর খনন করাছিল খুবই দুরূহ ব্যাপার । অন্যকথায় বলা যায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পরিস্থিতির জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে একই কবরে একাধিক লাশ দাফনের নির্দেশ দেন। কিন্তু যথা নিয়মে কবর প্রশস্তভাবে খনন করা হয়। তাতে আরো হিদায়াত দেওয়া হয় যে, এক কবরে যখন একাধিক শহীদের লাশ রাখা হবে, তখন কুরআনের জ্ঞানের আধিক্য অনুসারে পর্যায়ক্রমে রাখবে। এই হাদীসের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে রণাঙ্গনে যেহেতু অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে, তাই এক এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়িয।

٣٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ -وَفِىْ رِوَايَةٍ عَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ - رواه أحمد والترمذى وابن ماجة وأبوداؤد

৩৪১. হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কবরে যখন লাশ রাখা হতো তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ("আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিল্লাতের উপর রেখে দিলাম।"

অন্য বর্ণনায় আছে, وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকার উপরে।) (আহ্‌মাদ, তিরমিযী ইব্‌ন মাজাহ ও আবূ দাঊদ)

٣٤٢- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلٰثَ حَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا وَاَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ - رواه البغوى لى فى شرح السنة

৩৪২. জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির (কবরের) উপর দুই আঁজলা একত্র করে তিন কোষ মাটি দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা.)-এর কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন এবং এর উপর কাঁকর স্থাপন করেছেন। (বাগাবীর শারহুস্ সুন্নাহ্)

٣٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْسِبُوْهُ وَاَسْرِعُوْا بِهِ اِلَى قَبْرِهِ وَيُقْرَءُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ- رواه البيهقى فِى شعب الايمان وقال والصحيحانه موقوف عليه

৩৪৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখবে না বরং তাকে অবিলম্বে কবর দিবে। তার পর মাথার দিকে সূরা বাকারার প্রথম অংশ (মুফলিহূন পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষ অংশ আমানার রাসূলু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। (রায়হাকীর শু'আবুল ঈমান, বিশুদ্ধমতে হাদীসটি মাওকূফ ইব্‌ন উমর (রা.) এর উক্তি)

ব্যাখ্যাঃ মৃতের লাশ ঘরে আবদ্ধ না রেখে বরং তাড়াতাড়ি কাফন-দাফন করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিভিন্ন হাদীসে বিধৃত রয়েছে। ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে লাশ কবরে রাখার পর সূরা বাকারার প্রথম ও শেষ অংশ পাঠ

বিষয়ে যে স্পষ্ট নির্দেশ বর্ণিত তা ইব্‌ন উমর (রা.)-এর নিজস্ব বাণী নয়। স্পষ্টতই একথা তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেই বলে থাকবেন। এটি যদিও বর্ণনাসূত্র মারফূ' না হয়, কিন্তু হাদীস বিশারদ ও ফিক্‌হবিদদের মূলনীতির আলোকে এ নির্দেশ মারফূ' পর্যায়ের।

কবর সম্পর্কে (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) পথ নির্দেশ

٣٤٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ - رواه مسلم

৩৪৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে চুনকাম করতে, এর উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং বসতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ কবর সম্পর্কে শরী'আতের মৌলিক মাস'আলা হল এই যে, এক দিকে যেমন মৃতের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করা যাবে না, ঠিক একইভাবে আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, কেউ কবরের উপর বসবে না। কারণ একাজ কবরবাসীর সাথে অসম্মান প্রদর্শনের শামিল। অন্য দিকে দর্শক কবর দেখে দুনিয়া অস্থায়ী এ অনুভূতি লাভ করবে এবং তার অন্তরে আখিরাতের চিন্তা স্থান পাবে। এজন্য কবরকে ইমারতে পরিণত করে স্মরণীয় করে রাখার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্য এই যে, কবর যদি সাদাসিদে ও কাঁচা রাখা হয় এবং কোন প্রকার ইমারত তৈরি করা না হয়, তবে শিরকে অভ্যস্ত লোকজন পূজা করতে এগিয়ে আসবে না। বলাবাহুল্য যে সকল সাহাবী, তাবিঈ এবং সর্বোপরি উম্মাতের ওলীদের কবর শরী'আত সম্মতরূপে সাদাসিধে ও কাঁচা সেখানে অন্যায় কাজের মহড়া পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে যে সকল নেককার লোকের কবর শানদার অট্টালিকায় রূপান্তরিত, সেখানে অনেক শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ অহরহ সংঘটিত হয়ে থাকে যা ঐ সব নেক্‌কারদে রূহের পক্ষে কষ্টদায়ক।

٣٤٥- عَنْ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا - رواه مسلم

৩৪৫. হযরত আবূ মারসাদ গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং তার দিকে মুখ করে সালাতও আদায় করবে না। (মুসলিম)

ব্যাখাঃ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, কবরে বসার ফলে কবরকে অসম্মানিত করা হয়। পরবর্তী হাদীস থেকে জানা যায় যে, এতে কবরবাসী কষ্ট অনুভব করে। আর কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞার মূলে রয়েছে উম্মাতকে শিরক থেকে রক্ষা করা।

٣٤٦- عَنْ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ قَالَ رَانِىْ النَّبِىُّ ﷺ مُتَّكِئًاعَلَى قَبْرٍ فَقَالَ لاَ تُؤْذِ صَاحِبَ هذَا الْقَبْرِاَوْ لاَ تُؤْذِهِ - رواه أحمد

৩৪৬. হযরত আমর ইব্‌ন হায্‌ম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে একটি কবরের সাথে হেলান দিয়ে বসতে দেখে বললেন ঃ কবরবাসীকে কষ্ট দিওনা অথবা তিনি বলেছেনঃ তাকে কষ্ট দিও না। (আহ্‌মাদ)

কবর যিয়ারত

٣٤٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الاٰخِرَةَ - رواه ابن ماجة

৩৪৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা তা দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রাক ইসলামী যুগে সাধারণ মুসলমানের মনে একত্ববাদ যতক্ষণে বদ্ধমূল হয়নি এবং কেবলমাত্র তারা শিরকের নিগড় থেকে মাত্র কিছুদিন পূর্বে বেরিয়ে এসেছে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের কাছে যেতেও নিষেধ করেছেন। কারণ সদ্য শিরক বিমুখ লোকদের কবর পূজায় জড়িয়ে পড়ার তীব্র আশংকা ছিল। তার পর যখন উম্মাতের তাওহীদের চেতনা ও বুনিয়াদ মযবূত হয় এবং সর্বাবিধ শিরক সম্পর্কে অন্তরে ঘৃণা জন্মে এবং কবরের কাছে গেলে শিরকের পাপে জড়িয়ে পড়ার আশংকা অবশিষ্ট থাকল না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর যিয়ারত করার অনুমতি দেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, এতে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহভাব সৃষ্টি হবে এবং আখিরাতের চিন্তা অন্তরে স্থান পাবে। এই হাদীস থেকে শরী'আতের এই মৌলিক বিষয়ও জানা গেল যে, কোন কাজের মধ্যে যদি একদিকে বিশেষ কল্যাণ ও বরকত নিহিত থাকে, কিন্তু অন্যদিকে বিরাট ক্ষতির আশংক থাকে, তবে সে ক্ষতির দিকের প্রতি লক্ষ্য করে তা

সম্পাদন করতে নিষেধ করা হয়। তবে কোন সময় যদি ক্ষতির আশংকা না থাকে, তবে পরে আবার তার অনুমতিও দেওয়াা যেতে পারে।

٣٤٨- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ " اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - رواه مسلم

৩৪৮. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন লোকেরা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এই দু'আ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ "হে মু'মিন-মুসলিম কবরবাসী ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশা আল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি" - পাঠ করেন। (মুসলিম)

٣٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ - رواه الترمذى

৩৪৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ মদীনার কতিপয় কবরের নিকট দিয়ে পথ চলাকালে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ "হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের অনুগামী "। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত হাদীস দু'টিতে সামান্য ব্যবধান সহ কবরবাসীদের উপর সালাম ও দু'আর যে বর্ণনা রয়েছে তা দ্বারা একদিকে যেমন মৃতকে সালাম ও দু'আ করা যায় এবং অন্যদিকে তেমনি নিজের মৃত্যুর কথাও স্মরণ করা যায়। উল্লেখ্য, কারো কবর যিয়ারতে গেলে এ দু'টি উদ্দেশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। সাহাবা কিরাম ও তাবিঈদের তরীকা এ রূপই ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের তরীকার উপর অটল রাখুন এবং এ অবস্থায়ই আমাদের দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন।

মৃতদের জন্য ইসালে সাওয়াব

কারো মৃত্যুর পর তার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করা এবং দয়া ভিক্ষা চাওয়াই মূলত তার সাথে সদাচরণের উত্তম পদ্ধতি জানাযার সালাত আদায় করার উদ্দেশ্য ও তাই। কবর যিয়ারত বিষয়ক হাদীস সমূহের মধ্যে দু'টি হাদীসে কবরবাসীকে সালাম দেওয়ার সাথে সাথে মাগফিরাত চাওয়ার বিষয় ও বর্ণিত হয়েছে। মৃতের কল্যাণে দু'আ করার আরো একটি ফলদায়ক পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা হল, মৃতের পক্ষ থেকে দান-সাদাকা অথবা সাওয়াবের কোন কাজ করা। একেই বলে ইসালে সাওয়াব। এ পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত দু'টি সাহীস পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

٣٥٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ وَاَنَا غَائِبٌ عَنْهَا اَيَنْفَعُهَا شَئٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِىْ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا - رواه البخارى

৩৫০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন উবায়দা (রা.)-এর মা যখন ইন্‌তিকাল করেন তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না। সেমতে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মায়ের কাছে অনুপস্থিত থাকাকালে তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন। সুতরাং আমি যদি তাঁর নামে দান সাদাকা করি তাতে তিনি উপকৃত হবেন কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন সা'দ বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাঁর নামে আমার (মিখরাফ নামক) একটি বাগান দান করে দিলাম। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, ইসালে সাওয়াবের মাস-আলা খুবই পরিষ্কার। প্রায় অনুরূপ অর্থবোধক একটি হাদীস হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে স্থান পেয়েছে। তবে তাতে হযরত সা'দ (রা.)-এর নাম আসেনি। কিন্তু হাদীসবিশারদগণ বলেছেন, এ হাদীস ও উক্ত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত।

٣٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ اَوْصَى اَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَاَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَام خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَاَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌ وَاَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتّٰى اَسْأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ اَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَاِنَّ هِشَامًا اَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً

اَفَأُعْتِقَ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاَعْتَقْتُمْ عَنْهُ اَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ اَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَالِكَ - رواه أبوداؤد

৩৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আস ইব্ন ওয়াইল (রা) মৃত্যুর সময় এই মর্মে ওয়াসীয়্যাত করে যায় যে, তার পক্ষ থেকে যেন একশ' দাস মুক্ত করা হয়। সেমতে (তার এক পুত্র) হিশাম ইবনুল আস (রা) তার পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন দাস মুক্ত করে। দ্বিতীয় পুত্র আম্র ইবনুল আস (রা) অবশিষ্ট পঞ্চাশজন দাস মুক্ত করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি এ বিষয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে প্রশ্ন করে বিষয়টি জেনে নিতে চাইলেন। তারপর আম্র তাঁর নিকট গিয়ে বললেন হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাদের পিতা একশ' দাস মুক্ত করার ওয়াসীয়্যাত করেছিলেন। হিশাম তার পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন দাস মুক্ত করে দিয়েছে এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশ জনকে আমি কি তার পক্ষ থেকে মুক্ত করে দিব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের পিতা যদি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করত এবং তোমরা তার পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করতে অথবা অন্য কনো কিছু দান করতে অথবা তার পক্ষে হজ্জ করতে তাহলে সে আমালের সাওয়াব তার আত্মায় পৌঁছত। (আবূ দাঊদ)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসালে সাওয়াবের মাসআলায় আলোচ্য হাদীসখানা খুবই সুস্পষ্ট। এত দান সাদাকা দ্বারা ইসালে সাওয়াব ব্যতীত হজ্জের বিষয়ও উল্লেখ আছে। মুসনাদে আহ্মাদে আলোচ্য হাদীসে হজ্জের পরিবর্তে সিয়ামের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে একটি মূলনীতি সম্পর্কেও জানা গেল যে, মৃতদেরকে এসব কাজের সাওয়াব পৌঁছান হয়ে থাকে। তবে মৃতের মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত । আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। সালাত অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ وعَلٰى رَسُوْلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন) / ২০০৩-২০০৪ / অঃ সঃ / ৪৪০৬-৩২৫০